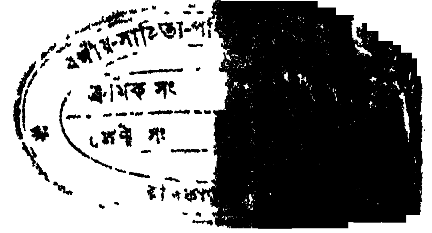


আবাদ

১ম বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৩৩ | ১ম সংখ্যা

নিবেদন।

"এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হ'বে আশা।"

দেশের আর্থিক অনটনের কথা উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া আজ আমরা এই গুরুভার মাথায় তুলিয়া লইলাম। ভারত কৃষি-প্রধান দেশ—এই পুণ্যভূমি একদিকে যেমন কলকণ্ঠ কবি, তত্ত্ববিৎ দার্শনিক ও জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের অলোক-সামান্য প্রতিভারশ্মিতে দীপ্যমান ছিল অন্যদিকে সেইরূপ নানাবিধ অনায়াসোৎপন্ন শস্যসম্ভারে সমৃদ্ধ থাকিয়া বিস্মিত জগতের সম্মুখে প্রকৃতির লীলা নিকেতন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। "আর্য্য" শব্দের মৌলিক অর্থ কৃষিবিদ্যাবিৎ অর্থাৎ সভ্যতার প্রথম মানদণ্ড কৃষিবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ। আজ যদি আমরা সভ্যতার আদিনিদর্শন এই কৃষিশিল্পকে অবজ্ঞা করিয়া দারিদ্র্যকে আমন্ত্রণ করিয়া আনি—যদি আমাদের এই অতীত গৌরবকে অবহেলার বিষয় মনে করিয়া দুর্দ্দিনের চিরান্ধকারকে বরণ করিয়া লই—তাহা হইলে আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা এখনও বহুদূরে। আবার আমাদের ফিরিতে হইবে প্রকৃতির নিভৃত নিকেতনে—দেশজননীর শ্যামল ক্রোড়ে। নতুবা আমাদের উদ্ধারের আশা নাই।

গভীর পরিতাপের বিষয়, কৃষিসম্বন্ধে এই ঘোর অজ্ঞতা ও একান্ত অনিচ্ছা কেবল তথাকথিত ভদ্রসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। ভারতীয় কৃষক কুলেরও ঐ বিষয়ে উৎসাহের সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়। বৈদেশিক সভ্যতা-রূপ আলেয়ার আলোকে আমাদের চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছে। সার্দ্ধশতাব্দী কালের মধ্যে বিলাসিতার বিষ আমাদের শিরায় শোণিতে মিশাইয়া গিয়াছে। আজ চাই এমন কতকগুলি দেশভক্ত সন্তান যাঁহারা ভগীরথের মত কম্বু নিনাদে অতীতের সেই রুদ্ধ-প্রবাহ ভাবধারাটীকে আহ্বান করিয়া অভিশপ্ত ভারতকে মুক্তিপথের সন্ধান বলিয়া দিবেন।

জন্মভূমির সেবা করিবার অধিকার প্রত্যেক সন্তানেরই আছে। জননীর পাণ্ডুর বদন আবার যাহাতে প্রসন্নতার অরুণালোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে—সুজলা, সুফলা বঙ্গভূমি আবার যাহাতে প্রাচুর্য্যের মাধুর্য্যে বিশ্বমনোমোহিনী অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠেন সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া অপেক্ষা বড় পুণ্যের, অধিকতর শ্লাঘার কথা আর কি হইতে পারে জানি না। সেতুবন্ধনে ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীর চেষ্টাও ব্যর্থ হয় নাই সেই আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আমরা এই দুরূহ কর্ত্তব্যভার শিরে তুলিয়া লইলাম।

কৃষিসম্বন্ধে অনেকগুলি পত্রিকা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গলার এই ঘোর দুর্দ্দিনে এই বিষয়ের পত্রিকার আরও প্রয়োজন আছে। কৃষকদিগের আশা আকাঙ্ক্ষা, অভাব অভিযোগের কথা যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা এবং তাহাদের সমস্যাভঞ্জনে সাধ্যমত সাহায্য করাই

এই সকল পত্রিকার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অধুনা এই দেশব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক জাগরণের দিনে নেতৃগণ গ্রামসংস্কার ও কৃষির দিকে দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন। পরলোকগত ত্যাগবীর চিত্তরঞ্জন এ সম্বন্ধে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগের বাণী উদাত্তকণ্ঠে বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন। আশা করি এই অবজ্ঞাত, অনাদৃত ...য়ে ব্রতী হইয়া আমরা দেশের কল্যাণকামী প্রত্যেক ...র আনুকূল্য লাভ করিব।

...মচন্দ্রের সাধনার ছবি, বাঙ্গলার সেই "সুজলাং ...মলয়জশীতলাং" মোহিনী মূর্ত্তি আর ত দেখিতে ... দেশের সে প্রাচুর্য্য কই—দেশবাসীর সে—স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল, অনিন্দ্য বীরকান্তি কই? খাদ্যদ্রব্য মহার্ঘ হইয়াছে, দুগ্ধ এরূপ দুষ্প্রাপ্য যে আর দুই এক পুরুষ পরে ইহা পুষ্টিকারক পানীয়ের পরিবর্ত্তে প্রদর্শনীতে দেখিবার জিনিসে পরিণত হইবে এইরূপ আশঙ্কা হয়। অধিকাংশ নদীই শুকাইয়া গিয়াছে অথবা যাইতে বসিয়াছে। ফলে, নদীপথে আমদানী রপ্তানী বন্ধ, জলনিকাশের অসুবিধ এবং ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইতেছে।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই
আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল চাই স্বাস্থ্য
আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।"

এই অমৃতময়ী বাণী তাঁহার বক্ষে বাজিয়াই ক্ষান্ত নহে। তিনি কথা কার্য্যে পরিণত করিয়া জনসাধারণের পূর্ণ আদর্শ হইয়াছেন। আমরাও তাঁহার অঙ্কিত পথ লক্ষ্য করিয়া, ধন্য ও বরণীয় হইতে চেষ্টা করিব

নানা কথা

জলপথের উন্নতি

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় – বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে, জলপথের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অত্যাবশ্যক কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া জনসাধারণের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই জলকষ্ট সমস্যা কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নহে, ইহা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে। ফলে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে এবং দিন দিন আমাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে।

নাটোর, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর প্রভৃতি নগরগুলি এককালে বহুজনপূর্ণ, স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। এখন এ সকল স্থানে নদী শুকাইয়া গিয়াছে এবং অন্যান্য অসুবিধার কথা ছাড়িয়া দিলেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকার মহাশয় বলিয়াছেন, যে আধুনিক সভ্য জগতে, প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে হয়। বিজ্ঞানের প্রভাবে সুয়েজ ও পানামা (Suez and Panama) এখন আর যোজক খাল মাত্র নহে। এই অবিমিশ্র বিজ্ঞানচর্চ্চার পরিণাম কি আমরা জানি না, তবে গঙ্গার মত স্রোতস্বতী নদী যে দিন দিন ক্ষীণা হইতেছে তাহার কারণ হরিদ্বারের নিকট খাল বাহির করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সরকার বাহাদুরের Irrigation বিভাগের প্রচুর বৃত্তিভোগী অনেক Engineer আছেন, কিন্তু তাঁহারা 'শ্যাম' আর 'কুল' উভয় রক্ষা করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক বোধ করেন না। আমাদের মনে হয় যে খালগুলি যদি সমস্ত নদীর সহিত যুক্ত থাকে তাহা হইলে নদীগুলি শুকায় না। উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অভাব নাই, কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ উপরওয়ালার কাছে

তাঁহাদের গুণ চাপা পড়িয়া যায়। পাছে একস্থানে বহুকাল থাকিয়া লোকহিতকর কার্য্যের দ্বারা তাঁহারা যশস্বী হইয়া উঠেন, এইজন্য তাঁহাদিগকে অনবরত বদলী করা হয়।

সে কথা যাক্। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অন্য দেশ হইতে গম ও তুলা পাঞ্জাবে লইয়া যাইতে হইত। এখন জল সরবরাহের সুবিধা হওয়ায় সেখানে আজকাল ফসল যথেষ্ট উৎপন্ন হইতেছে এবং বাহিরে ও চালান যাইতেছে।

যেমন সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত হইলে ঔষধ প্রয়োগেও আর কোন ফল পাওয়া যায় না—নিত্যনূতন ব্যাধি আসিয়া দেহকে আশ্রয় করে—সেইরূপ একটী নদী হইতে ক্রমাগত খাল কাটিতে কাটিতে উহার নিজস্ব প্রবাহটী পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া যায় এবং সে অবস্থায় আর কোন উপায়েই স্রোতোধারাটীকে অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয় না। ব্যাধিগ্রস্ত দেহকে নিরাময় করিতে হইলে যেমন উক্ত ব্যাধির কেন্দ্রগত কারণটীর বিলোপ সাধন আবশ্যক, সেইরূপ এককালে একটী প্রদেশস্থ সমস্ত নদীর সংস্কার আরব্ধ না হইলে এই ভারতব্যাপী জলাভাব-সমস্যার সমাধান কোনদিনই হইবে না। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের উক্তি—"The whole problem for the province should be taken in the entirety, no mere patch work or piecemeal activity will meet the case" অর্থাৎ কোন প্রদেশের জলকষ্ট সমস্যাটীকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, এখানে ওখানে একটু আধটু চেষ্টায় কোন ফল হইবে না—বিশেষ প্রণিধানযোগ্য খালগুলির উন্নতি কল্পে একলক্ষ টাকা আর বরিশাল Reserve Policeএর জন্য তিনলক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু প্রজারা যদি অনাহারে ও অসুখে মরে তাহা হইলে পুলিশ শাসন করিবে কাহার উপর? প্রজারা নষ্ট হইলে রাজা রাজত্ব করিবেন কাহাদের লইয়া?

আমরা জানিতে পারিয়াছি সরকার বাহাদুর নিম্নলিখিত কার্য্যগুলিতে হস্তক্ষেপ করিবেন :—

(১) মাদারীপুর ভীলরুট্।

(২) মুর্শিদাবাদ গোবরানালা।

(৩) নদীয়া জেলার মেহেরপুরের ভৈরবনদ।

(৪) ঘাটাল মহকুমার বন্যায় [illegible]

(৫) দামোদরনদের দক্ষিণতীরে [illegible]

আমাদের মতে দামোদর খালটী প্র[illegible] ভাল। এ সম্বন্ধে স্থিরীকৃত মোট ব্যয়ের পরিমাণ [illegible] টাকা। তন্মধ্যে ৪৫০০০০৲ [illegible] বৎসরে ব্যয় [illegible] যাইবে।

এই সরকারী আংশিক [illegible] আমরা [illegible] তুলিয়া লইব।

করবৃদ্ধি গল্প

ভারতবর্ষ প্রথমতঃ নিজের [illegible] ভারে [illegible], তাহাছাড়া "বোঝার উপর শাকের আঁটি" [illegible] করভার দিন দিন বাড়িতেছে। দেশবাসীর তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার বাহাদুর এই [illegible] করিয়াছিলেন, এবং এখন আমারা দেখিতেছি [illegible] দরিদ্র প্রজাদের কর আরও বৃদ্ধি করিবার [illegible] নির্দ্দেশ করিবার জন্য তাহাদের প্রদত্ত অর্থ হইতে [illegible] টাকা ব্যয় করিয়া কেবল সুদীর্ঘ ৪৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী [illegible] রিপোর্ট রচনা করিয়াছেন। এই রিপোর্ট জন সাধারণের কোন উপকারই করে নাই, বরং অল্প উপার্জ্জনক্ষম কৃষকদিগের যথেষ্ট কর থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগের নিকট হইতে আরও কর আদায় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।

যে সমস্ত জমিদারের জমি বিলি করা নাই বা যাঁহারা জমির সদ্ব্যবহার করেন না, তাঁহাদের উপর অতিরিক্ত কর বসাইলে আমাদের বিবেচনায় সকল দিক হইতেই সুবিধা হইত। এ উপায় অবলম্বন করিলে জমিদারেরা স্থায়ী উন্নতির চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতেন। বর্ত্তমানে কৃষক সম্প্রদায় সামান্য সঙ্গতি এবং সঙ্কীর্ণ জ্ঞান অনুসারে তাহাদের যথাসম্ভব উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করে, অপর দিকে এমন অনেক জমিদার আছেন যাঁহারা নিজেদের জমিতে চাষ করাইতে ইচ্ছাও করেন না অথবা অন্য এমন কোন লোকের হাতে দিতে চাহেন না, যাহারা তাহাদের জমির বিশেষ যত্ন করিবে।

কমিটি বলিয়াছেন, যে সমস্ত কার্য্য করিলে কৃষক সম্প্রদায়ের উপকার হয় তাহাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা

আবশ্যক। কিন্তু এই সাধু উদ্দেশ্য কখনও কার্য্যে পরিণত হইবে কি না তাহা চিন্তা করিবার বিষয়।

জলকর সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু সে সমস্ত জটীল সমস্যার সমাধান আমরা বারান্তরে করিব।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে কমিটী রপ্তানী মালের কর [illegible] কিছু বলিয়াছেন, সে সমস্তই আমরা ইতঃপূর্ব্বে [illegible]নর রিপোর্টে জানিয়াছি। তাঁহারা বলেন, [illegible]ারতবর্ষের সম্পূর্ণ বা আংশিক আধিপত্য [illegible]র মূল্যের হার কমাইতে হইবে, এবং [illegible]ন বাণিজ্য শিল্পের উন্নয়ন কল্পে ব্যয়িত [illegible]

আমাদের মত কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। পাট, গালা প্রভৃতি জিনিষের উপর সংগৃহীত যে কৃষক সম্প্রদায়ের সাহায্যে এই অর্থাগম হয়, তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি ও উন্নতির নিমিত্ত ব্যয় করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সান্যাল মহাশয় খোলা পাটের উপর শতকরা ১০৲ টাকা এবং পাটের তৈয়ারী জিনিষের উপর শতকরা ২৲ টাকা অতিরিক্ত কর বসাইবার উদ্দেশ্যে Forward পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই উপায়ে প্রায় তিন কোটী টাকা আয় হইতে পারে। এবং তাহা আমাদের দেশে সাধারণ হিতকল্পে ব্যয়িত হইতে পারে। আপাততঃ পাটের উপর যে কর আছে,তাহাতে বাঙ্গালাদেশের বিশেষ লাভ নাই, এবং যে কৃষকেরা যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিয়া ইহা চাষ করে তাহাদেরও কোনরূপ উপকার হয় না। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে এই সকল কথা আমরা যেরূপ বুঝি বা অন্য দেশের লোকে যেরূপ বোঝে আমাদের "মনিবেরা" প্রায়ই তাহার বিপরীত দিকে যান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার সময় Dr. Galvez বলিয়াছিলেন, যে, "নাইট্রেট অফ সোডা'র একচেটে ব্যবসায় হইতে South America'n চিলি প্রদেশে এত প্রচুর জাতীয়ধনাগম হইয়াছে যে জগতের কেবলমাত্র চিলি দেশেই বালকবালিকাদিগকে বিনা বেতনে প্রাথমিক হইতে উচ্চ শিক্ষা পর্য্যন্ত দেওয়া হয়।"

বাঙ্গালাদেশেও পাটের একচেটে ব্যবসায় আছে, কিন্তু তদ্দ্বারা পাটচাষী কিছুমাত্র লাভবান হয় না। পাট ব্যবসায়ে জন কয়েক ইংরাজ ও অল্প সংখ্যক ভারতবাসী বণিক অর্থ উপার্জ্জন করে মাত্র। ইহা কি দেশের জলবায়ুর গুণে?

Bengal Government যখন India Government এর নিকট হইতে ভারতবর্ষের জন্য পাট ব্যবসায়ের করের ন্যায়সঙ্গত অংশ আদায় করিতে পারিলেন না, তখন আমরা প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য পাট এবং গালার উপর অতিরিক্ত কর আদায়ের প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইলাম।

"তৈলের বীজ এবং খইল ও হাড় প্রভৃতি সারের রপ্তানীর উপর কর বসাইলে, লভ্যের কিয়দংশ দ্বারা কৃষকদিগকে যথেষ্ট সার উৎপাদন করিবার শিক্ষা দেওয়া হইবে" কমিটীর তিনজন সভ্যের এই মন্তব্য আমাদের খুবই মনোমত হইয়াছে।

তৈলের বীজ এবং খইলের অতি সহজ রপ্তানী হওয়াতে ভারতবর্ষ বহুকাল অবধি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ইহা বন্ধ করিয়া দিলেও হাজার হাজার লোক তেলের কলে কাজ করিয়া অন্নের সংস্থান করিতে পারে। এবং "খোল" আমাদের দেশের জমির সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

'নাইট্রেট অফ সোডা'র সার আমদানী করিতে পারিলে চাল, গম, পাট, তুলা, তামাক ও চা'র মত প্রয়োজনীয় ফসলের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

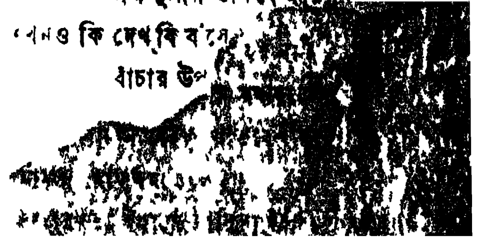
বড়ই দুঃখের বিষয় যে ভারতবর্ষ অতি প্রয়োজনীয় সার সকল প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করে কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে 'নাইট্রেট অফ সোডা'র মত উপকারী সার মাত্র ৫০০০ টন আমদানী হইয়া থাকে।

আমাদের শেষ কথা এই যে ভারতে প্রস্তুত চা, তামাক ও সিগারেটের উপর কর আদায় করা উচিত নয় বরং আমদানী সিগারেট প্রভৃতির উপর যথেষ্ট কর আদায় করিলে ভাল হয়।

বৈশাখের নিমন্ত্রণ

ও ভাই চাষি ও ভাই ধনী
　　ও ভাই জ্ঞানী, ও ভাই গুণি।
আজ বৈশাখের ডঙ্কা বাজে,
নব বাতাসের নব গানে
লক্ষ্মী মায়ের বোধন শুনে
　　রইবে শুয়ে ঘরে [illegible]।
আগের মত নাইক ধরে
　　আঙ্গিনাতে শঙ্খ শোনা।
আর ও মনে রইল [illegible]
　　কারে [illegible] [illegible] না।

ধন নিয়ে [illegible] কিই বা হবে [illegible]
　　রাখ্‌গে [illegible] [illegible]
আয় ছুটে আয় তাড়াতাড়ি
　　পুরাণ মা ডেকে ছুরে।
ঘরের [illegible] পায় না খেতে
　　নন্দ দুলাল শুকিয়ে [illegible]
এখনও কি দেখ্‌বি বসে
　　বাঁচার উপ[illegible]



—

ভোটারের ক[illegible]

শ্রীঅ[illegible]চন্দ্র মুখোপাধ্যায় [illegible]

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনের সময় আসিয়াছে। শীঘ্রই অনেক নির্ব্বাচন প্রার্থী ভোট পাইবার আশায় ভোটদাতৃগণের নিকট উপস্থিত হইবেন। কিন্তু এবার ভোট দিবার সময় অতি সাবধানে পাত্র মনোনীত করিতে হইবে। প্রত্যেক ভোটারকেই মনে রাখিতে হইবে যে, অনুপযুক্ত পাত্রে ভোট দিয়া ইহার অপব্যবহার করিলে নিজের অমঙ্গল নিজেরাই ডাকিয়া আনা হয়। ভোট যে ছেলে খেলার জিনিষ নহে—দেশের মঙ্গল সাধন কার্য্যে ইহার শক্তি যে কত অধিক প্রত্যেক ভোটদাতাকেই [illegible] তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে।

গতবার যাঁহারা সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার পর তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি মত কার্য্য করেন নাই—অনেকে [illegible] নাই। আমরা যাঁহাকে মনোনীত করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাই তিনি যে চেষ্টা করিলে অথবা ইচ্ছা করিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারেন এবং তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিলে [illegible] আমাদের অমঙ্গলই সাধিত হয়—ইহা স্মরণ রাখিয়া এবারকার নির্ব্বাচন কার্য্য করিতে হইবে খাতিরে পড়িয়া কাহারও সন্তোষ বিধান করিবার জন্য ভোট দেও[illegible] চলিবে না। দেশ সংগঠনের মহান কর্ম্মে গুরুভার এখনও আমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত কার্য্য [illegible] সুনিশ্চিতভাবে সমাধা করিয়া জাতিকে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যাইতে হইলে আমরা যেটুকু অধিকার পাইয়াছি তাহার এতটুকুরও অন্যায় ব্যবহার [illegible] বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কর্ম্মিগণের সম্মুখে [illegible] কর্ম্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ অবারিত ভাবে পড়িয়া আছে। গত কয়েক বৎসরের ব্যবস্থাপক-সভায় কৃষকদিগের অথবা [illegible] কার্য্যের উন্নতি বিধানের জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন কার্য্য করা হয় নাই। আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে কৃষককুলের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন [illegible] পারিলে দেশের [illegible] উপকার সাধিত [illegible] 'বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন' যাহাতে [illegible] প্রজাগণের প্রকৃত উপকার করিতে পারে সেইরূপ [illegible] সংশোধন করা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকে আমাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া একাগ্রচিত্তে তাহাদের সেবা করিতে হইবে। তাঁহাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যে কৃষিশিল্পের সম্যক উন্নতি বিধান করাই বর্ত্তমানে

[illegible] যাহাতে [illegible] প্রায় এবং [illegible] আইন সৃষ্টি [illegible], সার এবং [illegible] রপ্তানী করা [illegible] আইন [illegible] রেল-কোম্পানিকে [illegible] বাধ্য করা প্রয়োজন। [illegible] মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণকে কৃষিকার্য্যে উৎসাহ দিবার [illegible]। অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জমি [illegible] করিতে পারেন না। [illegible] [illegible] কে তাহাদের সকল কার্য্যে [illegible] দিয়া সাহায্য [illegible] গভর্ণমেণ্ট [illegible] উপর [illegible] [illegible] হাপক [illegible] নলিনী বাবুর [illegible] উপর [illegible]। মত যে [illegible] একটী প্রজাহিতকর কার্য্যের [illegible] হইয়াছে সেগুলি যাহাতে অচিরে কার্য্যে পরিণত [illegible] সভ্যগণকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিতে হইবে। এই প্রকার বহু কৃষিহিতকর কার্য্য এখন আমাদের [illegible] চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছে। এরূপ স্থলে সভ্য মনো[illegible] কার্য্যে আমাদিগকে অতি সন্তর্পণে বিচার-বিবেচনার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে।

এবার দুই শ্রেণীর নির্ব্বাচনপ্রার্থী ভোট দিবার জন্য অনুরোধ করিবেন বলিয়াই আমাদের ধারণা। অনেকে কোন দলের মুখপত্র স্বরূপ ব্যবস্থাপকসভায় যাইতে চাহিবেন, আবার কয়েকজন স্বয়ং একক হইয়া প্রবেশ লাভে সমুৎসুক হইবেন। প্রথমোক্ত নির্ব্বাচনপ্রার্থিগণও আবার ৩।৪টী বিভিন্ন দলে বিভক্ত থাকিবেন। ভোটাধিকারী বাইয়তগণকে প্রথম দেখিতে হইবে যে, ভোটপ্রার্থী কোন দলভুক্ত কিনা অথবা তিনি স্বক্ষমতায় কোন দলে যোগদান না করিয়া পৃথক্‌ভাবেই কার্য্য করিতে চাহেন।

যদি তিনি কোন দলের সহায়তায় দাঁড়াইতে চাহেন, তবে সেই বিশিষ্ট দলের উদ্দেশ্য, কর্ম্মপদ্ধতি প্রভৃতি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আরও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে সেই দলের মত প্রকৃতপক্ষে দেশের জনমত কি না। যদি সেই দলের কার্য্য পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য চাষী বাইয়তগণের স্বার্থের এবং কৃষিশিল্পের উন্নতির একান্ত পরিপোষক হয় তবে উক্ত দলের ভোটপ্রার্থীকে মনোনয়ন করা চলিবে।

আর যদ্যপি নির্ব্বাচনপ্রার্থী কোন দলপর্য্যায়ভুক্ত না হন তবে জানিতে হইবে যে, কোন্ বিশিষ্ট কার্য্য করিবার জন্য তিনি ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে ইচ্ছুক। নির্ব্বাচনের পর তিনি সভার ভিতরে ও বাহিরে কোন্ কোন্ কার্য্য সাধিত করিবেন। সে সকল কার্য্য করিবার মত তাহার সময়, ক্ষমতা এবং প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে কিনা তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কেবল তাহাই নহে, তিনি অতীতে দেশের কাজে কতটা স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানেই বা ভবিষ্যতের কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত কি প্রতিশ্রুতি দিতেছেন—এই সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া পাত্র মনোনয়ন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। নতুবা কর্ম্মপদ্ধতিহীন অযোগ্য স্বার্থান্ধ ব্যক্তিকে ভোট দিয়া নির্ব্বাচন করিলে কোনও ফলই হইবে না—ভোটের অপব্যবহার করা হইবে মাত্র—ফলে আবার তিন বৎসর সময়ের জন্য আমরা কুনির্ব্বাচনজাত নিজেদেরই দোষে নিজেরা উন্নতির আলোকময় পথে অগ্রসর হইবার পরিবর্ত্তে যে তিমিরে সে তিমিরেই পড়িয়া থাকিব।

———

বঙ্গীয় কৃষিক্ষেত্রের আয়তন

(মিঃ বি, এন, সরকার, বিহার কৃষি-বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ)

ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-সম্মত কৃষিকার্য্যের উন্নতির পথে এ দেশের জমিগুলির বদখত আয়তনই বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। ভারতের কৃষি-শিল্পের আলোচনা করিতে গিয়া অনেকেই এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিটিঙ্গ সাহেব বোম্বাই প্রদেশের কৃষি কার্য্যের আলোচনা করিতে গিয়া "A gricultural Progress in western India" নামক গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে এই প্রশ্নটী বিশদ ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। আমার মনে হয়, ঐ কথাগুলি বাংলা ও বিহার প্রদেশের সম্বন্ধেও বলা চলে। এখানে তাঁহার মতামতের বিশদভাবে সমালোচনা না করিয়া সংক্ষেপতঃ এই কথা বলাই যথেষ্ট যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এবং উত্তরাধিকারীসূত্রে জমি ভাগ হইতে থাকায় জমির আয়তন ক্রমে ক্রমে এত ছোট হইয়া আসিতেছে যে, সেগুলি অল্পব্যয়ে চাষ করিবার পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত হইয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে সমস্ত গ্রামেই জমিগুলি যেরূপ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া উঠিয়াছে তাহা বাস্তবিকই শোচনীয়।

জমি বিভাগ

কিটিঙ্গ সাহেব বলেন যে সুবৃহৎ জমিগুলি অল্প কয়েক ভাগে ভাগ করিয়া লইলে অল্পব্যয়ে চাষের অনুপযুক্ত হইবে না। কিন্তু আয়তন বেশী ছোট হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে নানা প্রকার অসুবিধাই ঘটিবে। পৈত্রিক সম্পত্তি যথাযথ বিভাগ করিয়া লইবার প্রবৃত্তির ফলেই জমিগুলির আকার ক্রমে ছোট হইয়া উঠিতেছে। উক্ত পুস্তকেই তিনি লিখিয়াছেন—"এক একর জমির পনের ভাগের এক ভাগ মাত্র জমি পাঁচ ভাগ করিয়া পাঁচ ভাই ক্রমান্বয়ে উহার এক একটী ভাগ চাষ করিয়া থাকে।"

উক্ত গ্রন্থ হইতেই এইরূপ জমি বিভাগের অনুপকারিতা দেখান হইতেছে।

১। এই প্রথা একটানা চাষের পক্ষে একটী বিশেষ বাধা; ইহাতে অল্প জমি চষিতে অধিক সময় নষ্ট হয়।

২। জমির স্থায়ী উন্নতির পক্ষে অন্তরায়।

৩। এইরূপ জমি হইতে চাষীর প্রয়োজন মত ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না।

৪। ইহাতে সাধারণতঃ বৎসরে দুইবার ফসল উৎপাদন করা চলে না।

৫। অনেক সময় আদৌ চাষ হয় না।

৬। পরিশ্রম এবং মূল ধনের সদ্ব্যবহার হয় না।

৭। জমির সীমানা লইয়া প্রতিবেশীর সহিত বিবাদ হয়, ফলে মামলা মোকদ্দমা চলে।

৮। সাধারণতঃ ইহাতে দারিদ্র্য উপস্থিত হয়।

সীমানা ও আলরক্ষা

উল্লিখিত কয়েক প্রকার ক্ষতি ব্যতীত বঙ্গ ও বিহারের "দেনোজমির" আইলের জন্য অনেকটা জমিও নষ্ট হয়। এবং এগুলি রক্ষা করিবার জন্য খরচও হয়। কিন্তু আলের জমি ইঁদুর এবং শস্য হানিকর পোকামাকড়ের আবাসস্থল হইয়া দাঁড়ায় মাত্র। বিহার সরকারের একটী কৃষি শালাতে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এক একরের দশ ভাগের এক ভাগ জমির আলের তিন বৎসরের খরচে এক একর লম্বাটানা জমি পাওয়া যায় এবং তাহাতে শতকরা প্রায় ৫০৲ টাকা বাঁচিয়া যায়।

জমিদারগণের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও উন্নতিশীল দেশে আইন করিয়া এই কুপ্রথা নিবারণ করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতে সেরূপ কোনও আইন এ পর্য্যন্ত হয় নাই। হিন্দু অথবা মুসলমানদিগের পক্ষে এইরূপ কোনও আইন নাই—এজন্য তাঁহারা এই নবসৃষ্ট আইন মানিতে রাজী হইবে না বলিয়াই বোধ হয় কিটিঙ্গ সাহেবের এই আইনের পাণ্ডুলিপি বম্বে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হয় নাই।

এখন উপায়?

এখন ইহা বেশ বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষভাবে আইন করিয়া এই জমিগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিবার প্রথা বন্ধ

করা চলিবে না। কিন্তু ভারতের কৃষিশিল্প রক্ষা করিতে হইলে এই কু-প্রথা নিবারণকল্পে সত্বর চেষ্টা করিতে হইবে। প্রত্যক্ষভাবে আইন না করিয়া এইরূপ অপর আইনের সৃষ্টি করা হউক, যাহাতে অপরোক্ষভাবে উক্ত ক্ষতিজনক বিভাগ প্রণালী নষ্ট হইতে পারে এবং চাষী স্বেচ্ছায় জমির উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হয়।

প্রজাসত্ত্ব আইন

সম্প্রতি বাংলা ও বিহারের ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাসত্ত্ব আইনের সংশোধনের কথা উঠিয়াছে। এই সংশোধিত প্রস্তাবগুলি আইনে পরিণত হইলে জমির ভোগসত্ত্ব হস্তান্তর করা চলিবে। এই আইনে প্রজার হয় ত কতকগুলি সুবিধা হইবে, কিন্তু জমির বিভাগের উল্লিখিত কুপ্রথা আরও বাড়িয়া যাইবে। কাজেই এমন কতকগুলি উপায় এখনই অবলম্বন করা উচিত যাহাতে সেগুলি আর বাড়িতে না পারে। কেবলমাত্র একটী আইন দ্বারা এই পুরাতন রীতি রদ করা যাইবে না। ফ্রান্স ও সুজারল্যাণ্ডের মত একাধিক অইন প্রণয়ন্ করা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলিকে একত্র করিয়া বৃহৎ জমিতে পরিণত করাই আমাদের চরম উদ্দেশ্য। তবে বর্ত্তমানে যাহাতে অতি ছোট আয়তনের জমিগুলি একত্র করিয়া তদপেক্ষা একটু বৃহৎ করিয়া তোলা যায় তাহারই জন্য কয়েকটী উপায় নিম্নে দেওয়া হইল।

১। এক একর পরিমিত জমিকে ১০ ভাগের অধিক ভাগে বিভক্ত করা হইলে তাহা আইনে গ্রাহ্য করা হইবে না কারণ,ঐরূপ জমি স্বল্প ব্যয়ে চাষের অনুপযুক্ত।

২। $\frac{১}{১০}$ একর অপেক্ষা ক্ষুদ্র জমির হস্তান্তর করিবার সময় জমিদারগণ তাহাতে সম্মতি দিবেন না।

৩। ~~বঙ্গদেশের~~ গ্রাম্য স্বায়ত্ব শাসন বিল এই মর্ম্মে সংশোধিত হউক যে যে ব্যক্তি এক একরের দশমাংশের এক অংশ অপেক্ষা ন্যূন জমির অধিকারী সে ইউনিয়ান বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবে না। অনেকে হয় ত মনে করিতে পারেন যে শেষোক্ত প্রস্তাবটীতে মূল প্রজাসত্ব আইনটী আহত হইতে পারে। কিন্তু এ আশঙ্কা অমূলক। কারণ ভোটাধিকার হারাইবার ভয়ে সকলেই ক্ষুদ্র জমিখণ্ডগুলিকে পরস্পর বন্দোবস্ত করিয়া এক বৃহৎ খণ্ডে পরিণত করিয়া লইতেই সমুৎসুক হইবে।

যাহা হউক যদি উক্ত নিয়মগুলিও কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব না হয় তবে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করিতে পারা যায়। বর্ত্তমানে যাহারা ন্যূনকল্পে ১৲ টাকা বাৎসরিক কর দেন তাহারা ভোট দিতে পারেন। এই নিয়মটী পরিবর্ত্তিত করিয়া এইরূপ করা হউক যে, যাহারা কমপক্ষে চারি টাকা বাৎসরিক কর দেয় তাহারা ত এখনকার মত ভোটাধিকার পাইবেনই অধিকন্তু যাহারা একলপ্তে অন্ততঃ পক্ষে এক একরের দশ ভাগের এক ভাগ জমি চাষ করিয়া থাকেন এবং বছরে কমপক্ষে আট আনা পর্য্যন্ত খাজনা দিয়া থাকেন তাহারাও উহাদের সমান অধিকার লইয়া ভোট দিতে পারিবেন। কারণ এই প্রকারের চাষী একটানা বৃহৎ জমি চাষ করিয়া দেশের কৃষিশিল্পের উন্নতির পথে সাহায্য করিতেছে।

এইরূপ আইন করিলে প্রথমে ভোটদাতার সংখ্যা কমিয়া যাইবে কিন্তু অল্পকরদাতৃগণ শীঘ্রই ভোটের ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য আপন আপন জমিগুলিকে ঐরূপে বন্দোবস্ত করিয়া লইতে ইচ্ছুক হইবেন।

পরস্পর জমি হস্তান্তর করিবার জন্য প্রজাদিগকে রেজিষ্ট্রেসন খরচ ও জমীদারের নজর খরচের হাত হইতে রেহাই দিতে হইবে নতুবা খরচের ভয়েই তাহারা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে।

জমির এইরূপ উন্নতি বিধানের জন্য কৃষকগণকে উৎসাহ দিতে হইলে নিম্নলিখিত সুবিধা করিয়া দেওয়া প্রয়োজন—

কাহারও যদি একলাগা ১৫ একর জমি থাকে তবে সেই জমিকে অল্পব্যয়ী খামার বলিয়া অভিহিত করা হউক, এই অল্পব্যয়ী খামারগুলি যতদিন অবিভক্ত থাকিবে ততদিন সে নিম্নোদ্ধৃত সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে :—

(১) বাকী খাজনার দায়ে অথবা মালিকের অন্য কোনরূপ ঋণের দায়ে অল্পব্যয়ী খামারের জমি বিক্রীত হইবে না। অবশ্য জমিদার অথবা উত্তমর্ণ জমির শস্য হইতে আপন আপন প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ জমির মালিক ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন। উক্ত মালিকের উত্তরাধিকারী

গণ অল্পব্যয়ী জমি বিভাগ করিয়া লইতে পারিবেন কিন্তু তাহা হইলে উল্লিখিত সুবিধাগুলি পাইবে না।

এই প্রস্তাবগুলি জুলুমবিহীন আইনে পরিণত করিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি অথবা মতদ্বৈধ হইবে না। ইহাতে ইউনিয়ন বোর্ডেরও কোন ক্ষতি নাই। বছর দশেক এই নিয়ম চালাইতে পারিলে সকলেই বৃহত্তর জমির উপকারিতা বেশ বুঝিতে পারিবে তখন জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করিবার কুপ্রথা দমন করিবার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে আইন প্রনয়ণ করা চলিবে।

"ফরওয়ার্ড"

বাঙ্গলায় পাটচাষ।

চারুচন্দ্র সান্ন্যাল, এল, এজি।

ব্যবসায়কেন্দ্রসমূহে এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশে পাটের অল্পতার জন্য হাহাকার উঠিয়াছে। সেজন্য আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের উপরই দোষের বোঝা নিক্ষেপ করা হইয়াছে। দোষ কতকটা কৃষকদিগের বটে কিন্তু যাহারা অতিরিক্ত লাভের আশায় উৎপন্ন পাটের উপর জুয়া খেলে আসলে দোষ সেই ব্যবসায়ীদের। এ বিষয়ে কৃষক ও ব্যবসায়ী উভয় সম্প্রদায়েরই অবহিত হওয়া ও লক্ষ্য রাখা উচিত।

ব্যাপার এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে চরমপন্থীরা আশঙ্কা করিতেছেন উৎপন্ন পাটের পরিমাণ পৃথিবীর প্রয়োজন সঙ্কুলান করিবার উপযোগী না হইলে পাট জগৎ হইতে বিতাড়িত হইতে পারে। কিন্তু পাটের ব্যবহার যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা দেখিয়া মনে হয় যে পাটের ব্যবহার হ্রাস হওয়া ত দূরের কথা ইহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। আমেরিকা প্রদেশে চিনির বস্তার জন্য ইহার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, এবং ইহাতেই বৎসরে বহু টাকার পাটের প্রয়োজন হইবে। বাঙ্গলার কৃষকদিগের, বিশেষতঃ ভারত সাম্রাজ্যের নিকট, একচেটিয়া ব্যবসায় হওয়ার দরুণ পাট অতি মূল্যবান সম্পত্তি। আমার মনে হয় বর্ত্তমানে যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করা হয় তাহাতে পৃথিবীর প্রয়োজন সঙ্কুলান অপেক্ষা অধিক পাট উৎপন্ন করা যাইতে পারে। শস্যাদি উৎপন্ন করিবার জমির পরিমাণ হ্রাস না করিয়া যাহাতে উত্তমরূপে চাষ ও উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিয়া আশানুরূপ ফল লাভ করা যায় তাহারই জন্য সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উৎপন্ন ফসলের হ্রাস বৃদ্ধির জন্য কৃষককুলই আংশিকভাবে দায়ী। তাহারা একই জমিতে নানা জাতীয় পাটের বীজ একত্রে মিশ্রিত করিয়া বপন করিতে ইতস্ততঃ করে না, এবং ফসল কাটার এবং পাট বাহির করিবার সময়েও কোনওরূপ সতর্কতা অবলম্বন করে না বা করিতে পারে না। ফলে, নানা জাতীয় পাট একত্র উৎপন্ন হয় এবং উহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পাটের বাজার-দামে বিক্রীত হইয়া থাকে। এস্থলে কলওয়ালাদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম, অসুবিধা ভোগ এবং খরচ করিয়া ভিন্ন জাতীয় উৎপন্ন দ্রব্যকে বাছাই করাইয়া লইতে হয়, সেই জন্য তাহাদেরও দোষী করা যায় না।

উচ্চমূল্যলাভেচ্ছু কৃষকদিগের এইরূপ দোষাবহ এবং অসাবধান বীজবপন প্রণালী অবশ্য পরিহার্য্য। যেরূপই হউক এক প্রকার বীজ পৃথকভাবে বপন করা এবং পাট পৃথক ভাবে জলে ভিজান উচিত।

সাধারণতঃ দুই জাতীয় পাটের চাষ হইয়া থাকে—তিতা পাট (ক্যাপস্থুলারিস) এবং মিঠা পাট (অলিটোরিস)। পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত সর্ব্বস্থানেই ক্যাপস্থুলারিস বা তিতা পাটের চাষ করা হয়, এবং পশ্চিমবঙ্গে অলিটোরিস বীজই

সাধারণতঃ বপন করা হয়। কারণ ক্যাপসুলারিস জাতীয় পাট একবার স্থায়ী হইলে অর্থাৎ ৪'৫ ফুট দীর্ঘ হইলেই গোড়ায় জল সহ্য করিতে পারে; কিন্তু অলিটোরিস জাতি ফসল কাটিবার সময় পর্য্যন্ত জল সংস্পর্শে থাকিলে গাছের অনিষ্ট হইয়া থাকে।

ক্যাপসুলারিস জাতির মধ্যে "ক্যাকায়া বম্বি" (Kakaya Bombii শ্রেণীর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ইহার ফসল প্রতি বৎসর প্রায় (৩া০ বিঘা) জমিতে দুই মণেরও অধিক পাওয়া যায় এবং উহার তন্তুও ভাল।

কৃষি বিভাগ বহু বৎসর ধরিয়া অনেক পরীক্ষার ফলে কয়েক প্রকার উত্তম বীজ আবিষ্কার করিয়াছেন। তন্মধ্যে ক্যাপসুলারিস জাতির মধ্যে—R85 D15 এবং ক্যাকয়া বোম্বাই এবং অলিটোরিসের মধ্যে চুঁচড়া গ্রীন উল্লেখযোগ্য।

পাটের গাছ সাধারণতঃ ১০।১২ ফুট উচ্চ হয়। কিন্তু উপযুক্ত সার সংযোগে চাষ করিলে পাট প্রায় ১৬ ফুট উচ্চ হইতে পারে এবং তাহাই বাঞ্ছনীয়। আর ধানের জমি না কমাইয়া কি উপায়ে চাষের খরচ কম হইতে পারে ও ফসল বৃদ্ধি পায় আমাদের সকলকে সেই চেষ্টা করিতে হইবে।

উত্তর এবং পশ্চিম বঙ্গে লাল মাটিতে উপেক্ষিত অংশে এই ফসলের চাষ হইয়া থাকে। কারণ বৃষ্টির অভাবে এই মাটি ফাটিয়া যায় এবং তাহাতে গাছের শিকড় ছিঁড়িয়া যায়, বা চারিদিকে শাখা বিস্তার করায় বাধা পাইয়া থাকে। যদিও গোবর সবুজ ও সারের ব্যবহারে মাটির দোষ অনেকটা কমিতে পারে, তথাপি এরূপ মাটিতে পাট চাষ করিতে হইলে গাছের পূর্ণ বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন বেশী প্রয়োজনীয়। নাইট্রেট অব সোডার মত সার গোবর সংযোগে ব্যবহার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

ফেব্রুয়ারী অথবা মার্চ্চ মাসের প্রথম বৃষ্টির পর জমি তৈয়ার করিতে হয়। গভীর করিয়া লাঙ্গল দিলে পাট-গাছের লম্বা শিকড়গুলি অতি শীঘ্র এবং সহজে অনেক দূর যাইতে পারে। ৫।৬ বার লাঙ্গল দিয়া এবং প্রত্যেক বার লাঙ্গলদিবার পর মই দিয়া মাটিকে ভাল করিয়া গুঁড়া করিতে হয়। যাহাতে জমিতে বড় বড় মাটীর চাপড়া না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কারণ বড় চাপড়ার নীচে পড়িলে ছোট বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না।

যদি বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া আগাছা পরিষ্কার করা যায় তাহা হইলে পরে নিড়েনির খরচ অনেক কমিয়া যায়। বীজ ছড়াইয়া বপন করিতে হয়' ইহার পর আবার একবার মই দেওয়া প্রয়োজন। ইহাতে বীজগুলি ঢাকা পড়িয়া যায় এবং মাটী নিংড়াইয়া জমির উপরিভাগে আদ্র'তা আনয়ন ও বীজ অঙ্কুরিত করিতে সাহায্য করে।

ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত বীজ বপন করা চলে। ক্যাপসুলারিস বপন করিতে ৩ হইতে ৫ সের, ও অলিটোরাস বপন করিতে ২ হইতে ৪ সের বীজের প্রয়োজন হয়। উত্তমরূপে কর্ষিত ভূমিতে ৩।৪ দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়। Mr. A. L. Gordon সরকারী পরীক্ষিত পাটের বীজের কণ্ট্রাক্টর। তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করিলে উৎকৃষ্ট পাটের বীজ পাওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গই বাঙ্গলার প্রধান পাট চাষের কেন্দ্র। সেখানে নীচু জমিতে বিনা সারে পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক বৎসর বন্যার সময় এই সকল জমিতে পলি পড়ে। এই কারণে সেই সকল নিম্ন জমিতে বিনা সারে পাটের চাষ সাধারণতঃ হইয়া থাকে; এবং সেই জন্য অনেকের ধারণা যে পাট চাষে সারের প্রয়োজন নাই। প্রায়ই পাট চাষ করিবার পর শীতকালে এই সকল জমিতে খেঁসারির ফসল লওয়া হয়। পলি হইতে পটাস এবং এই সকল শুঁটীজাত ফসল হইতে জমি যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন শোষণ করে। সুতরাং এরূপ মাটীতে সাধারণ ফসলের জন্য সার না দিলেও চলে, তবে যে স্থানে সাধারণ অপেক্ষা দীর্ঘ এবং পরিমাণে বেশী পাট উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা থাকে সেই সকল যায়গায় রাসায়নিক সারের ব্যবহারে যথেষ্ট ফল দর্শাইবে সন্দেহ নাই।

পাটের জমিতে ফসফরিক এসিডের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে তন্তুপূর্ণ ফসলের কখন কখন ক্ষতিও করে। এই কারণে জমিতে উপযুক্ত

পরিমাণ ফসফরিক এসিড পাইবার জন্য হাড়ের গুঁড়া অথবা অন্যরূপ অন্যান্য যে সমস্ত ফসফো-আত্মক সার অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে কার্য্য করে তাহাই প্রয়োগ করা বিধেয়।

তন্তুপূর্ণ ফসলের পক্ষে পটাসন্ত সারের বিশেষ প্রয়োজন এবং এই উপাদানের অভাবে "রিজকটহিয়া" নামক ব্যারাম হয়। বাঙ্গলার পলিময় মৃত্তিকাতে যথেষ্ট পরিমাণ এই উপাদান আছে। সহজপ্রাপ্য কচুরি পানার ছাই ব্যবহার করিলেও সুলভে এই উপাদান পাওয়া যাইতে পারে।

পাট চাষের পক্ষে গোবরের সার বিশেষ উপকারী। কারণ, ইহা জমিতে খাদ্য দ্রব্যের বৃদ্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে জমির জলধারণের শক্তিও বাড়াইয়া তোলে।

বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ বহুদিন ধরিয়া অনেক রাসায়নিক সার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন গোবরের সহিত রাসায়নিক সার মিশ্রিত করিয়া দিলে যথেষ্ট সুফল দর্শে।

বঙ্গদেশের ২৪ পরগণা জেলায় জামালপুরে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের জমিতে প্রথম তিনটী এবং রাজীবপুর, দোগেছিয়া ও বারাসতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের জমিতে বাঙ্গলার Deputy Director of Agriculture Mr. F. Smithএর অধীনে District Agricultural Officer Mr. S. K. Dutt এবং Superintendent of Agriculture, Mr. H. P. Mittra মহাশয়দ্বয়ের তত্ত্বাবধানে চতুর্থ পরীক্ষাটী হইয়াছিল।

জমি,	বিঘাকরা সার	বিঘাকরা উৎপন্ন ১	২	৩	৪
১।	স্থানীয় সার	৩৷৷০মণ	৪মণ	৪মণ	৫৷৷০মণ
২।	নাইট্রেট অব সোডা Basic Superphosplate	৬৮০	৭৮০	৭৮০	৭৷৷০
নাইট্রেট অব সোডা এবং Basic Superphosphat সাহায্যে ফসলের বৃদ্ধি		৩৷০	৩৮০	৩৮০	২

চুঁচুড়া সরকারী কৃষিক্ষেত্রে বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের দ্বারা নাইটেট অফ্ সোডার সারের সাহায্যে পাট উৎপন্নের ফল।

জমি	প্রতি একারে সার মন	জমির পরিমাণ একার	প্রতি একারে উৎপন্ন মন
১। বিনা সারের প্রয়োগে	০	১	১৪৷৷০
২। গোবর	১	১	১৫৷৷০
৩। নাইটেট অফ্ সোডা	১	১	২০৷৷০
নাইটেট অফ্ সোডা সংযোগে সার দেওয়ায় জমির ফসলের বৃদ্ধি		১ একার	৬ মণ
প্রতি একারে অধিক পাটের মূল্য ৮৲ টাকা হিসাবে			৪৮৲ টাকা
প্রতি মণ নাইট্রেট অফ্ সোডার দাম			৯৲ টাকা

নাইটেট অফ সোডা সংযোগে প্রতিএকারে লাভ ৩৯৲টাকা

পশ্চিম বঙ্গের Deputy Director of Agriculture, F. Smith. মহাশয় নাইট্রেট অফ সোডা সংযোগে কয়েকটী পরীক্ষা করিয়া এইরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"এই সারের সাহায্যে পাটের চারা শীঘ্রই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সাধারণতঃ পাটের জমিতে গোবরের সার দেওয়ার প্রথা। তাহার অতিরিক্ত নাইটেট অফ্ সোডাতে কোনরূপ ফল হয় কিনা দেখিবার জন্য ১৯১৬ সালে বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তাহাতে নিম্নলিখিতরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে :—

		প্রতি একারে উৎপন্ন মন	নাইটেট অফ্ সোডার সাহায্যে বৃদ্ধি মন
ক।	গোবর ১৩০ মন	১৫	০
খ।	গোবর ৫০ মন, নাইট্রেট অফ্ সোডা—১ মন ৩৩ সের	২১	৬

১৯১৭ সালে বর্দ্ধমান গোলাবাড়ীতে নাইট্রেট অফ্ সোডার ফল।

সার	পাটের উৎপন্ন প্রতি একারে মন	বৃদ্ধি সার সংযোগে মন
ক। সার না দিয়া	১২॥০	০
খ। রেড়ির খইল—৩ মণ, নাইট্রেট অফ সোডা— ১ মন—৬৩ সের	১৭	৪॥০

নাইট্রেট অফ্ সোডা তিন চারি গুণ শুষ্ক মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া জমিতে ছিটাইয়া দেওয়া বিধেয়।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের নিপুণ কর্ম্মচারীগণের দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষার ফল।

পরীক্ষা।	প্রতি একারে চাষের খরচ	প্রতি একারে সারের খরচ টা, আ, পা	প্রতি একারে চাষের মোট খরচ টা, আ, পা	প্রতি একারে লাভ টা, আ, পা	প্রতি একারে ফলন পরিমাণ তন্তু মন, সে, ছ	ফলন মোট মূল্য টা. আ, পা
১। বিনা সারে	৭৯-১৫-৬		৭৯-১৫-৬	৩২-১০-৬	১৪ ২১-৪	১১২-১০ ০
২। গোবর প্রতি একারে ৮০ মন	৭৫-৬-৩	৫-১৪-৭	৮১-৪-১০	৩৮ ৯ ৩	১৫-১৮-১২	১১৯ ১৪-০
৩। সোডিয়াম নাইট্রেট প্রতি একারে ১ মন	৯০-৮-৯	৫-০-১০	৯৫-৯-৭	৬৩-০-৭	২০-১৮-১২	১৫৮-১০-২
৪। ক্যালসিয়াম নাইট্রেট প্রতি একারে ১ মন	৭৯-৬-৩	৬-৫-১০	৮৫-১২-১	৪১-১১-৪	১৬-১৭-১৩	১২৭-৭-৫

প্রতি একারে ১ মন নাইট্রেট অফ্ সোডা সংযোগে উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী ফল পাওয়া গিয়াছে। তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়—

কেহ কেহ প্রতি একারে ৬ মন খইল দিবার বিধি দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে আমার বিবেচনায় কৃষকদিগের অনেক খরচ পড়ে—প্রায় ২৪৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা। ইহা অপেক্ষা ৫০ মন গোবর, ১ মন নাইট্রেট অফ্ সোডা এবং ১ মন হাড় দেওয়া ভাল। ইহাতে প্রতি একারে খরচ ১৮৲ এবং বিঘায় ৬৲ টাকার অধিক পড়িবে না এবং ফলও অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে।

গোবর এবং হাড় জমি তৈয়ারী করিবার সময় প্রয়োগ করা এবং যাহাতে ঐ গুলি বীজ-বপনের পূর্ব্বে উত্তমরূপে মাটির সহিত মিশিয়া যায় সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। চারাগুলি যখন ৬।৮ ইঞ্চি দীর্ঘ হইবে তখন নিড়াইবার পর জমিতে নাইট্রেট অফ্ সোডা প্রয়োগ করিলে আশাতীত ফললাভ করা যাইতে পারে। কারণ উক্ত সার প্রয়োগের ইহাই বিশিষ্ট সময়।

ফরিদপুরের District Agricultural Officer রায় সাহেব D. N. Mitra মহাশয়ও নাইট্রেট অফ সোডার সন্তোষজনক ফললাভ করিয়াছেন। Indian Scientific Agriculturist পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি প্রতি একারে এক মন নাইট্রেট অফ সোডা ব্যবহারের বিধি দিয়াছেন।

যাহাতে গাছগুলি শাখাপ্রশাখা বিস্তার না করিয়া সোজা উঠে এবং মাটী হইতে উত্তমরূপে পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে এজন্য গাছগুলি যতদূর সম্ভব নিয়মিত ব্যবধানে বাড়িতে দেওয়া প্রয়োজন। পাটের শ্রেণী এবং তাহাদের বড় হইবার পদ্ধতি অনুসারে এই ব্যবধানের তারতম্য হইয়া থাকে। এই সমস্ত তত্ত্বাবধান করা কৃষকদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

পাট চাষে নিড়ানি অবশ্য কর্ত্তব্য। কতবার ইহার প্রয়োজন তাহা পূর্ব্বতন চাষের উপর নির্ভর করে। ক্যাপসুলারিস জাতীয় প্রত্যেক দুইটি চারার মধ্যে ৬ ইঞ্চি এবং অলিটোরিস জাতীয় প্রত্যেক দুইটির মধ্যে ৮ ইঞ্চি ব্যবধান রাখা উচিত।

যখন ফলগুলি সম্পূর্ণরূপে পাকে তখন তন্তু বাহির করিবার জন্য গাছ কাটিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। সকল সময় ইহা সম্ভবপর হইয়া উঠে না, বিশেষতঃ যাহাদের অধিক জমির আবাদ আছে। এই নিয়মে কাজ করিতে গেলে সময় মত মজুরও পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিবে। এইরূপ কৃষকদিগের জন্য যখন গাছ সমস্ত ফুল পূর্ণাবস্থ হয় অথবা ফল ধরিতে আরম্ভ করে সেই সময়ে, কাটিলে সুবিধা হইতে পারে। গাছগুলি কাটিবার পর প্রথমে ছোট ছোট আঁটি বাঁধিয়া জলে ভিজান হয়,—ও পরে পাঁকাটি হইতে পাট খুলিয়া লওয়া হয়। কাঁচা গাছের ওজনের শতকরা ৪।.০ হইতে ৫ ভাগ পাট পাওয়া যায়।

ভিজাইবার প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন জেলার অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন। ইহারই উপর পাটের তন্তুর শক্তি এবং রং অনেকটা নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গের যেখানে গভীর জলের অভাব সেখানে মাটীর চাপড়ার ভার দিয়া তাড়াগুলি ডুব ইয়া রাখা হয়। এইরূপে উপর স্তরের পাটগুলি খোলা থাকায় অনেক সময় দাগ ধরিয়া যায়। যতদূর সম্ভব ইহা বর্জ্জন করা আবশ্যক।

পাট পচিতে প্রায় ১৫ দিন সময় লাগে, কিন্তু গাছগুলি অধিক পুষ্ট হইলে এক মাসও লাগিতে পারে। যাহাই হউক মধ্যে মধ্যে গাছগুলিকে পরীক্ষা করা আবশ্যক বিশেষতঃ যতদিন না তন্তুগুলি ডাঁটা হইতে খুলিয়া আসে। ভিজান ডাঁটাগুলিতে একপ্রকার আটার দ্বারা লাগিয়া থাকে এবং ইহার বর্ত্তমানে তন্তুগুলি কম জোর ও কাল্‌চে ভাব ধারণ করে। অধিক ভিজান থাকিলে তন্তুগুলি দুর্ব্বল এবা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অবশেষে পরিষ্কার জলে তন্তুগুলি পৃথক ভাবে ধৌত করিয়া পরে রৌদ্রে শুষ্ক করা হয়।

(ক্রমশঃ)

কৃষির কথা

(শ্রীগিরিজাকান্ত মুখোপাধ্যায়)

(১)

কৃষি যে "কালচার এ বিষয়ে আমরা আমাদের দেশে কেহই agree করি না। কিন্তু ইংরেজীতে চাষের যে অর্থ, agriculture, তা culture ত বটেই, এ বিষয়ে agreement ও কথার মধ্যেই আছে। কথাটাকে এ ভাবে বলার মধ্যে হাস্যের বিষয় থাকতে পারে, কিন্তু যাঁরা শব্দ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানেন তাঁরা এ কথা হয় ত শুনেছেন যে প্রত্যেকটা জিনিষের নাম বিভিন্ন দেশে চিন্তা প্রণালীর বৈচিত্রের দ্বারাই অনেকখানি প্রভাবান্বিত হ'য়ে থাকে এবং বহু অতীতকাল থেকে হ'য়ে এসেছে। আমাদের দেশে চাষ থেকে চাষী এবং তার পরে চাষা পর্য্যন্ত হ'য়েছে, কিন্তু এ শব্দটার সম্মান দেওয়া আমরা সঙ্গত মনে করিনি। cultivation culture এ সমস্ত কথাগুলো ইংরেজীতে যে অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে সে রকম অর্থে কৃষি 'চাষ' বা আমাদের দেশে কেনোদিনই ব্যবহৃত হয়নি। দুই জাতির বিভিন্ন মনোভাবের, আদর্শের পার্থক্যের দৃষ্টান্ত হিসাবেও এটাকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

(২)

ইংলণ্ডে অথবা য়ুরোপে কৃষি সম্বন্ধে লোকের ধারণা আমাদের কৃষি ও কৃষককে কতখানি সম্মান দিলে থাকে তার সংবাদ আমাদের কাছে কিছু কিছু এসে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে চাষ-বাসকে এমন ঘৃণার চোখে দেখার কারণ কি তা খোঁজার প্রয়োজন হ'য়েছে। এখানে সেখানে আমরা চাষ-বাসের একটু আধটু উন্নতি করতে পারি, কিন্তু আসল রোগ যেখানে তা শুধরাতে না পারলে এ'তে সত্যি কিছু হ'য়ে উঠ্‌বে না। আমরা চাষ করাকে অপমানজনক মনে করি, চাষীকে ঘৃণা করি,"চাষা" আমাদের কাছে গালাগালি, এ ব্যাধির প্রতিকার সহজে হবে না। যে মানসিক মোহ, চিন্তার অবসাদ, আমাদের সকল দেহে মনে এই জড়তার বেড়ী পড়িয়েছে, তাকে ছেদন করা খুব সোজা কাজ হ'বে না। এ সম্বন্ধে আমাদের জাতীয় চিত্তকে সচেতন করার জন্য কৃষি-আন্দোলন এবং কৃষক-আন্দোলন দুটোই হওয়া দরকার। কৃষকের দুঃখ, অসুবিধা দূর করা যেমন আমাদের কাজের প্রোগ্রাম হবে, কৃষির আদর্শের দিকটা মানুষের মনে সম্মানিত করাবার জন্য তেমনি একটা অকাজের প্রোগ্রামও করতে হবে! আমাদের দেশে এই আন্দোলনের এ রকম দুটো শাখা হওয়া বাঞ্ছনীয় ব'লে মনে হয়।

(৩)

কৃষির theoretical দিকটা এক শ্রেণীর চিন্তাশীল লোকের নজরে ইতিমধ্যেই প'ড়েছে। বাংলা দেশে শ্রমিক-কৃষক-আন্দোলন, এরই অভিব্যক্তি। কৃষক শ্রমিকের কাজকে আর সকলের চোখে সম্মানিত করার ইচ্ছার উপরেই এর ভিত্তি। শ্রীযুক্ত বার্টাণ্ড্ রাসেলের কথায় একে আমরা 'prestige movement' বল্‌ব। কিন্তু এর আর একটা দিক আছে—যাকে তুচ্ছ করা অত্যন্ত অন্যায় এবং বিপজ্জনক হ'বে। কৃষক ও শ্রমিকের প্রতি অবহেলা একটা মস্ত বড় আন্দোলনের কারণ হতে পারে, কিন্তু তাদের দিন দিন সুখ-দুঃখের, বর্ত্তমানের অভাব অভিযোগের বিষয়ে কেবল একটা distant ideal এর সাধনায় যদি আমরা উদাসীন হই, তা হ'লে আমাদের কাজ সবখানি করা হ'বে না। এই দুটো জিনিষ পরস্পরের করোলারী হলে হয় ভালই, তা না হলেও এর প্র্যাক্‌টিক্যাল দিকটায় আমাদের কাজের সূত্রপাত ক'রতে হবে! চাষী মজুরের ছোট খাটো কথাগুলো ভুলে গিয়ে, তাদের ভবিষ্যতে সুবিধার জন্য আমরা বড় কিছুই করতে পারব না। তাদের এখনকার দুঃখটা সরাবার কোনো চেষ্টা না ক'রেই আমরা তাদেরকে কোনো বড় আদর্শের পেছনে চালিত করতে পারব না। আমাদের দেশের পলিটিক্যাল আন্দোলনে একথা সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, কৃষক-শ্রমিকের আন্দোলনেতে তাই সত্য হবে।

(৪)

শুধু য়ুরোপের নয়, পৃথিবীর সব দেশেই লোকের মন পরিবর্ত্তনের জন্য উৎসুক হ'য়ে উঠেছে। আমাদের আধুনিক সভ্যতা যে পথে এগিয়ে চলছিল সেই পথে আসল পরিচয় জানবার ইচ্ছা আজ নিখিল মানবকে চঞ্চল করে তুলেছে। এই চাঞ্চল্যেই য়ুরোপের indnstrial revolution কিন্তু এই বিদ্রোহেই মানুষ সমস্ত সত্য পায় নাই। বর্ত্তমানের সম্বন্ধে হয় ত সে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হবে, কিন্তু ভবিষ্যতের পথের রেখা তার চোখে উদ্ভাসিত হ'ল না। সেই জন্যই মানুষের মন চিন্তার ক্ষেত্রে আবার অভিযান করেছে।

(৫)

য়ুরোপের Revolution গুলোর মধ্যে একটা কথা সুস্পষ্ট হয়েছে, যে পলিটিক্স, বা ইন্‌ডাষ্ট্রী মানুষের চরম লক্ষ্য হতে পারে না। তারা এ গুলোর ভেতর দিয়ে অভীষ্ট পাবার ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু পায়নি। এই জন্য এক দল লোক Neo-Religio-spiritual আন্দোলন সুরু করেছেন এবং আর এক দল Neo-Economic আদর্শ প্রচার করছেন। প্রথম দল, পৃথিবীর কল্যাণকে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নির্দ্দেশ করছেন, দ্বিতীয় দল সমাজের একটা নূতন অর্থনৈতিক সংহতিকে ভবিষ্যত মানুষের চরম আদর্শ বলে ঘোষণা ক'রেছেন। আধ্যাত্মিক বা ধর্ম্ম-আন্দোলনের পরীক্ষা পৃথিবীতে অনেক হ'য়েছে। দ্বিতীয় আন্দোলনই প্রকৃত পক্ষে নূতন।

এর আধ্যাত্মিক আদর্শ হয় ত আছে,কিন্তু প্রধানতঃ এটা অর্থনৈতিক চেষ্টা। মানুষের সহজ জ্ঞানের উপর এঁরা বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। সহজ বুদ্ধি প্রণোদিত ভূমি-বিভাগে বিরোধ কম্‌বে ব'লে এঁরা আশা করেন। কৃষি এঁদের মতে এই সমস্যা সাধন করবার পক্ষে খুব সহায়তা করবে বলে এঁরা ভেবেছেন। কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন সহজ এবং সরল উন্নতিই জগতের ভবিষ্যত সমস্যার উত্তর। আপনার কাগজ সে উদ্দেশ্যকে সাহায্য করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

দুগ্ধ অধিকক্ষণ জ্বাল দেওয়া উচিত কি না?

দুগ্ধ অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু কাঁচা দুধে নানা রোগের বীজাণু অতি সহজেই অনুক্রামিত হয় বলিয়া দুগ্ধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অধিকক্ষণ ধরিয়া জ্বাল দিলে এই রোগ-বীজাণু বিনষ্ট হয় বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহার খাদ্যাংশও কিয়ৎ পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায় কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এই প্রশ্ন লইয়া অনেক গবেষণা করা হইয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় নাই। গত ফেব্রুয়ারী মাসের Conquest নামক পত্রিকায় একটী প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কয়েকটী কাজের কথা বলা হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধকারের মতে দুগ্ধ কতগুলি জলমিশ্রিত ছোট ছোট চর্ব্বি অণুর সমষ্টিমাত্র। কেসিন ও এলবুমেন নামক দুইটী পদার্থ আছে যাহাতে দুধ ও চর্ব্বি পৃথক হইয়া যাইতে পারে না। ইহা ছাড়া দুগ্ধে চিনি, সোডিয়াম (ক্ষার) আইরন লৌহ জাতীয় পদার্থ এবং ভিটামিনও থাকে। অধিকক্ষণ ধরিয়া জ্বাল দিলে এই লবণ জাতীয় পদার্থগুলি নষ্ট হইয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে যদিও Calcium এবং Phosphorus জাতীয় লবণ পদার্থ অধিক উত্তাপে জলের সহিত পৃথক হইয়া তলায় পড়ে না তথাপি সরের মধ্যে ও কড়ার চারিধারে জমাট বাধিয়া লাগিয়া থাকে। এই লবণ জাতীয় পদার্থগুলি মানুষের খাদ্য দ্রব্য জীর্ণ করিতে অতিশয় প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর। দেখা গিয়াছে যে অধিক জ্বাল দিলেও খাদ্যাংশ "ভিটামিন" নষ্ট হয় না বটে কিন্তু এই লবণ জাতীয় দ্রব্যগুলি নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে দুগ্ধের উপকারিতা অনেকটা কম হইয়া পড়ে।

সুতরাং এ কথা সহজেই অনুমেয় যে অল্প আঁচে বেশীক্ষণ ধরিয়া জ্বাল না দিয়া অধিক উত্তাপে মিনিট-খানেক জ্বাল দিলে উহার পুষ্টিকর খাদ্যাংশ এবং উপকারিতা অনাহত থাকে। উক্ত দুই প্রণালীতে সিদ্ধ করা দুধই ব্যবহার করাইয়া দেখা গিয়াছে যে অধিক উত্তাপে অল্প সময় গরম করা দুগ্ধ শরীরের অধিক পুষ্টি-সাধন করিতে পারে। অতএব বুঝা যায় যে শিশুও সাধারণ মানুষের জন্য দুধ জ্বাল দিতে হইলে বেশী আগুনে মিনিটখানেক সিদ্ধ করিয়াই নামাইয়া লইতে হইবে। অতঃপর সেই গরম দুধ এমনভাবে খানিকক্ষণ ঘন ঘন নাড়িতে হয় যাহাতে চর্ব্বি পদার্থগুলি জমিয়া গিয়া কড়ার চারি পাশে লাগিয়া না যায়।

এই প্রণালীতে জ্বাল দেওয়া দুধ হয়ত সম্পূর্ণভাবে রোগ বীজাণু-মুক্ত হইতে পারে না কিন্তু উহা সাধারণ স্বাস্থ্যবান মনুষ্যের পক্ষে কোনরূপ ক্ষতিজনক হইবে না।

আমাদের এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে উক্ত প্রণালী কতটা কার্য্যকরী হইতে পারে তাহা অবশ্য বিবেচনা—ও পরীক্ষার বিষয়।

গমের ফুল ফোটা

অন্তর্ভূত এবং বহির্ভূত উৎপাদকের পরস্পরের কার্য্যের ফলে গমের ফুল ফোটে। যখন ফুলগুলি ফুটিবার সময় হয় বায়ু বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের ফুটিবার হার ও নির্দ্দিষ্ট সময় নিরূপিত হয়। এখন, বহির্ভূত উপাদানগুলি, গম ফুল ফুটিবার কতদুর সাহায্য করে সে সম্বন্ধে নুতন কিছু বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই অভিলাষে পরীক্ষিত গাছগুলি এমেরিকায় ওয়াশিংটনের এক বাগানে জন্মান হইয়াছিল। সাত বৎসরে চারিটি গাছে চারশতেরও অধিক ফুল ফুটিয়াছিল তাহারা প্রায় একই সময়ে ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছিল। আরও আলিংটন পরীক্ষা স্থলের গাছ ও খোলা মাঠের গাছের সহিত তুলনা করিবার জন্য অতিরিক্ত পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছিল। যেমন প্রত্যেক ফুলটী ফুটিল অমনি পর্য্যবেক্ষণ এবং তারিখের গোলমাল নিবারণ করিবার জন্য থালি, নিক্ষিপ্ত পরাগ কেশরগুলি সরাইয়া ফেলা হইল।

ফুল ফুটিবার প্রণালী—সুবিধাজনক অবস্থায় গম ফুলগুলি প্রথমে ধীরে ধীরে তৎপরে দ্রুত গতিতে ফোটে। পাপড়ীগুলি খুলিবার পর সুত্রগুলি পরাগকেশরগুলিকে ফেলিয়া দেয়। সেগুলি লম্বা হইয়া যায় এবং যখন সম্পূর্ণরূপে দুরীকৃত হয় তখন ঝুলিতে থাকে। কিন্তু কতকগুলি ফুল ফুটিবার পুর্ব্বেই পরাগ-কেশরগুলি বাহির হইয়া ঝুলিয়া পড়িতেও দেখা গিয়াছিল।

এই ফুলগুলির মধ্যে একটি, দুইটী অথবা তিনটী পরাগকেশর দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কতকগুলি ফুলের পরাগকেশর আংশিকভাবে বাহির হইয়া থাকিতে দেখা যায়। তিন "মিনিম" লম্বা পরাগ কেশর বাদে সুক্ষ্মসুত্রগুলি দশ "মিনিম" পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা গিয়াছে। একবার একটি সুত্রকে দশ মিনিটে দশ "মিনিম" লম্বা হইতে দেখা গিয়াছিল। বিখ্যাত উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ "আস্কানেসে" বহু গম এবং rye ফুলের সুত্র মাপিয়া বলিয়াছেন যে, সুত্রগুলি অধিকাংশ স্থলেই প্রতি মিনিটে এক হইতে দেড় মিনিম লম্বা হয়। সম্পূর্ণরূপে নির্গমনের অব্যবহিত পরেই পরাগগুলি পরাগকেশরের সহিত বাহিরে আসিয়া পড়ে। এই পরাগের তৃতীয়াংশ নিজ ফুলের মধ্যে পড়ে। অবশিষ্ট পরাগগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া অন্য ফুলের মধ্যেও পড়ে। পার্শ্ববর্ত্তী ফুলের পরাগকেশরগুলি সরাইয়া দিলে এইরূপে বর্ণশঙ্কর pollinatoin হয়। পাপড়ীগুলি খুলিবার অসুবিধা হইলে গম ফুলের পরাগকেশরগুলি বহির্গমন না করিয়াই পরাগ ছড়ায়, অথবা সেগুলি পাপড়ীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বাহির হয়। শতকরা প্রায় পাঁচটী এইরূপ ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। পরীক্ষার প্রত্যেক বৎসরেই একটী বা ততোধিক বহু পরাগকেশর বিশিষ্ট ফুল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা গিয়াছিল একটী ফুলে যাহাতে ছয়টী পরাগকেশর ছিল। এই সমস্ত ফুলেই শস্য পাওয়া গিয়াছিল। জলবায়ুর গুণে প্রত্যেক ফুলেই বহু পরাগকেশর পাওয়া যাইতে পারে।

গমফুল ফুটিবার প্রণালী নানা প্রকার। কতকগুলি ফুটিতে এক মিনিটেরও কম সময় লাগে, আবার কতকগুলি ফুটীতে তিন মিনিট বা ততোধিক সময় লাগে। ফুল ফুটীতে আরম্ভ হওয়া হইতে পরাগকেশরগুলি বাহিরে আসিয়া দোদুল্যমান হওয়া পর্য্যন্ত অনেক সময় কাটিয়া যায়। পঁচিশটী ফুল পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ফুল ফুটীতে ১ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড হইতে ৫ মিনিট ২৫ সেকেণ্ড সময় যায়; তাহাতে গড়ে প্রত্যেক ফুল ফুটিতে তিন মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড সময় যায়। ঋতুভেদে ফুল ফুটিবার সময় কম বেশী লাগে;—পরাগ কেশরগুলি কখনও পাপড়ী দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, আবার কখনও বায়ু, তাপ, ও বৃষ্টির গতির উপর নির্ভর করে। পাপড়ীগুলি খুলিতে এবং বন্ধ হইতে ১১ মিনিট হইতে ৬৬ মিনিট পর্য্যন্ত সময় লাগিতে দেখা যায়। পাপড়ীগুলি বন্ধ হইবার যথাযথ সময় নিরূপন করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে,

কারণ পাপড়ীগুলির মধ্যে কতকগুলি পরাগ কেশর থাকিয়া যায়।

ফুল ফুটিবার সময়—৪০৬টী ফুলের মধ্যে ৩৫০টী সূর্য্যাস্তের মধ্যে, গোধূলির সময় ২৮টী এবং রাত্রিকালে ২৮টী ফুটিয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে দিবাভাগে শতকরা ৮২.৮৬টী, গোধূলি সময় শতকরা ৬.৯টী এবং রাত্রিকালে শতকরা ৬.৯টি ফুল ফোটে। দিবাভাগে অধিক ফুল ফুটিয়াছিল বলিয়া যেন সাধারণে মনে না করেন, যে ফুল ফোটার জন্য দিবালোক বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ খোলা মাঠের ও অন্ধকার ঘরে রক্ষিত গমফুলও একই ভাবে ফোটে দেখা গিয়াছে।

কতকগুলি গম ফুলের মঞ্জরী সম্পূর্ণরূপে পরিপুষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া রাখিয়াও দেখা গিয়াছে যে তাহারও ফোটে, তবে মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম সূত্রগুলি লম্বা হয় না এবং পরাগকেশরগুলি খোলে না। আর এক কথা ফলগুলি কয়েকদিন যাবৎ খোলা অবস্থায় থাকে।

ভেজিটেবল্ প্রডাক্ট বা উদ্ভিজ্জ ঘৃত

আমাদের দেশে খাদ্যদ্রব্যের সহিত নানা অপকৃষ্ট দ্রব্যের ভেজাল দেওয়ার কুপ্রথা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে ফলে সাধারণের স্বাস্থ্যের অবস্থা শোচনীয় ভাবে অবনত হইয়া পড়িতেছে। সমস্ত খাদ্য অপেক্ষা ঘৃতেই অধিক ভেজাল চলে। এতদিন নানারূপ মৃত জীবের অনিষ্টকর চর্ব্বিই ঘৃতের সহিত মিশ্রিত হইয়া আসিতেছিল কিন্তু সম্প্রতি বিদেশজাত একপ্রকার উদ্ভিজ্জ তৈল পদার্থ নূতন আমদানী করিয়া ঘৃতের সহিত মিশাইয়া ঘি বলিয়াই বাজারে প্রচলিত করা হইতেছে। এই পদার্থটীর নাম ভেজিটেব্‌স্ প্রডাক্ট। নারিকেল তৈল প্রভৃতির ন্যায় ইহা উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত হয়। অবশ্য উহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহাতে না কি কোন অনুপকারী পদার্থ নাই। কিন্তু অনুপকারী পদার্থ নাই বলিয়াই যে তাহা স্বাস্থ্যের উন্নতির পথে অনুকূল হইবে এমন হইতে পারে না। আমরা যাহা আহার করি তাহা স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের জন্যই করিয়া থাকি। এরূপ স্থলে যে দ্রব্যের দ্বারা শরীর পুষ্টি হইবে না তাহা পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া আহার করাতে কোনও ফল নাই। বিশেষতঃ যাহা ঘি নহে তাহা ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘি বলিয়া প্রচলন অথবা ঘিয়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা কখনই সমর্থিত হইতে পারে না। অনেকে আইন করিয়া ইহার উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করাইয়া ইহার বহুল প্রচার বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সরকার বলেন যে আইন করিয়া ইহার আমদানী বন্ধ করিলে ঘৃতে স্বাস্থ্যহানিকর দূষিত পদার্থের ভেজাল বাড়িয়া যাইবে কারণ প্রয়োজন অনুযায়ী ঘি এদেশে উৎপন্ন হয় না। সরকারের এই উক্তির বিরুদ্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে তাহার উক্ত কথা সত্য হইলে বিদেশ হইতে আনীত উদ্ভিজ্জ ঘৃতের আমদানী যতশীঘ্র সম্ভব কমাইবার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন কারণ যদি এই পদার্থ ঘিয়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহার প্রচলিত হইয়া যায় তবে আমাদের দেশের অবনত গোশালা ও গাভীগুলির অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িবে। একেই ত এদেশে গরু এবং গোশালার রীতিমত যত্নের অভাবে গব্য পদার্থের উৎপাদন কমিয়া আসিতেছে এরূপ স্থলে যদি উদ্ভিজ্জ পদার্থ আসিয়া ঘিয়ের স্থান অধিকার করিয়া লয় তবে গব্য উৎপাদন প্রচেষ্টা যে আরও কমিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব সরকার হইতে ইহার আমদানী কমাইবার জন্য সত্বর চেষ্টা না করা হয় তবে ফল যে কি হইবে তাহা

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু কেবল আইন সৃষ্টির আশায় সরকারের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না। যাহাতে আমাদের গোশালার অবস্থা উন্নত করিয়া প্রচুর পরিমাণে দুধ ঘি উৎপন্ন করা যাইতে পারে তাহার জন্য সরকারের সাহায্যে ও বেসরকারী ব্যক্তিগত ভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। স্থানীয় মিউনিসিপালিটীরও লক্ষ্য রাখা উচিত যে এই ভেজিটেবল প্রডাক্ট যেন ঘি নামে ও ঘিয়ের পরিবর্ত্তে বাজারে প্রচলিত না হয়। অধিকন্তু ভেজাল দেওয়ার কুপ্রথা যাহাতে সমূলে বিনষ্ট হয় অবিলম্বে এরূপ আইন সৃষ্টিকরা ও তাহা কার্য্য করিবার চেষ্টা কর সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য।

চাষার গান

মাটিই আমার অন্নদাতা
মাটিই আমার গেহ
মাটিই আমার পূজার দেউল
ওর উপরেই স্নেহ।
মাটিই এ যে কি কৌশলে
রূপ ধরেচে ফুলে ফলে
ধান্যে ধনে ভুবন ভরে
শান্তির নীড় করল গেহ।

আমার দেহ এও যে মাটি
কি সুন্দর এ পরিপাটি
আহা! দেখে দেখে আশ মেটেনা
তবুও এ যে মাটিই খাঁটি।
এই জীবনের শেষের দিনে
মিলবো আবার মাটির সনে
ভুলবো সকল দুঃখ জালা
পেয়ে মায়ের অগাধ স্নেহ॥

শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল, বি, এল,

বেলজিয়ামে স্ত্রীলোকদিগের কৃষিশিক্ষা

বেলজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষ, গ্রামের উন্নতিবিধায়ক কার্য্য করিতে ইচ্ছুক এরূপ ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমের বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র স্ত্রী জাতির সম্পূর্ণ শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কৃষিকার্য্যের সহিত গৃহকর্ম্মও শিক্ষা দেওয়া হয়। কেন না, উভয় কর্ম্মই বাস্তব জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বেলজিয়াম এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ছয়টী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যুদ্ধের পর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া অধুনা ২০টীতে পরিণত হইয়াছে।

এই সমস্ত স্কুলে প্রবেশধিকার লাভ করিতে হইলে ১৭

বৎসর বয়ঃক্রমের সময় কোন Secondary বিদ্যালয় হইতে ছাড়পত্র লইয়া আসিতে হয় এবং সেই সঙ্গে "গৃহ ও কৃষি কর্ম্মের উপযোগী" এই মর্ম্মে ডাক্তারের সার্টিফিকেট ও দাখিল করিতে হয়।

রন্ধন, খাদ্যাখাদ্য বিচার, কাপড়-কাচা ও অপরাপর গৃহস্থালীর কাজ, মুরগী, শূকর প্রভৃতি পশুপালন ও শাক সব্‌জী প্রভৃতি উৎপাদনের প্রণালী শিক্ষা দেওয়া দুই বৎসর ব্যাপী পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত। এখানে কাল্পনিক শিক্ষা অপেক্ষা প্রয়োগিক শিক্ষাই অধিক হয়। প্রত্যেক ছাত্রীকে একে একে সমস্ত কাজই শিখান হয়।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা দেশে স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত কৃষি-বিদ্যালয় ত দূরের কথা, পুরুষদিগের জন্যও অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের কথা আমাদের জানা নাই। পশ্চিমাঞ্চলে যে দু'একটী আছে সেখানেও কেবল নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকদিগকেই লওয়া হয়। আসলে তাহারা ভদ্রসন্তান; লেখাপড়া হিসাবেই এই বিদ্যা আয়ত্ত করে। এ সমস্ত শিক্ষা করা যাহাদের নিতান্ত প্রয়োজন—দেশের ভরসা স্থল সেই কৃষককুল, এই অবশ্য জ্ঞাতব্য বিদ্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞই রহিয়া যায়।

পণপ্রথার প্রসাদে বাঙ্গলা দেশে কৃষকেরা বিবাহিত হয়, তাহাদের জীবনের শেষভাগে। সমস্ত জীবনের অশেষ পরিশ্রমলব্ধ কয়েক শত রজতমুদ্রার বিনিময়ে অতীত যৌবনে কোন তরুণী কিশোরীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহারা কৃতার্থ হয়।

কেন না তাহাদের সমাজে কন্যার যত বৎসর বয়স তত শত টাকা পণ দিতে হয়। ভদ্র সমাজের ঠিক বিপরীত। ভদ্র সমাজে পুত্রের পিতা গলায় ছুরি দেন,—আর নিম্ন সমাজে কন্যার পিতা সে গৌরবজনক কার্য্যটী করিয়া ধন্য হন।

এইরূপে নিম্ন সমাজে পিতা অনেক সময়ে পুত্র মুখ নিরীক্ষণ না করিয়া অথবা পুত্রের শৈশবেই মারা যায়। অনাথ পুত্র একটু বড় হইলেই অন্যের গরু চরাইয়া, অথবা ভদ্রগৃহস্থের ফরমাস খাটিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। কিছুকাল পরে শরীরে বল হইলে দিনমজুরের কার্য্য করিতে থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে জাতিব্যবসায় অথবা প্রাথমিক শিক্ষা কিছুই তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

এই ত গেল পুরুষদের কথা; স্ত্রীলোক দিগের অবস্থা আরও শোচনীয় ৫।৬ বৎসর বয়সে তাহাদের বিবাহ হয় এবং পিত্রালয়ের সহিত সম্বন্ধ এক প্রকার শেষ হয়। তারপর যৌবন সীমায় পদার্পণ করিতে না করিতে স্বামীর অভিভাবকত্ব হারায় তবে তাহাদের শিক্ষা হইবে কি করিয়া?

এ দেশে প্রায় প্রত্যেক তৃতীয় বর্ষে আজন্মা হয়। সে সময়ে পেটের দায়ে তাহাদের মধ্যে অনেককে হাল গরু বিক্রয় করিতে হয়। অতএব দেখা যায় অতি অল্প সংখ্যক কৃষকেরই দুগ্ধবতী গাভী আছে। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান ও দক্ষিণবঙ্গের খৃষ্টান কৃষকেরা প্রায় সকলেই ডিমের জন্য হাঁস ও মুরগী পালন করে।

এই অভিশপ্ত শ্রেণীর লোক যে কবে নিজেদের চেষ্টায় সমাজকে বলশালী করিয়া গড়িয়া তুলিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। তবে ভদ্র সমাজ নিজেদের স্বার্থের দিকে না চাহিয়া ইহাদের দুর্ব্বলতা নষ্ট করিতে যত্নবান হইলে সকল দিক রক্ষা হয়। যেমন প্রজা ব্যতিরেকে রাজ্য চলে না, তেমনই কৃষককুলকে বাদ দিয়া জাতীয় উন্নতির আশা করাও বাতুলতা।

বাংলার ভূস্বত্ব

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ

বাংলায় প্রজাস্বত্ব আইন সম্বন্ধে আবার কথা উঠিয়াছে। ইংরেজ বাংলা দেশের রাজস্বের অধিকারী হইয়া সারা বাংলার রাজস্ব আদায়ের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করিলেন লর্ড কর্ণোয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই বাংলায় তহশীলদার ও প্রজা, জমীদার ও রায়তরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে জমীদারের অধিকারের দৌরাত্ম্যে প্রজার অধিকার সঙ্কুচিত হইয়া আছে—তাই যথাসম্ভব এই আইন দ্বারা সেই অধিকার মুক্ত করিয়া লইতে হইবে—ইহাই আলোচ্য।

বিলটি বাংলার ল'টের শাসন হইতে বিবেচনার জন্য কৌন্সিলে আসিবে—কৌন্সিল সদস্যেরা বিবেচনা করিয়া মতামত ব্যক্ত করিবেন।

বিলটিতে জমীদারের অধিকার কিছু কিছু ছাড়িবার প্রজার অধিকার কিছু কিছু বাড়িবার ব্যবস্থা আছে। মধ্য-স্বত্ববান্ বলিয়াও জমিদার ও প্রজার মধ্যে এক একটি শ্রেণী আছে; তাহাদিগের অধিকার শূন্যে উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থাও ইহাতে আছে।

এই আইন চালাইবার জন্য কেহ কেহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে ব্যঙ্গ করিয়া 'কর্ণোয়ালিসী বেদ' আখ্যা দিতেছেন। জমীদার অত্যাচারী মধ্য-স্বত্ববান কিছু না, যে চাষ করে সেই সব—যে প্রজা সেই সব—আলোচ্য আইনে যাহা নাই, যাহা হইলে কিরূপ হইবে—যাহা সাধারণে কল্পনাই করিতে পারে না—তেমন সব অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর বিষয়ও অনেকে এ বিষয়ে গবেষণা করিতে করিতে বাহির করিয়া আপনাকে জন-দরদী রূপে প্রচার করিতে শ্লাঘা বোধ করিতেছেন।

এ আইনের অদল বদল লইয়া আলোচনা আজই নূতন হইতেছে না, ইতঃপূর্ব্বে আরো হইয়াছে। এ সম্বন্ধে লেখা-লেখিও কিছু কিঞ্চিৎ হইয়াছে—তবে সভা-সমিতি কিরূপ হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ পাইতেছি না।

সেকালের লেখায় প্রজাহিতৈষীরা যে সব যুক্তি প্রজাদের পক্ষ লইয়া দেখাইয়াছিলেন ও কর্ণোয়ালিসী কীর্ত্তি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে সব দোষ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আজকালকার এ বিষয়ে উদ্যোগীরা তার চেয়ে বেশী কিছু জোরের কথা বলিতে পারেন নাই—তবে ধোঁয়াটে সমীকরণবাদ অথবা বলশেভিজমের অজ্ঞাত প্রেরণায় জিনিসটি আরও মুখরোচক করিতেছেন সন্দেহ নাই।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও প্রজাপক্ষ হইয়া বহু লিখিয়াছিলেন। এ সব লেখায় ইনি জমীদারদের প্রজা-শোষক ও দেশের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "মুসলমানদিগের সময়ে প্রথম জমীদারের সৃষ্টি। তাঁহারা রাজ্য শাসনে সুপারগ ছিলেন না। যেখানে হিন্দু রাজগণ অবলীলাক্রমে প্রজাদের নিকট কর সংগ্রহ করিতেন, মুসলমানেরা সেখানে কর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা পরগণায় পরগণায় এক এক ব্যক্তিকে কর-সংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন। তাহারা একপ্রকার কর সংগ্রহের কন্ট্রাক্টর হইল। রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহাদিগের লাভ থাকিবে। ইহাতেই জমিদারীর সৃষ্টি, এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীড়নের সৃষ্টি,—এই কন্ট্রাক্টরেরাই জমিদার। রাজার রাজস্বের উপর যত বেশী আদায় করিতে পারেন ততই তাঁহাদের লাভ। সুতরাং তাঁহারা প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বেশী আদায় করিতে লাগিলেন। প্রজার যে সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল তাহা বলা বাহুল্য।

তাহার পর ইংরেজেরা রাজা হইলেন। তাঁহার যখন রাজ্যগ্রহণ করেন তখন তাহাদিগের সেই অবস্থা। তাহাদিগের দুরবস্থা মোচন করিবার জন্য ইংরেজদিগের ইচ্ছার ত্রুটি ছিল না; কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস্ মহাভ্রমে পতিত হইয়া প্রজাদিগের আরও গুরুতর সর্ব্বনাশ করিলেন। তিনি বলিলেন যে জমিদারদিগের জমিদারীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব নাই বলিয়াই, জমিদারীতে তাঁহাদিগের যত্ন হইতেছে না। জমিদারীতে তাঁহাদিগের স্থায়ী অধিকার হইলে পর, তাহাতে তাঁহাদের যত্ন হইবে। সুতরাং তাঁহারা প্রজাপীড়ক না হইয়া প্রজাপালক হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃজন করিলেন। রাজস্বের কণ্ট্রাক্টরদিগকে ভূস্বামী করিলেন।

তাহাতে কি হইল? জমিদারেরা যে প্রজাপীড়ক, সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে প্রজাদিগের স্বত্ব একেবারে লোপ পাইল। প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী; জমিদারেরা কস্মিন্‌কালে কেহ নহেন—কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণওয়ালিস যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারদিগকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরেজরাজ্যের বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র—কস্মিন্‌কালে ফিরিবে না; ইংরেজদিগের এই কলঙ্ক চিরস্থায়ী। কেন না এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী।

বঙ্গীয় কৃষাণদের সম্বন্ধে এই সব প্রবন্ধগুলি লিখিবার সময় মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য পণ্ডিত বাকল, লেকী প্রভৃতির গ্রন্থ-ভাবে তন্ময় ছিলেন। তাই নিজে দেশের সত্য অবস্থা অনেক তাঁহার চোখ এড়াইয়া গিয়াছে মনে হয়।

সে কথা পরে বলিতেছি। কিন্তু এমন সাবধানী ও মহাগর্ব্বী লেখক বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার প্রজাবিষয়ক রচনার প্রতিকূল সমালোচনা পাইয়া উত্তর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

উত্তরে তিনি এক পক্ষাবলম্বীর দৃঢ়তা একেবারে না ছাড়িলেও শিথিল করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন:—এই প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইলে পর 'সমাজদর্পণ' নামে একখানি অভিনব সংবাদপত্র দৃষ্টি করিলাম। তাহাতে 'বঙ্গদর্শন ও জমিদারগণ' এই শিরোনামে একটি প্রস্তাব আছে। আমাদিগের এই প্রবন্ধের পূর্ব্বপরিচ্ছেদের উপলক্ষে উহা লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি। কেন না, লেখক যেরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, অনেকেই সেইরূপ বিবেচনা করেন বা করিতে পারেন। তিনি বলেন,—

'একেই ত দশশালা বন্দোবস্তের চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত খনন করা হইয়াছে। তাহাতে 'বঙ্গদর্শনের' মত দুই একজন সম্ভ্রান্ত বিচক্ষণ বাঙ্গালীর অনুমোদন বুঝিলে কি আর রক্ষা আছে?

আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারি যে দশশালা বন্দোবস্তের ধ্বংশ আমাদিগের কামনা নহে বা তাহার অনুমোদনও করি না। ১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গ সমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গ-সমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভাবা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরেজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারত-মণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কু-পরামর্শ আমরা ইংরেজদিগকে দিই না।

যে দিন ইংরেজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব, এবং ইংরেজেরাও এমন নির্ব্বোধ নহেন যে, এমত গর্হিত এবং অনিষ্টজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। আমরা কেবল ইহাই চাহি যে, সেই বন্দোবস্তের ফলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে, এমন সুনিয়ম করিলে তাহার যতদূর প্রতীকার হইতে পারে তাহাই হউক।

কথিত লেখক লিখিয়াছেন যে,—'যাহাতে দশশালা বন্দোবস্তের কোনরূপ ব্যাঘাত না হইয়া জমিদার ও প্রজা উভয়েরই অনুকূলে এরূপ সুব্যবস্থা সকল স্থাপিত হয় যে, তদ্দ্বারা উভয়েরই উন্নতি হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই কর্ত্তব্য।' আমরাও তাহাই চাই।

ইহাও কর্ত্তব্য যে, আমরা কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্তকে ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং অনিষ্টকারক বলিয়াছি বটে, কিন্তু ইংরেজেরা যে ভূমিতে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া এ দেশীয় লোকদিগকে তাহাতে স্বত্ববান করিয়াছেন, এবং কর-বৃদ্ধির অধিকার ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা দুষ্য বিবেচনা করি না। তাহা ভালই করিয়াছেন; এবং ইহা সুবিবেচনার কাজ, ন্যায়সঙ্গত এবং সমাজের মঙ্গল-জনক। আমরা বলি যে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের সহিত না হইয়া প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলেই নির্দ্দোষ হইত। তাহা না হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং অনিষ্টজনক হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশের কৃষক—দেশের শ্রীবৃদ্ধি, জমিদার প্রাকৃত্রিম নিয়ম, আইন ইত্যাদি অনেক রকমের সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

অমর লেখকের এই আলোচনাগুলি পাঠ করিলে দেশের অত্যাচারী ও ব্যসনাসক্ত জমিদার ও ভূস্বামীদের মনে কিছুকালের জন্যও অন্ততঃ নিজের অবস্থার চিন্তা আসিবে। মতামত সব বিচারসহ ও আধুনিক সত্য অবস্থার অনুরূপ না হইলেও একপক্ষ টানিয়া বলা হইলেও নানা তথ্যে ইহা সমৃদ্ধ;—সমর্থনযোগ্য ও খণ্ডনীয় দু'রকম অভিমতই আছে ইহাতে। খণ্ডনেও আনন্দ পাওয়া যায় বলিয়াই বর্ত্তমান আলোচনায় অমর বঙ্কিমকে টানিয়া আনা।

জমিদার শ্রেণীটাই দশশালা বন্দোবস্ত সৃষ্টি করিয়াছে—ইহার আগে জমিদার বলিয়া কিছু ছিল না—বঙ্কিমের এই মত। কিন্তু একমাত্র রাজা ছাড়া আর কি ভূম্যধিকারী কেহ ছিলেন না? সেই স্মরণাতীত হিন্দুরাজগণের আমলের ভূমিস্বত্ব প্রাপ্ত কোন কোন বংশ এখনো দেশে আছে। এককালে ইঁহারাও দেশের কোন স্থানের অনেক ভূমির মালিক ছিলেন।

এই সব ভূমির মালিক ও প্রজার জমিদারের লাঠিয়াল বরকন্দাজ তো থাকিতই; তা ছাড়া লুট তরাজ ও খণ্ড যুদ্ধের উপযোগী সৈন্য-সামন্ত ও হাতিয়ারও সর্ব্বদা তৈয়ার থাকিত।

একালের জমিদারের মত বাকী খাজনাই একমাত্র সম্বল ছিল না। তাহাদের—দেশের বড় রাজাকে তুষ্ট রাখিয়া নিজে যথেচ্ছ নিজ ভূমি ও প্রজা শাসন ও রক্ষা করিতেন।

ইঁহারাও অনুগ্রহ প্রাপ্তদের ও খ্যাতিমানদের গুণের আদর করিবার জন্য তাহাদের ভূমি দান করিতেন—খেলাৎ দিতেন—পদবী দিতেন।

আজও যে ভূমি ও পদবীর অধিকারী বংশ এ দেশ হইতে লোপ পায় নাই। এভাবে যাহারা ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা কি ভূস্বামী নহে?

ভূমি যে কর্ষণ করে তাহারই হইতে পারে, অপর কেহ ভূস্বামী হইতে পারে না—এ মত প্রাচীন শাস্ত্রেও আছে। বঙ্কিমচন্দ্রও এই মত পোষণ করেন—এখনকার প্রজাপক্ষীয়েরাও এই মত একটা খুব বড় নীতি হিসাবেই প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বৈদিক যুগে যখন চারিদিকে শুধু বন জঙ্গল বা শূন্যভূমি হাহাকার করিতেছে দেখা যাইত—তখন পতিত ভূমিই স্বামী পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিত। যে কেহ ইচ্ছা করিয়া কর্ষণ করিলেই তাহার স্বত্ব উপভোগ করিতে পারিত।

কিন্তু চিরদিন সমানে যায় না—একদিন জমি ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যাইত, আর এখন মাথা খুঁড়িলেও মেলে না।

একদিন পতিত অনাবাদী ভূমি কর্ষণ করিবার জন্য তোষামোদ করিয়া লোক মেলে নাই—লোক-সংখ্যা তখন অল্প ছিল, দেশের ভূমির শস্য বাহিরে যাইবার সুবিধা হয় নাই—জীবন সংগ্রামের তীব্রতাও আফ্রিকার মত হয় নাই। আজ এই পারিপার্শ্বিক কারণগুলি দেশ জাকিয়া উঠিতেই ভূমি ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইতেছে।

কিন্তু দেশে এখনো বহু পতিত জমি আছে। পূর্ব্ব-

বঙ্গের বহু মুসলমান আসাম অঞ্চলে ও চরে গোলাবাড়ী রাখে, বসত বাস্তুবিত্তও করে। সরকারের নূতন নূতন খাস মহালেও এমন জমি মাথা পিছু বহু পরিমাণে বিলি হইতেছে। এই সব পতিত জমির আবাদী স্বত্ব বা জোত স্বত্ব লইবার জন্য অনেক স্থলে প্রথম প্রথম আশানুরূপ লোকও মেলে না। ক্রমে অবশ্য এমন জমির কর্ষণ ব্যবস্থা হইতেছে। কারণ জমির লোভে লোকে দূরান্তরে যাইবার ভীতি ত্যাগ করিতেছে।

বাংলা দেশও মাটির ইহা সত্য কথা—কিন্তু এই মাটির দেশেরই স্বতন্ত্র বৈচিত্র্য ও সত্তা আছে। বাংলার ভূমির উপর প্রকৃতির মার ও আশীর্ব্বাদ যেমন বর্ষিত হইতেছে এমন আর কোন দেশের ভূমির উপর হয় কি না জানি না।

বাংলার কৃষির উন্নতি অবনতি প্রকৃতির নিগ্রহানুগ্রহের উপরই বিশেষ নির্ভর করে। বাংলার ভূমি সংস্থান ও প্রকৃতির খেয়ালের উপরেই নির্ভর করিতেছে।

বাংলা নদী-মাতৃক দেশ। এ দেশের শিক্ষা সভ্যতা ও সম্পদ অনেকটা নদীর গতিই চালিত করিতেছে। বাংলার ভূমির উপর নদীর কতটা প্রভাব তাহাই বলিব।

বাংলার অতল নদী গর্ভস্থিত বহু স্থান আজ বিরাট জন-কোলাহল-মুখরিত নানা-সম্পদ-ভূষিত ভূমি-স্বত্বে পরিণত হইয়াছে। আবার বহু সম্পদপূর্ণ বিরাট বসতি ও কত কৃষিক্ষেত্র নদীর অতলে লীন হইয়া গিয়াছে! বাংলায় বৎসর বৎসর কত ভূমি যে শিথস্তি পয়স্তি হইতেছে দেশকে যাঁহারা দেখেন, তাঁহারা তাহা বুঝিবেন।

বাংলার নদীর ভাঙ্গনে বৎসর বৎসর কোটি কোটি মুদ্রার ভূ-সম্পত্তির চিহ্নও থাকিতেছে না। কথাটিকে যাহারা অতিরঞ্জিত মনে করেন তাঁহারা একবার চাঁদপুর হইতে বরিশাল লাইনে যাইতে সুপারী নারিকেলের রাজ্য বরিশালের মেঘনা বক্ষগত ও তীরবর্ত্তী স্থানের ম্লান সম্পদ শ্রী দেখিলে বুঝিবেন।

বাংলার ভূমি-সম্পদ ও তাহার স্বত্বের আলোচনায় দেশের নদীর প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

দেশে যখন লোকসংখ্যা কম ছিল, ভূমির জন্য এমন কাড়াকাড়ি পড়ে নাই, তখন ভূমিকে বাস-যোগ্য ও চাষ-যোগ্য করিবার জন্য লোক খুঁজিতে হইত। এই ভাবে কোন চরকে জনপূর্ণ পরগণা ও ফলবান সারবান বৃক্ষ-শোভিত বসতি করিবার ভার কোন কোন ক্ষমতাবান্ সাহসী মানুষই গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাঁরাই পরে রাজা, জমীদার, পরগণার মালিক বা অংশীদার আখ্যা পাইয়াছেন।

জনপূর্ণ চাষ ও বাসের ভূমির উপর জনের অধিকার অবশ্যই আছে—কিন্তু এ অধিকারকে নিয়ম ও শৃঙ্খলার দ্বারা স্থাপিত যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা ভূস্বামী আখ্যা বরাবর পাইয়াছেন। জন বা প্রজার এ কৃতজ্ঞতা না থাকিলে জনপদের সৃষ্টি কি করিয়া সম্ভব হইত?

হিন্দুর শাস্ত্রে ধর্ম্মে, ক্রিয়াকাণ্ডে ভূস্বামীকে দেবতার অর্ঘ্য দেওয়া হয়। মুসলমানেরাও ভূস্বামীকে অশেষ শ্রদ্ধা করেন। ভূস্বামীও প্রজার গুণ ও মর্য্যাদা অনুযায়ী তাহাদের প্রতিষ্ঠিত করিতে, পুত্রবৎ পালন ও রক্ষণে নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

ভূস্বামী ও প্রজা দুই যেখানে সত্য সম্পর্ক লইয়া চলিতে পারিয়াছে সে স্থান উন্নত হইয়াছে, যেথায় তাহা হয় নাই সে স্থান অবনত হইয়াছে—রাজা প্রজা দুই-ই ধ্বংস বরণ করিয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে কিছুদিন সোণার বাংলার অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল—তহশীলদার ও প্রজার মধ্যে, মূলতঃ রাজা ও প্রজার মধ্যেই, কিরূপ খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা তৎকালীন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি বুঝিবেন।

সারা বাংলা ব্যাপিয়া তখন দুর্ভিক্ষ, হাহাকার, লুণ্ঠন, জোর জুলুম চলিতেছিল। ভূমির রাজস্ব আদায়কারী তখন প্রজার রক্ষণে মন দিতে পারিতেছিলেন না—কি উপায়ে খাজনা আদায় করিবেন তাহাই ভাবিতেছিলেন।

প্রজার খাজনা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই অবশ্য দেয়। রাষ্ট্রের রাজা শাসক বা রক্ষক অবশ্যই থাকিবেন, রাজা ছাড়া রাজ্য চলিতে পারে না। প্রজা ভূস্বামীই হোক বা

ভূমিকর্ষণকারীই হোক, তাহাকে রাজকর দিতেই হইবে। কিন্তু এই কর প্রজা ও দেশের ফলপ্রসূ ভূমি রক্ষার সুব্যবস্থা না করিয়া - রাজকীয় কর্ত্তব্য শাসন সংরক্ষণ না করিয়া আদায় করিতে গেলেই তাহা শোষণ আখ্যা লাভ করে।

এই অবস্থা হইতে বাংলাকে রক্ষা করিয়াছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার জমীদার, তালুকদার ও প্রকৃত ভূস্বামীদের স্বীকার করিয়া দেশের শান্তি, কৃষি ও ধন জন সম্পদ বাড়াইবার সুযোগ দিয়াছিল। বাংলার ইংরাজ-রাজের সুশাসনে শান্তি আনয়ন করিবার প্রথম সোপান এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; দেশের প্রজাসাধারণের এই যথাসম্ভব স্থির ভূস্বামীত্ব ভারতেরই অন্যান্য প্রদেশবাসী এখনো পাইলে বাঁচিয়া যায়।

বাংলার কৃষি ও জমি বন্দোবস্তী এতটা নির্ঝঞ্ঝাটে চলিতেছে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংস কামনা দেশ-জীবনেরই ধ্বংস কামনা; একটা আত্মকলহের রাবণের চিতা জ্বালাইয়া রাখা ছাড়া আর কিছুই নহে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোর বিদ্বেষী বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। এখন কেহ কেহ আইনের জড়িত বিদ্যাজালে বা জন প্রাধান্যের মোহময় স্বপ্নজগৎ নির্ম্মাণে এ দিকটায় আর দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছেন না। কিন্তু এই সব আইন অদল বদলের কথা আরম্ভ হইতেই দেশের পল্লীতে পল্লীতে জমীর অধিকার লইয়া নিজেদের মধ্যে কলহ যে ভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে এই জন আন্দোলনের হোতারা কিরূপ আত্ম-তৃপ্তি লাভ করিবেন!

দেশের মঙ্গল ও অমঙ্গল কোনটা ইহাতে বেশী আসিবে?

বঙ্কিম বলিয়াছেন, প্রজাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলেই ভাল হইত। ভাল এই হইত—দেশের শ্রেষ্ঠ রাজশক্তির সঙ্গে প্রজারই সম্পর্ক থাকিত—মাঝে আর কাহারও স্থান থাকিত না।

কিন্তু তখন কি দেশে এ ভাবের এত প্রজা ছিল? দেশের জমীদার, তালুকদার বা জোতদার বাকী খাজনা করে, বড় জোর অত্যাচার করে; কিন্তু বড় রাজার সঙ্গে কিস্তি খেলাপীতে—সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই নীলাম এ ক্ষেত্রে অবধারিত। কে এ অবস্থায় জমীদারীর হাঙ্গামা বা শ্রেষ্ঠ রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ গোলযোগ রাখিবার বাসনা রাখিত?

আজ যেমন জমী, প্রজা, খাজনা ইত্যাদি লোভনীয় আকার ধারণ করিয়াছে দু'এক পুরুষ আগেও দেশের অবস্থা এরূপ ছিল না। কত জমীদার পত্তনীদারদের লাটের খাজনা ওঠে নাই বলিয়া ভূসম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। নূতন প্রজা বসাইবার জন্য—তাহাদের ভূমি, জমী ও স্নেহ দিয়া পুত্রসম পালন করিতে হইয়াছে।

দেশান্তর হইতে কত নূতন প্রজা এই ভাবে ভিন্ন দেশ গ্রামে জমীজমার মালিক হইয়া আসিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। স্থানীয়-জমীদার ইহাদের গুণের মর্য্যাদার জন্য নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর, ভোগোত্তর, দেবোত্তর প্রভৃতি অকাতরে দিয়াছেন।

জমীদার প্রজাকে ভূস্বামী করিয়াও কিন্তু দু'একটি সামান্য ক্ষমতা নিজের হাতে রাখিয়াছেন। যেমন ফলবান সারবান্ বৃক্ষ অস্থায়ী প্রজার কাটিবার অধিকার জমিদার দেন নাই—অবশ্য আইনে প্রজার এ অধিকার না থাকিলেও দেশের কোন কোন স্থানে প্রজারা এ অধিকার ভোগ করে। জমীদার তাহাতে আপত্তি করেন না—কোন কোন স্থলে আপত্তি এখনো এক আধটু আছে।

বলিয়াছি বাংলার নদী—গ্রাম, পরগণা কক্ষগত করিতেছে; আবার শুষ্ক বালিচরে নূতন বসতি স্থাপিত করিতেছে। এই বসতিকে জমীদারেরই সমৃদ্ধ করিতে হইত—বাসযোগ্য শ্রীসম্পন্ন করিতে হইত।

শুষ্ক বালিচরকে ছায়া-সুশীতল গ্রামে পরিণত করিবার জন্যই ফলবান সারবান্ বৃক্ষ জমীদার এত দরদ দিয়া দেখিতেন। আজ ইহার প্রয়োজন পূর্ব্বের চেয়ে কোন স্থানে হয় তো কিছু হ্রাস পাইয়াছে—এবং আইনের প্রতিপাল্য বিধিও সেই সঙ্গে হ্রাস পাইয়াছে। অন্য যাহা

আছে সেও জমীদারের অস্তিত্ব প্রজাকে কখন কখনও স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই। জমীদার প্রজার সুবিধা অবশ্যই দেখিবেন, প্রজাকেও কিন্তু জমীদারের মান্য দিতে হইবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চুক্তি প্রজাহিত বিধানের ফাঁকে বর্ত্তমানে অনেকটা শিথিল হইয়াছে। জমীদারের প্রজার উপরে আইনতঃ একরকম কোন ক্ষমতাই নাই। তবু ইহার মধ্যেও জমীদার প্রজাপীড়ক হয়—কিন্তু তেমন অত্যাচার দেশের কিঞ্চিৎ ক্ষমতাশালী যে কেহ তদপেক্ষা দুর্ব্বলের উপর নিত্য করিবার প্রয়াস পাইতেছে। শুধু জমীদারকে দোষী করিলে চলে না।

জমীদার দেশের কি করিয়াছেন যে দেশের সাধারণ তাহার উপর কৃতজ্ঞ থাকিবে? দেশ গঠনে, দেশের, বর্ত্তমান জনসমৃদ্ধির আনুকূল্যে জমীদার অনেক কিছুই করিয়াছেন। দেশের নানা কীর্ত্তিকলাপ, দীঘি, পুষ্করিণী, পথ, ঘাট, অন্নদান, ভূমিদান, এ সব জমীদারই এত কাল করিয়াছেন

স্থানীয় জমীদারেরাই স্থানীয় লোকদের অভাব অভিযোগ মিটাইয়াছেন—তাহাদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও আনন্দের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বেও জমীদারেরা ইহা করিয়াছেন; তার পরেও বহু পরিমাণে করিয়াছেন। ইংরেজী শিখিয়া দেশে বিচার বিক্রয়ের মুখপাত্র হইয়া বা অন্য কোন উপায়ে অনেকে বহু জমীদারের চেয়েও অনেক বেশী অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন; কিন্তু দেশে জনহিতকর কীর্ত্তি-কলাপ ইহাদের কাহার কয়টা আছে?

দেশের জমীদার দেশের মানীলোকের মানরক্ষা করিয়া আসিয়াছে—ইহাও কি দেশের পক্ষে কম কথা?

দেশের বহু জমীদার ফকির হইয়াছে; বহু সাধারণ লোক আজ জমীদার বা সম্পদশালী হইয়াছে। কত জমীদার নিজ দেশের ভূস্বামীর আদর্শ ভুলিয়া দেশের দিকে না চাহিয়া সহরের বিলাস ব্যসনে ও ত্বরিৎ স্ফূর্ত্তিতে নিজ বংশগত শ্রেষ্ঠ গরিমা ভূস্বামিত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া বাংলার আভিজাত্যে দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করিতেছে।

বর্ত্তমান শিক্ষা সভ্যতা দেশের অনেককেই যেমন বিপথগামী করিয়াছে, বহু জমীদারও তাহার হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। দেশের বর্ত্তমান মহা দুর্ভাগ্যের অন্যতম কারণ ইহাই, সন্দেহ নাই।

তার পর দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ ও কৃষাণ সম্প্রদায়। দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ দেশের বিপরীতপন্থী শিক্ষা-সভ্যতায় গা ঢালিয়া দিয়াছে সব চেয়ে বেশী। মরণের পথে—আনন্দ উৎসাহহীনতার পথেও অগ্রসর হইয়াছে ইহারাই বেশী।

অঋণী, অপ্রবাসী, শাকান্নভোজী যে সেও সুখী। কিন্তু মধ্যবিত্ত ইহার কোনটিরই অধিকারী নহে। তাহারা ঋণী, প্রবাসী ও কদর্য্যভোজী।

দেশের কৃষিজীবীরা রোদে পুড়ুক, বৃষ্টিতে ভিজুক, আর দেশের খাদ্য বিলাক—কিন্তু তাহারা মধ্যবিত্তদের চেয়ে অবস্থাপন্ন ও সুখী।

দেশের কৃষাণ ও শ্রমজীবীদের জন্য মধ্যবিত্তদের অনেকে এখন যে ভাবেই হউক নয়নাশ্রু নিক্ষেপ করেন; কিন্তু মধ্যবিত্তদের আজ নিজেদের অবস্থার দিকেই দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী।

মজুর ও কৃষাণ দিন যাহা রোজগার করে মধ্যবিত্তের রোজগার গড়ে তার চেয়েও ন্যূন,—তার পর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রণালীর পার্থক্য দুই শ্রেণীর মধ্যে অনেক বেশী।

দেহের শ্রমীও—শ্রমী, মনের শ্রমীও শ্রমী। কোন মধ্যবিত্ত 'ওরে চাষা—ওরে শ্রমী তুমি রোদে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া দেশের খাদ্য আহরণ করিতেছ—কিন্তু তোমার যে সুখ নাই—তুমি বিদ্রোহ কর, অধিকার বুঝিয়া লও', বলিয়া সহজে আসর মাৎ করিতে পারেন, কিন্তু চাষা ও শ্রমীর প্রতি কি ভাবে দরদ দেখাইবার সামর্থ্য তাহার আছে?

কায়িক পরিশ্রমী দিন মজুর যেথায় সহজে ১৲ ১০ দিন রোজগার করে, সেথায় মানসিক শ্রমী মধ্যবিত্তের দিন আয় গড়ে কত? দেশে কল কারখানা এত নাই

যেথায় কায়িক পরিশ্রমী নিত্য ধর্ম্মঘট করিয়া মজুরী বাড়াইতে পারে, দেশের এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরই ইহাদের খাটাইতে হয় নিজেদের অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যে; কিন্তু এই বর্দ্ধিতহার শ্রমীর তৃপ্তি বিধান করিবার সামর্থ্য দেশবাসীর আছে কোথায়?

দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জমিজমা এখনো দেশে কিছু কিঞ্চিৎ আছে। আছে বলিয়াই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কোনরকমে নিজেদের ভদ্রতা রক্ষা করিয়া চলিতেছে—পরিবার পরিজন দিনান্তে দু'মুঠা খাইতে পাইতেছে।

কিন্তু দেশের সকলেই হেলে-কৃষাণ নহে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা তাহাদের জমী গ্রামেরই কৃষাণদের কাছে বর্গা ও ভাগী ভাবে রাখেন। কৃষাণ চাষ করিয়া ফসল হইলে জমীর অধিকারী অর্দ্ধেক ও কৃষাণ অর্দ্ধেক পায়।

কিন্তু কৃষাণ শ্রেণীর শুভানুধ্যায়ীগণ এ প্রথায় তুষ্ট না হইয়া জমীর অধিকারীর জমী কৃষাণকেই ফসল ভোগ করিবার একান্ত অধিকার প্রজা স্বত্ব আইনের বিধির পরিবর্ত্তনে দিতে চাহেন।

দেশের হিতৈষী ও আইনের বিধানকার কিরূপ যোগ্য যে, একটা শ্রেণীকে জাহান্নমে পাঠাইয়া কৃষাণদের জন্য কত দরদ দেখাইতেছেন। —ঐ দরদের ফলে কৃষি, কৃষাণ ও দেশের যে কি উন্নতি হইবে তাহা উৎসাহীরাও নিশ্চয়ই জানেন না।

জমী যাঁহারা নিজ হাতে চষেন না তাঁহারা মজুর দিয়া তাহা চষাইতে পারেন। সেস্থলে বর্গা দিয়া ভাগ সূত্রে তাঁহারা যে বর্গাদারকে অর্দ্ধভাগ বণ্টন করিয়া দেন এ কি ব্যবসার হিসাবেও পরম উদারতা নহে? কে কার অর্থপ্রসূ কোন ব্যাপারে ভাগ দিতে যায়? কিন্তু দেশের এই যে উদার মনোবৃত্তি, এই সব আইনের জঞ্জালে ও জন-হিত নামে জন-অহিতের প্রাবল্যে ক্রমেই লোপ পাইতেছে।

এই আইনের কথা উঠিতেই ভাগী কৃষাণ মধ্যবিত্তের জমি দখল করিবার জন্য অনেক স্থলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে কৃষাণরা জমির জন্য অনেক স্থলে দাঙ্গা হাঙ্গামা বা মোকদ্দমা করিতে ভদ্র গৃহস্থের মত ভয় পায় না। এই ব্যাপারটিতে দেশময় একটা অরাজকতার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। গৃহস্থেরাও জমি উঠাইয়া লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে ও জমির কি করিবে বুঝিতে পারিতেছে না।

ধোঁয়াচ্ছন্ন সমীকরণবাদী জনহিতকামীরা কি ইহার শান্তি আনিতে সক্ষম হইবেন? শেষকালে ইহাদেরও আঁধার দেখিতে হইবে না তো?

কোন জন-হিত-নীতি পরকে অধিকার চ্যুত করিয়া নিজ অধিকার বাড়াইবার পন্থা অনুমোদন করে? আর তাহাও আইনতঃ সিদ্ধ করিবার চেষ্টা একটা মহা অমঙ্গলেরই সূচনা মাত্র করিতে পারে।

বলশেভিজম্, সমীকরণ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের মানবনীতি —যা কখনো পরখ হয় নাই,— দূর থেকে মুগ্ধ করে খুব, কিন্তু কাছে আসিলে তাহা বড় সু মনে হয় না। বিশেষতঃ মনে রাখিতে হইবে এ দেশ বাংলা দেশ—বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু সত্য হউক সত্য হউক বলিব, আর দূরান্তরের রদি ক্লেদ বাংলায় চালাইতে চাহিব—তাহা হইতে পারে না।

আর সর্ব্বোপরি মনে রাখিতে হইবে, জমিদার, মধ্যবিত্ত, কৃষাণ আমরা সকলেই এখানে প্রজা। এ অবস্থায় নিজেদের মধ্যে অধিকার লইয়া দ্বন্দ্ব চলিলে সকলেরই শেষ কথা হইবে নালিস করিয়া দেখিব—

কিন্তু তাহার পরিণাম কি? অমর বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়ই উপসংহার করি—'নালিস করিয়া দেখিব—কিন্তু সে ত সোজা কথা নহে; আদালত ও বারাঙ্গনার মন্দির তুল্য; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। ষ্ট্যাম্পের মূল্য চাই; উকীলের ফিস্ চাই, আসামী সাক্ষীর তলবানা চাই, সাক্ষীর খোরাকী চাই। সাক্ষীর পারিতোষিক আছে, আমিন খরচা হয় ত লাগিবে এবং আদালতের পিয়াদা ও আমলাবর্গ কিছু কিছুর প্রত্যাশা রাখেন। ইহা অপেক্ষা গলায় দড়ি দিয়া মরা ভাল।'

কিন্তু এই কি দেশের আত্মকলহে আত্মহত্যার সময়? এই কি প্রকৃত জন-হিত ও দেশ-হিত—কৃষি-হিত ও কৃষাণহিত! কোন নীতিই এমন অব্যবস্থার বিধি সমর্থন করিতে পারে না।

"ভারতবর্ষ"

মাস পঞ্জী।

আবাদের এই বিভাগে প্রতিমাসে অবশ্য কর্ত্তব্য কৃষিতত্ত্ব স্বাস্থ্যতত্ত্ব সারতত্ব ও দ্রব্যমূল্য প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচিত হইবে :—

বৈশাখ কৃত্য

জলবায়ু ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব—এই মাসে প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে জলকষ্ট ও শরীরের স্নেহ পদার্থ ক্ষয় হওয়ায় গ্রীষ্মের আতিশয্য বশতঃ জীবগণ অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এইজন্য পেঁপে, ডাব; তরমুজ, তালশাঁস, লেবু, মাখন, ঘোল, কাঁচা আমের সরবৎ প্রভৃতি ব্যবহার করা বিশেষ কর্ত্তব্য। চৈত্রমাসের ঝড় বৃষ্টিতে আমের ক্ষতি হইলেও পাট প্রভৃতি ফসলের পক্ষে উপকার হইয়াছে।

দ্রব্যমূল্য—গোধুম, শালিধান্য, কোদ্রব, মাষকলাই, সর্ষপ ও লবণ প্রভৃতির দাম হ্রাস পাইবে।

চাষ আবাদ

পাট, আমন ও শরৎপক্ক ধান্য, আমাদা, অড়হর, বটবটী কুমড়া, ঝিঙ্গা, শসা, শাঁকআলু, মানকচু, মুখীকচু, আদা, হরিদ্রা প্রভৃতির বীজ এই সময়ে বপন করিতে হয় এবং কলা, পান ও পিঁপুল প্রভৃতির চারা এই মাসেই প্রস্তুত করা উচিত।

পাট—অনেকেই পাট বপন কার্য্য শেষ করিয়াছেন অথবা করিতেছেন। জমিপাট করা কার্য্য পূর্ব্বেই শেষ হইয়াছে কিন্তু ভাল পাট অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে পাটের চারা ৫।৬ ইঞ্চি দীর্ঘ হইলে সে গুলিকে রীতিমত নিড়ান প্রয়োজন ও নাইট্রেট অফ সোডা প্রভৃতি সার ব্যবহার করা দরকার। প্রতি একরে প্রায় ১মণ প্রয়োজন হইবে।

নাইট্রেট অফ সোডা চার পাঁচগুণ মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া জমিতে ছড়াইয়া দিতে হইবে। এই সার স্যাঁত সেঁতে স্থানে রাখা উচিত নয়। ড্যাম্প জায়গায় রাখিলে ইহা গলিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

ধান্য—আমন এবং আউশ ধান বপন করিবার আয়োজন এই সময় হইতেই আরম্ভ করা প্রয়োজন। যে জমিতে শীতকালে আলু উৎপন্ন হয় সেরূপ জমিই আউশ ধান বপনের পক্ষে প্রশস্ত কারণ আলু জন্মাইতে হইলে জমিতে যে সমস্ত সার ব্যবহার করা দরকার আউশ ধানের জমি ও সেই সার ব্যবহৃত হইলে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে পারে। হাড়ের গুঁড়ার সার উক্ত দুই প্রকার শস্যের জমির জন্যই প্রয়োজন। জমি প্রস্তুত করিবার প্রথম অবস্থায় গোমূত্র সার এবং তৎপরে নাইট্রেট অব সোডা ব্যবহার করা উচিত কারণ এই দুইটী সারের মধ্যে যে নাইট্রোজেন আছে তাহাতে জমির উৎপাদিকা শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

গহমা—পশুর খাদ্য হিসাবে এই সময়ে ক্ষেতে গহমার চাষ করা উচিত। এক একর অর্থাৎ প্রায় ৩ বিঘা জমিতে মাত্র পনের সের আন্দাজ গহমার বীজ বপন করিলে তাহাতে প্রায় পৌনে চারশ মন পুষ্টিকর পশুর খাদ্য পাওয়া যাইবে। ইহাতে প্রায় ৩টী গরুর এক বৎসরের খোরাক চলিবে। এই জমির জন্য প্রতি একরে ১৷৹ মন হিসাবে নাইট্রেট অফ সোডা এবং ২ মন হিসাবে সুপার ফসফেট বীজ বপনের পূর্ব্বে সাররূপে ব্যবহার করা চলে। শেষোক্ত সারটী ভূট্টাক্ষেতেও সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

ইক্ষু—বাংলা দেশে জলসেচ ব্যতীতও ইক্ষুর চাষ চলিতে পারে। আগামী মাস পর্য্যন্ত এই চাষের জন্য বিশেষ শ্রমের প্রয়োজন নাই। আগামী মাসে আকের চারা গুলির মাথা নিড়াইয়া গোড়ার মাটী উসকাইয়া দিতে হইবে। সেই সময়ে সহজ প্রাপ্য সার ব্যবহার করিলেও সুফল ফলিতে পারে। কলা, আনারস প্রভৃতির চারাও এই মাসে বপন করা চলিবে।

কলা—কলার চাষ অত্যন্ত লাভ জনক। ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিলে এই ব্যবসায় হইতে রীতিমত অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। কদলী বৃক্ষের

উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিমানে পটাশ ও নাইট্রোজেন প্রয়োজন হয়। বাংলা দেশে কলাগাছের বৃদ্ধির জন্য তাহার গোড়ায় ছাই এবং নুনের জল প্রভৃতি দেওয়া হয়— ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে কলা চারার পক্ষে পটাশ এবং নাইটোজেন অতিশয় প্রয়োজনীয়। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ উডরো সাহেব বলেন যে, খোল, শুঁটকি মাছ নাইটেট অফ সোডার সহিত মিশ্রিত করিয়া কদলী বৃক্ষের জন্য সার প্রস্তুত করা উচিত কিন্তু আমাদের মনে হয় নিম্ন লিখিত ভাবে সার প্রস্তুত করিয়া চারা রোপন সময় হইতে একমাস অন্তর ২।৩ বার ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যাইতে পারে।

নাইট্রেট অব্ সোডা—৩ মন
সুপার ফস্‌ফেট্— ২ মন
মিউরেট অব পটাশ – ২ মন

উক্ত তিনটী পদার্থ ঐ পরিমানে মিশ্রিত করিয়া প্রতি তিন বিঘা বা ১ একর জমিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শাকসবজী—এই মাসে পটল, লাউ, কুমড়া শসা, তরমুজ প্রভৃতির ক্ষেত্রে জল সেচন করা একান্ত আবশ্যক—কচু, আদা ও হলুদ বপন করিবার পক্ষেও ইহাই প্রশস্ত সময়। এই ফসলত্রয়ের পক্ষে বেলে মাটির জমিই প্রয়োজন।

বিট ওহিজামের জন্য উত্তমরূপে কর্ষিত ঝুরামাটির জমি প্রয়োজন কারণ কাদা জমিতে ইহা ভালরূপ উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রথম বৃষ্টি হইবার পর ৯ ইঞ্চি দূরবর্ত্তী লাইনে এক একটী চারা হাতখানেক তফাতে রোপণ করা উচিত। আদা, হলুদ প্রভৃতির জমিতে নিম্নলিখিত মতে সার ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যাইবে—

নাইট্রেট অফ সোডা	১ মন
সুপার সালফেট	১ মন
নাইট্রেট অফ পটাশ	২ ,,
শুষ্ক মাটি অথবা ছাই	১৪ ,,

উক্ত চারিটি পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রতি বিঘাতে ছয় মন করিয়া ব্যবহার করিলে প্রতি বিঘায় ১৬/ মন ফসল পাওয়া যাইবে।

বেগুন, কুমড়া লঙ্কা প্রভৃতি উৎপাদনের জন্যও এই সময়ে জমি প্রস্তুত করা হয়।

এই সকল গাছে সার দেওয়া প্রয়োজন হয় বলিয়া ইহার সার প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালীও নিম্নে দেওয়া হইল :—

সলফেট্ অব্ পটাশ	সওয়া দুই মন
সুপার ফস্‌ফেট	এক মন ১৪ সের
নাইট্রেট অব সোডা	তিরিশ সের

মিশ্রিত করিয়া বোম্বাই প্রদেশে প্রতি বিঘাতে ব্যবহৃত হয়। আমাদের মনে হয় তৎসঙ্গে ৮ গাড়ী আন্দাজ গোময় সার মিশ্রিত করিয়া লাঙ্গল দিবার সময় জমিতে ব্যবহার করা উচিত।

কুমড়া লাউ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিমাণে সার দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে লাভের অংশ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে। প্রতি ৬০ বর্গহস্ত পরিমিত ক্ষেত্রে জমি পাট করিবার সময় নিম্নলিখিত মতে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন—

সুপার সলফেট	/১॥০ সের
রেড়ী খল	/১ ,,
নাইট্রেট অব পটাশ	।০ পোয়া

অতঃপর কুমড়া লউ প্রভৃতির চারা একটু বড় হইয়া উঠিলে প্রতি চারাতে এক আউন্স আন্দাজ নাইট্রেট অব সোডা তিন চারগুন শুষ্ক মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

বেগুন—বেগুন ফলাইবার জন্য সাধারণ অল্প বেলে মাটির জমিই প্রশস্ত। এই মাসে এলোকেশী, মাক্রা, ও মুক্তকেশী বেগুনের বীজই বপন করা উচিত। কুলি বেগুন প্রভৃতি যে জাতীয় বেগুন অধিক দিন ধরিয়া ফল দেয় তাহা এই মাসে রোপণ করা উচিত নহে। বেগুন ক্ষেতে সাধারণতঃ খৈলের সার দিলেই চলে। তবে জমি পাট করিবার কালে দশ বর্গ হাত জমিতে আধ সের আন্দাজ চুণের সারও দেওয়া যাইতে পারে। পরে প্রতি চারাতে ১ আউন্স করিয়া নাইট্রেট অব সোডা ও ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বেগুন ফলিতে আরম্ভ করিলে মধ্যে মধ্যে গোড়ার মাটী উস্‌কাইয়া দিলে ভাল হয়। আগামী মাসে বেগুন লঙ্কার চারা সরাইয়া রোপণ করিবার প্রয়োজন হইবে।

লঙ্কা—ইহার জমিও সার মোটামুটি বেগুন ক্ষেতের মতই চলিতে পারে। তবে লঙ্কার বীজ খুব বিশ্বাসী দোকান হইতে ক্রয় করা উচিত কারণ ঐ বীজে নানা রোগ সাধারণতঃ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু লঙ্কায় প্রায়ই পোকা হয় না। স্পেন দেশীয় এক প্রকার গোল আকৃতির লঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ঝাল খুব কম। কিন্তু সাধারণ লোক এই ল। এখন যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। বেশী ঝালযুক্ত ক্ষুদ্রাকৃতি ধানী লঙ্কা ও অনেকে পছন্দ করেন। রীতিমত সার দিয়া যত্ন করিয়া লঙ্কা আবাদ করিলে ৮ মন ফসলের পরিবর্ত্তে প্রায় ১৫ মন ফসল—বিঘা জমি হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

ফুল—গোলাপ ফুল সাধারণতঃ এই সময়ে প্রস্ফুটিত হয়। এই অবস্থায় গোলাপের মূলে নালা কাটিয়া জল সেচনের সহিত সার ব্যবহার করা উচিত এবং প্রস্ফুট চারা ও আগাছা পৃথক করিয়া ফেলা একান্ত দরকার। এরূপ না করিলে গোলাপ চারাগুলি নষ্ট হইয়া যায়।

রজনীগন্ধা—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে হালকা জমিতে ইহার চারা রোপণ করিতে হয়। রজনীগন্ধা ২ প্রকার ডবল ও সিঙ্গেল। সিঙ্গেল রজনীগন্ধা অপেক্ষা ডবলের গন্ধ অধিক।

বঙ্গদেশে সরকারী কৃষিক্ষেত্র।

নিম্নে বাঙ্গালার সরকারী কৃষিক্ষেত্রগুলির নাম এবং বিবরণী দেওয়া হইল।

১। চুঁচুঁড়া ষ্টেশনের নিকট।

২। বৰ্দ্ধমান রেল ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দূরে।

৩। বাঁকুড়া আদালত হইতে এক মাইল দূরে।

৪। বহরমপুর রেল ষ্টেশন হইতে এক মাইল মধ্যে (কোম্পানী বাগান নামে পরিচিত।)

৫। সোনজ ২৪ পরগণা জিলায়। ক্যানিং সহর হইতে ২৮ মাইল দূরে। সুন্দর বনের মধ্যে।

৬। যশোহর রেল ষ্টেশনের এক মাইল দূরে।

৭। শিউড়ি ই, আই, রেলের রেলষ্টেশনের নিকট।

৮। খুলনা—রূপসা নদীর তীরে।

৯। ঢাকা রেল ষ্টেশনের ৫ মাইল দূরে মণিপুর নামক স্থানে। এক হাজার বিঘা জমির উপর স্থাপিত। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে কৃষি কার্য্য হয়। কৃষি বিদ্যালয়ও আছে। গোশালা, বীজাগারও সঙ্গে আছে।

১০। কুমিল্লা—রেলষ্টেশনের অৰ্দ্ধ মাইল মধ্যে।

১১। ময়মনসিংহ—সহরের ৩ মাইল দূরে।

১২। বরিশাল—সহরের ২ মাইল দক্ষিণে।

১৩। ফরিদপুর—সহরের ৩ মাইল দূরে গোয়াল বাসট নামক স্থানে।

১৪। কিশোরগঞ্জ—বর্গাপ্রথার কৃষিকার্য্য চলিতেছে।

১৫। ধানবাড়ী—বারিসা বাড়ী হইতে ১০ মাইলে বের টাঙ্গাইল মহকুমার মধ্যে।

১৬। জয়দেবপুর—ভাওয়াল কোর্টস অব ওয়ার্ড এষ্টেটদ্বারা পরিচালিত।

১৭। ব্রাহ্মণবাড়িয়া—সবাইল ওয়ার্ডষ্টেটদ্বারা চালিত।

১৮। করাটিয়া—সন্তোষপুর আলিওয়ার্ডষ্টেটের পরিচালিত।

১৯। রঙ্গপুর—পশুশালা - রেলষ্টেশনের নিকটে।
কৃষিক্ষেত্রে—গাঞ্জার চাষও হয়।
বুড়ীরহাট—সহর হইতে ৫মাইল দূরে তামাকের চাষ।

২০। রাজসাহী—সহরের উত্তরে।

২১। বগুড়া—সহরের সন্নিকটে।

২২। পাবনা—সহরের এক মাইল দূরে।

২৩। কালীম্পং—সহরের নিকটে।

আবাদের প্রশ্নোত্তর বিভাগ।

এই বিভাগে প্রতিমাসে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে নানা জটিল এবং প্রয়োজনীয় প্রশ্নের আলোচনা করা হইবে। বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন জমিতে কোন্ দ্রব্যের আবাদ করা চলে এইরূপ চাষের প্রকৃষ্ট পন্থা, সমবায় সমিতি, পশুচিকিৎসা প্রভৃতি সম্বন্ধে কিরূপে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, কোন বাজারে কি দ্রব্য ক্রয় অথবা বিক্রয় করা চলে ইত্যাদি এবং চাষ কালীন আপন আপন অভিজ্ঞতা জাত অসুবিধা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া পাঠাইবার জন্য আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক পাঠক ও সর্ব্বসাধারণকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। এইরূপ প্রশ্ন ও তাহার উত্তর যথাসময়ে প্রতিমাসে আবাদের এই বিভাগে প্রকাশ করিব। যদি কেহ পৃথকভাবে উত্তর পাইতে চাহেন তাহা হইলে প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক টিকিট পাঠাইলে ভাল হয়।

কলিকাতার বাজার দর

গ্রামে উৎপন্ন দ্রব্যাদি কিরূপ মূল্যে কলিকাতায় বিক্রয় হয় তাহা প্রত্যেক উৎপন্নকারীরই জানা কর্ত্তব্য। তাহাদের সুবিধার জন্য আমরা প্রতিমাসে আবাদে কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি।

(শাকসব্জী)

বেগুন—প্রতিসের	৶০	হইতে	৶১০
বাঁধাকপি—এক একটী	৵০	„	৶০
শসা—কুড়ি	॥৵০	„	৸৶০
রসুন—সের	৶	„	।০
আদা—সের	৶০	„	।০
কাঁচালঙ্কা—সের	৶০	„	।০
ঢেড়স—কুড়ি	৴০		৴১০
দেশী পেঁয়াজ—সের	৵০		৵১০
পাটনাই লাল—	৶০		
সাদা—	।০		
আলু নৈনিতাল	৵০		৵১০
দেশী	৴০		৵০
লাল মিষ্টি	৴১০		৵০

ফল

নারিকেল—১টী	৴৫	৵০
পাতিনেবু—কুড়ি	৵০	॥৵০
কলা চাঁপা ১ ছড়া	৵০	।৵০
মর্ত্তমান—	৶০	॥৵০
পেঁপে -১টী	।৵০	৸০

ডিম

ডিম হাঁসের—১কুড়ি	॥৵০	হইতে	॥৶০
মুরগীর—	৸০	হইতে	৸৴০

পাট

পাট—	১৪৲	১৮৲ প্রতিমন

হলুদ

পাবনা ও কুষ্টীয়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রতিমণ	৭৲
দেশী—	৯৲
তেঁতুল—	৬৲

টাকা হইতে ৬।০ অবধি

দেশী শুষ্ক আদা—প্রতিমন ২০৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা অবধি।

জমির সার

রেড়ীর খোল প্রতিমন ৪৸০আনা হইতে ৫৲ টাকা।
সরিষার খোল „ ২।৴০আনা হইতে ২॥০ টাকা
মৌয়া ১॥০ টাকা
চিনাবাদামের খোল ৩॥০ আনা হইতে ৩॥৴০
হাড়ের গুড়া ১০৫৲ টাকা হইতে ১১০টাকা
নাইটেট অফ সোডা -২০৫৲ টাকা করিয়া প্রতিটন রেলে তুলিয়া দিবার খরচা সমেত নাইট্রোজিন শতকরা ১৫—১৬
বেসিক স্ল্যাগ ৮০৲ টাকা করিয়া প্রতিটন রেল তুলিয়া দিবার খরচা সমেত ফটফরাটিক এসিড শতকরা ১৬—১৮

সুপার ফসফেট Singal প্রতিটন	৯০৲ টাকা হইতে	৯৫৲
Double	১৮০৲	১৮৫৲
সালফেট অফ পটাস	১৮৫৲ শতকরা	৫০
মিউরিয়েট অবপটাস	১৩৫৲	৫০
নাইট্রেট অফপটাস	২৪০৲	
নাইটোজিন শতকরা	৯॥০ হইতে ১০	
পটাস	৩০৲ হইতে ৩৫	

চিনি বাজার দর

জাবা চিনি প্রতি মণ	১১।০
লাল	১১৲

তুলা

বঙ্গদেশজাত তুলা	৩০॥০	হইতে	৩২৲	টাকা
উমরাস তুলা	৩৫॥০	„	৩৫৲	„
ওয়ার ডর তুলা	৩৮৲	„	৪০৲	„
শিমুল তুলা	৪৭৲	„	৪৮৲	„
বাজারের সাধারণ তুলা (স্থানীয়)	২০৲	„	২২৲	

তৈল

সরিষাব তৈল	২০৲	হইতে	২৫৲	বাজার দর
নারিকেল তৈল	২৩॥০	„	২৫৲	„
তিশি	৭॥০			
সরিষার তৈল প্রতি মণ	১০৲	হইতে	১১৲	

[চাউল প্রতিমণ]

বলাম নূতন	৮৲ ৯৲
পাটনাই ঐ	৮৲—৮।০
রেঙ্গুন আতপ নূতন	৬৲—৬।০
বাঁকতুলসী নূতন	৮॥০—৮৸০
ঐ পুরাতন	৯।০—৯৸০
নাগরা	৭॥০—৮৲

দাইল—প্রতিমণ

দেশী অড়হর	৬৵০—৭৵০
ঐ কাণপুরী	৮৲—৮৸০
মুগ কাঁচা ও ভাজা	৮৲—১৪৲
ছোলা	৫৲—৭॥০
মশুরী	৮৲—১০৲
কালী কলাই	৯৲—১০৲
পাটনাই	৫৲—৬।০

আটা ময়দা—প্রতিমণ

১নং ময়দা	৯৸৵০
২নং ঐ	৯॥০
৩নং ঐ	৯৲
বি আটা আসল	৯।৴০
ঐ নকল	৮॥০
২নং	৮৴০
৬নং	৭।৵০
সুজি	৮॥০—৯॥০

চিনি মিছরী

দোবরা	২৬৲
একবরা	২০৲
সাদা জাভা	১১০
লাল জাভা	১১৸০
হিন্দুস্থান	১২॥০
মিছরী	১৩৲

লবণ—[১০০ মণ

এডেন	১৮০৷৵০
করকজ	২৲ মণ

পাট

ইষ্টার্ণ ফাইন	১৮৲
,, রেজা	১৬৲
,, T. R. O.	১৭৲
আমদানী	৫,০০০/ মণ
রপ্তানী	১৩০০০/ মণ
মজুত	৪০৭,০০০/ মণ

তৈল—প্রতিমণ

সরিষার কলের	২০—২২৲
ঐ ঘানির	২৫৲—২৬৲
নারিকেল কোচিন	২৩৷০ - ২৫৲
রেড়ির তৈল	১৬৲
কেরোসিন হাসমার্কা	৬।০
বানর মার্কা	৭৷৵০
হাতী মার্কা	৭।/০
ভিক্টোরিয়া	৩৷০
রাণীমার্কা	৬।০
গীর্জ্জামার্কা	৯।৵০

চাষার বৈঠক

Ceylon, Dep. Agric পত্রিকায় "The Control of Shot Hole Borer of Tree" শীর্ষক প্রবন্ধে, সার প্রয়োগে চা গাছের এই শত্রুদিগের কার্য্যে বিঘ্ন দেওয়া সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে। প্রবন্ধের মুখবন্ধে এতাবৎ কালের সমস্ত চেষ্টার কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই পোকা গাছের ডালগুলিকে এরূপ অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে, যে অধিক ঝড় হইলে ও পাতা তুলিবার সময় কুলিদের স্পর্শে ইহারা ভাঙ্গিয়া পড়ে। সার সংযোগে গাছগুলি তেজস্কর হইয়াছিল দেখিয়া আশা করা গিয়াছিল, যে পোকাগুলি নষ্ট হইয়া গর্ত্তগুলি একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে অথবা তাহাদের সংখ্যা অল্প হইবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে মিশ্র সার সংযোগে ঝাড়গুলি তেজের সহিত বৃদ্ধি পায় ও ছিদ্রগুলি ক্রমশঃ কমিয়া যায়।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সমবেত (Co operative) ক্রয়বিক্রয়।

উৎপন্ন দ্রব্যের সমবেত ক্রয়বিক্রয় আধুনিক আমেরিকার কৃষিকার্য্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এই সমবেত কার্য্য কোন শ্রেণী বিশেষের বিশেষত্ব নহে, কারণ ইহা বহুকাল যাবৎ প্রায় সকল প্রকার শ্রমজীবিগণের মধ্যেই লক্ষিত হয়। তবে আজকাল আমেরিকার কৃষিকার্য্যে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় জীবনে কৃষিকে আদর্শ করিতে হইলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধির সহিত বিক্রয় করিবার মিলিত চেষ্টা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে খরিদ্দারদিগের বা অন্য কোন ব্যবসায়ের কোন ক্ষতি করে না। কৃষিজাত পণ্যসমূহ জাতীয় উন্নতির নিদান। কারণ প্রচুর উৎপন্ন হইলে সমৃদ্ধ ও সন্তুষ্ট কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য শ্রেণীর লোকের কৃষক সম্প্রদায়কে যথেষ্ট সাহায্য করা উচিত; কেননা তাহারাই জাতির প্রাণ, তাহারাই সকলের মুখের অন্ন যোগায়। এই ক্রয়বিক্রয় সমবেতভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে যথেষ্ট ফসলের সময় শস্যাদি স্বল্পমূল্যে বিক্রীত হইতে পারে, অপিচ অজন্মার সময়েও অসন্তুষ্টিকর মূল্য বৃদ্ধিরও প্রয়োজন হয় না। ইহাতে অপামর সাধারণ সকলেরই মঙ্গল।

শিকড়ের সাহায্যে গাছের অঙ্গার (Carcon) শোষণ।

এমেরিকায় পরীক্ষা করিয়া পরিষ্কার ফলে দেখা গিয়াছে যে, গমের চারা গাছ লইয়া অনেক সার মিশ্রিত জলে নাইট্রেটের ভাগ বেশী হইলে গাছের ছাইতে অঙ্গারের ভাগ বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

খাদ্যের যে কোন উপাদানের বৃক্ষের শোষণ সম্ভব তাহা বৃক্ষের রস এবং পুষ্টিকর তরল পদার্থের সমতার উপর নির্ভর করে। এই সমতা অম্ল, ক্ষারসংযুক্ত অথবা উদাসীন হইতে পারে এবং সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষে ভিন্ন ভিন্ন আকারে লক্ষিত হয়। গমের চারা গাছের নিমিত্ত সার মিশ্রিত জলে সোডিয়াম, এমোনিয়াম নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম বা পোটাসিয়াম কারবনেট মিশ্রিত থাকিলে গাছ পোড়াইলে তাহার ছাইতে অঙ্গার (carbon) দেখিতে পাওয়া যায়।

যখন দ্রবপদার্থের সহিত সোডিয়াম নাইট্রেট মিশ্রিত থাকে তখন হয় নাইট্রেটই সর্ব্বপ্রথমে শোষিত হয়, এবং যৎকিঞ্চিৎ সোডিয়াম অবশিষ্ট থাকে তাহা জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া সোডিয়াম কার্ব্বনেট অথবা সোডিয়াম বাইকারবনেটে পরিণত হয়। ক্রমে ইহা ক্যারবোনেট দান করে। বৃক্ষ মূলের সাহায্যে ক্যারবোনেট শোষণ করে কিম্বা পুষ্টিকারক দ্রব পদার্থের সমতা রক্ষা করিবার জন্য কারবনডাইড অকসাইড পরিত্যাগ করে।

দ্রবীভূত নিকৃষ্ট পদার্থের সাহায্য ব্যতিরেকে গমের গাছগুলি তরল মিশ্র হইতে কার্ব্বনডাই অকসাইড শোষণ করিতে পারে না। এই নিকৃষ্ট পদার্থ অম্লজাত হইলেই ভাল হয়। বৃক্ষের সম্বন্ধে "চুণের আত্মীয়তা" শব্দের পরিবর্ত্তে "অঙ্গার আত্মীয়তা শব্দ ব্যবহার করা অধিক যুক্তিযুক্ত হইবে।

Denmarkএ কৃষিকার্য্য।

পাশ্চাত্য জগতে Denmarkএর অধিবাসীরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষিজাতি। Denmarkএর কাছে সকল দেশেরই যথেষ্ট শিখিবার আছে। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি?

প্রথমতঃ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা Denmarkএ কর্ষিত ভূমির ভাগ অধিক। দ্বিতীয়তঃ তাহারা লাভের ভাগ নগদ টাকা অপেক্ষা জমি ও ফসল অধিক পছন্দ করে। তৃতীয়তঃ তাহাদের ফসল অন্যান্য স্থানের ফসল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং এতদ্বারা তাহারা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করে। ইহা ছাড়া এদেশে কৃষিকার্য্যের সহিত পশুপালনও করা হয়। পশুরা চাষের উৎপন্ন দ্রব্য আহার করে। তাহাতে দুগ্ধ ও ডিম যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। আর একটা সুবিধা এই যে লোকজনের মাহিনা অন্যান্য দেশের সমান হইলেও, এখানকার লোকেরা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিকক্ষণ অধিক দক্ষতার সহিত কার্য্য করে। উপরন্তু কৃষকগণ নিজেরা যথেষ্ট পরিশ্রম করে। ইহা ছাড়া Denmarkএর কৃষকেরা কৃষিশিল্পের উন্নতিকল্পে তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে ও যথাসাধ্য শারীরিক পরিশ্রম করিতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করে না, কারণ জমিগুলি তাহাদের নিজেদের, এই গর্ব্বে তাহাদের মন সর্ব্বদাই আনন্দিত।

বিশ্বজাতীয় বীজ পরীক্ষা সভা।

১৯২৪ সালে Cambridge নগরে বিশ্বজাতীয় বীজ পরীক্ষা কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনে স্থির হয়, যে এই সভার কার্য্য পৃথিবীর সমস্ত দেশে বিস্তার করা হইবে। এই সভায় বীজ পরীক্ষা এবং বিচার সম্বন্ধে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইবে। পৃথিবীর সমস্ত বীজ পরীক্ষা সভায় কৃষি সম্বন্ধে পত্রিকা প্রকাশ, জাতীয় সভা গঠন ও অন্যান্য কার্য্যের দ্বারা এই সকল প্রশ্নের সমাধান করা হইবে। ইহার কার্য্যকরী সভা (Excutive Committee) কতকগুলি আন্তর্জাতিক নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মধ্যে মতদ্বৈধ হওয়ায় আসল বীজ (pure seed) সম্বন্ধে নির্ভুল মত এখনও প্রকাশ করা হয় নাই। পৃথিবীর ৫৭টী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরীক্ষার জন্য ১৪ রকম বীজ প্রেরণ করা হইয়াছিল। সভার সভাপতি মহাশয় শীঘ্রই ইহার ফলাফল প্রকাশ করিবেন। বীজের ছবি ও সভার সভ্যগণ দ্বারা লিখিত রচনা পাঁচটী বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইবে। আরও এই সভা বীজ পরীক্ষা সম্বন্ধে যে কোন হৃদয়গ্রাহিণী রচনার সারাংশ প্রকাশ করিবেন।

গম গাছের শিকড় বৃদ্ধি

শিকড় বৃদ্ধি বিষয়ে R. D. Less যথেষ্ট পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে Waga Experiment Farm এ গম গাছে বিভিন্ন পরিমাণে Superphosphate প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই সারের সাহায্যে শিকড়গুলি মাটির অনেক ভিতরে প্রবেশ করে। একখণ্ড জমির প্রতি একারে ১ হাণ্ড্রেডওয়েট সার সংযোগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে শিকড় এবং বিচালি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ে। আর এক কথা, বীজ আগে পুঁতিলে শিকড় অপেক্ষাকৃত বেশী বাড়ে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে গাছগুলি উত্তমরূপে জন্মাইবার জন্য সুপার ফসফেট ও নাইট্রেট অফ সোডা উভয়বিধ সারই প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহার প্রয়োগে গাছগুলি জলকষ্ট সহ্য করিতে পারে।

মৃত্তিকা ও যবক্ষার জাত বাষ্প।

রুচের অভিমতের সারাংশ—

সাধারণতঃ Bacteriaর সাহায্যে পতিত জমির উপর যবক্ষার জাত বাষ্পের বৃদ্ধি করিবার নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রথমেই দেখিতে হইবে যে পতিত জমির যবক্ষার জাত বাষ্প উৎপাদন করিবার মত যথেষ্ট পরিমান Bacteria আছে কিনা। এই নিমিত্ত জমি বারংবার কর্ষণ করা আবশ্যক।

বাস্তবে পতিত জমির সমস্যা, "সুবৃহৎ কর্ষিত ভূমি ও যবক্ষার জাত বাষ্প" সংযোগ সমস্যার একটি অংশ মাত্র।

কখনও পতিত জমিতে গুণগ্রহণযোগ্য পরিমাণে

যবক্ষার জাত বাষ্প পরিপাক বা মিশ্রিত করিতে দেখেন নাই।

গম, rye এবং তৃণ কর্ষণের খোলা মাঠের পরীক্ষার ফল।

তিন metre তফাতে পতিত এবং কর্ষিত ভূমিতে ফসল পরীক্ষা করা হইয়াছিল। পটাস সল্ট্, চিলিয়ান নাইট্রেট্ ও এমোনিয়াম্ সালফেট এই তিন প্রকার সার প্রয়োগ করা হইয়াছিল। ইহাতে rye অপেক্ষা গম এবং বিচালি অপেক্ষা শস্য অপেক্ষাকৃত অধিক জন্মিয়াছিল।

সম্ভবতঃ মাটিতে পুষ্টিকর উপাদান, বিশেষতঃ যবক্ষার জাত বাষ্পের ক্রমঃ উৎপত্তিই বিচালির অল্পতার কারণ।

পরীক্ষার কয় বৎসর গম এবং rye অপেক্ষা ঘাস অধিক হইয়াছিল, কারণ গম এবং rye অপেক্ষা ঘাস বৎসরের নিম্নগামীতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু পর পর চার বৎসর পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে গড়ে ঘাস এবং অন্যান্য ফসল পরিমানে একরূপই হয়।

কচ্, নিম্নদেশ খোলা, ধাতুনির্ম্মিত নলের মধ্যে অন্যান্য পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে গমের পক্ষে বিপরীত ফল দর্শায়—শস্য অপেক্ষা বিচালি অধিক জন্মিয়াছিল। এক্ষেত্রে পোটাসিয়াম্ নাইট্রেট ও পোটাসিয়াম ফসফেট সাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

অতঃপর মাটীর ভিন্ন ভিন্ন স্তরে নাইট্রোজেনের কার্য্য পরীক্ষা করা হইয়াছিল। শীতকালের শুষ্ক ভূমির সহিত গ্রীষ্মকালের কর্ষিত, ভিজা মাটীর সহিত তুলনা করা এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। পটাস সল্ট এবং সুপার ফসফেট সার সংযোগে মৃণ্ময় পাত্রে মাটী পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ইহাতে নাইট্রোজেনের অংশ উপরিস্তরে অধিক পরিমানে পাওয়া গিয়াছিল।

কচের অন্যান্য পরীক্ষা, চিনি, cellulose এবং খড়ের উপর জমির নাইট্রোজেন সংযুক্ত সারের উপকারীতা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে।

নয় বৎসর একাদিক্রমে dextrose ও cane sugar সংযোগ করাতে ফসলের পরিমান বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু নয় বৎসরের পরেই উহা হ্রাস হয়। কচ্ দেখিয়াছিলেন যে কাগজের আকারে কেবলমাত্র cellulose অথবা cellulose ও সার উভয়ের সংযোগে নাইট্রোজেনের ভাগ কমিয়া যায়; কিন্তু সার ও cellulose মিশ্রিত করিয়া দিলে ফলন বৃদ্ধি হয়।

মাটী ও শাক সব্জী উৎপাদন।

Europe এ বহুদিন যাবৎ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে "Compost" গাছ পালার অপ্রয়োজনীয় অংশের সার প্রয়োগে লাউ, কুমড়া, বিলাতি বেগুণ, লেটুথ প্রভৃতির ফসল কমিয়া যায় এবং ইহার প্রধান কারণ নাইট্রেটের অভাব। জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া নাইট্রেট অফ সোডা ব্যবহার করায় ভাল ফল হইয়াছে এবং তাহা করাই বিধেয়।

মিশরে সার আমদানী।

মিশরে ১৯২৪ সাল অপেক্ষা ১৯২৫ সালে অনেক বেশী সার আমদানী হইয়াছিল। নয় মাসের মধ্যে মিশরে নাইট্রেট অফ সোডার আমদানী ২৪২০৮ টন ১০০৭৫০ টনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নাইট্রোজেন সম্ভূত অন্যান্য সারও যথেষ্ট আমদানী হইতেছে। সালফেট্ অফ্ এমোনিয়া ১২০৬ টন হইতে ৮৩৮৪ টন, নাইট্রেট অফ লাইম ১৫০০ টন হইতে ১১৩৪৩ টন এবং ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড ০ হইতে ৫৩৫ টনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল দ্রব্য মিশর কর্তৃপক্ষের আশ্রয়ে আমদানী হইয়াছে। তাঁহারা কৃষি সম্প্রদায়কে এই সমস্ত দ্রব্য কথঞ্চিৎ পরিমাণে ধার দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং সেই কারণে ইহার প্রচার অতি সহজেই হইয়া পড়িয়াছে। সুপার ফসফেটও ৭৭৭৭ টন হইতে ১৭৫৭১ টনে এবং মিশ্রিত সার ১৮৭ টন হইতে ১৭৭৯ টনে প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমাদের দেশে ভারত গভর্ণমেণ্ট কি এইরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিতে অক্ষম? এই হতভাগ্য দেশে সার আমদানির প্রচেষ্টাতে সরকার বাহাদুরের উৎসাহ ত দূরের কথা কত লক্ষ লক্ষ টাকার সার ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর রপ্তানি হইয়া যাইতেছে। যদি গভর্ণমেণ্ট আর্থিক সাহায্যে অক্ষম হয়েন তাহা হ'লে রপ্তানি বন্ধ করাতেও কি তাঁহাদের আপত্তি আছে?

মুক্তি !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

আজ আমার মুক্তির দিন. আজকের এই আলো মিশে যাবার পূর্ব্বে, মেঘলা দিনের আধ ফোটা সূর্য্যি ডুবে যাবার পূর্ব্বেই আমার মুক্তি হবে; একটু পরেই মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস ফেলে সেই আগেকার মত স্বাধীন ভাবে বেড়িয়ে বেড়াতে পার্ব্ব; আমার কত আনন্দ আজ, তবু যেন একটা কি বেদনা আমাকে কেমন অভিভূত করে ফেলেছে।

এই কারাগৃহে একাদিক্রমে বার বছর ধ'রে দিনের পর দিন গুণে গুণে কাটিয়ে আস্‌ছি—কত উৎসবের দিন এইখানে বসে বসে কেটে যেতে দেখেছি, শুধু ভোগের স্পৃহায় জ্ব'লে-পুড়ে ছাই হয়ে হয়ে। তার একটা দিনও ভোগ কর্ব্বার অধিকার এ বার বছরে হয় নি। কত স্মরণীয় নিশির স্মরণে বিনিদ্রচোখে রাত কাটিয়েছি, ফেরে না জেনেও এইখানে বসে কত কেঁদেছি; খুনি আমি, কে আমার একটু অনুকম্পা কর্ব্বে? ওগো আমার কারাবন্ধু! শুধু তুমিই আমায় তোমার অপার স্নেহ দিয়ে আশায় প্রলুব্ধ করে বাঁচিয়ে রেখেছ; তা না হলে আমি এতদিন এই এত স্মৃতির দংশন সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারতাম না নিশ্চয়ই। শতধা অন্নক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখখানি তার যখনই মনে পড়েছে, আধভাষাভাষি সোণার পুতুলের কথা যখনই মনে পড়েছে, তখনই কি একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করেছি, শুধু তুমিই সেখানে তোমার অমৃতের ধারায় স্নান করিয়ে দিয়ে নূতন জীবন এনে দিয়েছ। শুনেছি তুমিও খুনে, না বন্ধু, তা তুমি কখনই নও, তোমার দেহে যে জ্যোতি মুখে যে ভাষা, প্রাণে যে বল, হৃদয়ে যে আনন্দ, তাতে তোমার খুনে বললে মিথ্যা বলা হয়; আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পারিনে যে তুমি খুনী।

আজ আলো-আঁধারের মিলনদিন, চারদিকে আলো ছায়ার কোলাকুলি; আমারও সুখ দুঃখের মিলন দিন আজ। একটু পরেই তারা সব আসবে, এসে ঐ কয়েদের গেটের কাছে, ঐ মাথা উঁচু করা বট গাছটার তলায়, কি একটা অভূতপূর্ব্ব ঔৎসুক্য নিয়ে আকুল নয়নে এই দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে থাকবে, সে আমারি আশায়, আমি যে কত আশানিরাশার দ্বন্দ্বে নিয়ত প্রতিহত হচ্ছি তা তারা কিছুই জানে না। আমি আজ তাদের সঙ্গে মিলতে চলেছি, কত আশার দিন, কত আরাধনার দিন, তবু বুকের ভিতর অন্তহীন গুরু-ভার, আমি যে আর বইতে পারিনে বন্ধু!

জানি তারা সুখেই আছে; তথাপি একটুও শান্তি নেই কেন? তারা এই ক'বছর নিজেদের বেশ ভাল ভাবেই ভরণ-পোষণ করেছে, কোন কষ্টই পায় নি, হলেও তারা বড় দুঃখী। আমি যেমন তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের সুব্যবস্থা শুনেও সম্পূর্ণ সুখী হতে পারিনি, তেমনি তারাও স্বচ্ছল সংসার যাত্রার পথে চল্‌তে চল্‌তে আমারি অভাবে শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা প্রতিনিয়ত অনুভব করেছে; আর ভগবানের কাছে আমার পাপের ক্ষমা চেয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে।

আজ আমার এই করুণ ভাবপ্রবণতা দেখে যেন মনে করো না বন্ধু আমি খুনে নই! সত্যি আমি ডাকাত আমি নরঘাতক; আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।

তোমার সঙ্গে আমার যে পরিচয়, এও যেন কত দিনের, কত যুগযুগান্তর, কত জন্মজন্মান্তরের; তা না হলে এমন করে তোমায় আমায়, অজানা অচেনা, এই কারা গৃহে প্রাণের মিলন হল' কি করে? এও সেই অদৃশ্য শক্তির শক্তিলীলা। এই স্থানে তোমায় আমায় মিলন হয়েছে, এটা জেল হলেও চোরডাকাতের আবাস ভূমি হলেও আমার পবিত্র তীর্থ, এ আমি যেমন করে বুঝি, আর কেউ তেমন করে বুঝবে না, আর আমি তা বোঝাতেও পার্ব্ব না। এ আমায় কত দিনের পরিচিত স্থান, ছেড়ে যেতে একটু মায়াও হচ্ছে বৈ কি, কিন্তু থাক্‌তেও খুব ভাল লাগছে না; কেবল তোমাকে হারা-

যার কথাটাই বেশী করে মনে হচ্ছে। আবার কত দিন পরে তুমি এসেছ বন্ধু, সেও আজ কতদিন হয়ে গেল। প্রথম তোমায় যে ভাবে দেখেছিলাম, প্রতিদিন তেমনই দেখেছি, আজও ঠিক তাই দেখছি; জানি না তুমি কি! কোন দিন তোমায় কথা আমায় বল নি কত ভাবে জিজ্ঞাসা করেছি এক বিন্দুও প্রকাশ কর নি, তাই অভিমান করে আমিও তোমার কিছু বলি নি; কিন্তু আজ সব বলে যাব; যেমন কানে আমার অন্য সব কথা শুনেছ আজও বন্ধু সেই কাণেই শুনো—আমায় ক্ষমা ক'রো; আমায় প্রায়শ্চিত্তের কথা একটু বলে দিও।

গুজরাটের এক পার্ব্বত্য গ্রামে আমার বাড়ী ছিল, তার আকাশ বাতাস যে কি মধুময় তা আমি বলে শেষ কর্ত্তে পারি নে; আজও যেন ছবির মত সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হতভাগা আমি গরীবের ঘরে জন্মে ছিলাম; ছোট বয়েসেই বাপ মা হারিয়ে মামার বাড়ীতে মানুষ হই; জীবনে সব চেয়ে মধুর যে মায়ের স্নেহ-ভালবাসা তা আমি জ্ঞানে ভোগ কর্ত্তে পাইনি। সঙ্গ দোষে যা হয় আমিও ঠিক তাই হলাম, চোর বদমায়েস গুণ্ডা সবই, এই সব দেখে শুনে মামারা একটি বড় মেয়ে দেখে আমায় বিয়ে দিয়ে দিলেন যদি শুধরে যাই। শুধরে ছিলাম, কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ, তাই আমি খুনে, মানুষ হয়ে মানুষের প্রাণহন্তা।

বিয়ে হওয়ার কিছুদিন বাদেই মামারা আমায় আলাদা করে দিলেন, তখন বদমায়েসি ছেড়ে ছুড়ে দিলেও একেবারে উপায়হীন। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে তাঁরা এত বড় শাসনে আমায় শাসিত কর্ব্বেন। অকুল পাথারে পড়ে গেলাম, স্ত্রী বললে তা আর ভেবেচিন্তে কি হবে, তাঁরা ভালই করেছেন, তোমার এমন শরীর কিছুই কাজকর্ম্ম কর্ব্বে না কেবল গুণ্ডামী করে বেড়াবে, চল্‌বে কি করে? দেশে জন মজুরি কর যা পাও তাতেই আমাদের দুজনের এক রকম চলে যাবে; তবে বাটপারি জোচ্চুরি করে উপায় করো না, তার চেয়ে না খেয়ে মরা অনেক গুণে ভাল। সে আমার ভেতরে, আমার যা কিছু ভেঙ্গেচুরে ফেলে তাকেই প্রতিষ্ঠা করেছিল, অখণ্ড সত্যের প্রতিমা সে, তার সে কমনীয় সৌন্দর্য্যের মাঝখানে এমন একটা অমৃতের অধিষ্ঠান ছিল, যে স্পর্শ পেলে সবই আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠত। তার প্রেরণা আমায় আর এক মানুষ করে গড়ে তুলেছিল, হলেও বিধিলিপি ছিল যে অন্যরূপ।

খেটেখুটে দিনমজুরি করে যা আনতাম তা এক-প্রকারে খুব কষ্টেই আমাদের দিন গুজরাণ হত, আমি শতবার দুঃখিত হলেও এর জন্যে কিন্তু তার মুখে কোনদিন একটাও বেদনার রেখাপাত করে নি। দেশের এমনি দুরবস্থা, গ্রামের যারা অবস্থাপন্ন—তাঁরা সবই সহুরেবাবু, বাপ পিতামহের কৃষিকাজ, সে সব উঠিয়ে দিয়ে দাসত্ব ব্রতে ব্রতী; অন্যান্য সাধারণ সবাই দীনহীন, কে কাজ দেবে? গরীব দুঃখী যে খেটে খাবে তার কোন প্রতিষ্ঠান নেই। যাক্, এমনি করে দু বছর কেটে যাওয়ার পর এই এত অভাবের মাঝে স্বর্গের সুষমায় ভোরে একজন এলো, তাকে পেয়ে যেমন আনন্দ হল, তেমনি কষ্টটাকে কষ্ট বলে অনুভব কর্ব্বার জ্ঞানও জন্মাল;—প্রাণের আনন্দ সে প্রেমের মূর্ত্তিময় প্রতিষ্ঠান সে, তার কষ্ট বাপ মা হয়ে সহ্য করা যে কি, তা যে এমনি দুঃখের মাঝখানে পুত্র রত্নলাভ করেনি সে বুঝতে পার্ব্বে না, এক ফোটা দুধের অভাবে তার মুখে হাসি না ফুটে কান্নার সৃষ্টি ক'রে চারদিক হাহাকারে জমাট করে তোলে, চোখে আনন্দের শত আহ্বান না জানিয়ে কেবল জলেই ভো'রে যায়—দারুণ পার্ব্বত্য শীতে এক টুক্‌রো কাপড়ের অভাবে সোণার পুতুল কেঁপে কেঁপে কাট হয়ে আসে; সব চেয়ে অসহ্য নয় কি!!

আগে মনে হত যারা ষড়ৈশ্বর্য্যে অতিষ্ঠ,ভোগ কর্ব্বার একজনও পাত্রপাত্রী খুঁজে মেলে না তাদের ঘরে এমন সব আনন্দ দুলাল না পাঠিয়ে যারা দু'বেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান কর্ত্তে পারে না তাদের কোলে এই সব নিষ্কলঙ্ক শরচ্চন্দ্রের উদয় কেন করে দাও; এখন বুঝতে পেরেছি, কাঙ্গালকে একদিক দিয়ে বড় করে দেবার জন্যে ভগবানের এই সুবিচার; এদান মাথা পেতে নিতে হবে, এ যে চিরক্ষুধাতুরের অমৃত-ভাণ্ড পথ, ভিখারীর পরশ পাথর। এই অবস্থায় এসে এমন হল যে দিন আর

চলে না; এখন খাই বা কি, আর খাওয়াই বা কি। স্ত্রীকে বললাম—থালাটা ঘটিটা যা আছে তাই বেচে কিনে কোন প্রকারে চালিও, আমি দিল্লী যাই, সে সহর জায়গা সেখানে কোন একটা কাজ দেখে নেই গে; সে বললে বেশ ভাল কথা, তবে দেখ আমায় ছেড়ে যেন আগেকার মত হয়ে যেও না, আমার পানে চেয়ে দেখ, আমি তোমায় আর কিছু বলতে চাইনে। সেদিন আমায় সে তার নির্ব্বাক চাউনিতে কত আশা-নিরাশায় নিবেদন জানিয়াছিল, বুকের মাঝে এক অভূতপূর্ব্ব জাগরণ এনেছিল; কিন্তু দুঃখের নির্ম্মম নিষ্পেশনে তা পালন কর্ত্তে পারিনি। আমি তাকে তেমনি করে ফিরে পেতে চাই, সেই সঙ্গীত-মধুর শাসক মূর্ত্তিতে সে আমার হোক, কিন্তু তা আর হবে না বন্ধু!

যাক সংসারের কিছু ব্যবস্থা করে দিয়ে দিল্লীতে এলাম, অনেক আশা-ভরসা নিয়েই এসেছিলাম, কিন্তু জানা নেই চেনা নেই, নিরক্ষর আমি, সেই জনসমুদ্রের মাঝে কোন উপজীবিকার উপায় ক'রে নিওয়া কি সম্ভব! কিছুই হল' না। যার কাছে যাই, সেই আমায় সন্দিগ্ধ চোখে দেখে, ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করে। প্রাণে বড় ধিক্কার এলো, মনে হ'ল ভগবান আমায় এমন একটা শক্তি দিন যে দেশের সব বড় লোকগুলোর মাথা গুঁড়িয়ে ছাতু করে খেয়ে একবার আরামের নিশ্বাস ফেলি; একটু অনুকম্পা—একটা স্নেহের সম্ভাষণ, নিমিষের প্রীতির চাউনিও কি তাদের হৃদয় ভাণ্ডার থেকে একেবারে উবে গিয়েছে! বাড়ীর সখের কুকুর—তারজন্তে মাসে খরচ হয় তিরিশ টাকা, আর একটা মানুষ, খেটে খাবে, তার এক মুঠো অন্নের সংস্থান তারা করে দিতে পারে না? এমনি তারা মানুষ, কুকুরকে বিশ্বাস কর্ত্তে পারে, মানুষ, নিজের জাত ভাইকে তার একটুও পারে না? এটা কি সম্পূর্ণ অবিচার নয়?

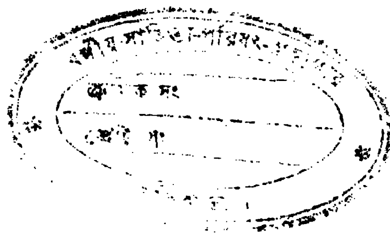
এই ত অবস্থা, বাড়ী ফিরি কোন মুখে? অথচ উপায়ও কিছু হল' না; এমনি করে খেয়ে না খেয়ে আরও দুএকদিন গেল; হটাৎ এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা, তাকে আমার বর্ত্তমান অবস্থার কথা সবই জানালাম, প্রাণের আকাঙ্ক্ষাও সে বুঝলে, কিন্তু সে বললে আমিই দুর্ব্বল তা তোমায় কি ক'রে তুলে ধরি বল; তবে এক উপায় আছে, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে তুমি তা পার্ব্বেনা. যাক সে আর শুনে কাজ নেই। তখন আমার কি অবস্থা একবার ভেবে দেখ বন্ধু! পেটে ক্ষিধের আগুণ, অভুক্ত স্ত্রীপুত্রের প্রলয় নিশ্বাস প্রতি মূহুর্ত্তে আমায় গ্রাস কর্ত্তে আসছে, একটু পথ নেই যে এক পা এগুই; আমি বলে ফেল্লাম, পার্ব্ব বন্ধু যা বলবে আমার শক্তিতে কুলিয়ে উঠলে তা আমি খুব কর্ব্ব; কেন কর্ব্ব না, না খেয়ে খেয়ে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে ত খুব ভাল? প্রাণের স্ত্রী পুত্রকেশুকিয়ে কুঁকড়ে মরে যেতে দেখতে পার্ব্ব না মানুষ হয়ে মানুষের বুকে ছুরি মারা, এও আমি পার্ব্ব, আর তুমি কি চাও। সে একটু বেশ চম্‌কে উঠ্‌লে, আমিও কথাটা বলে কেমন হয়ে গেলাম, অতীতদিনের তার সেই কথাগুলো প্রাণের মাঝখানে নূতন হয়ে জেগে উঠল। সে একগাল হেসে বল্‌লে, তুমি যে এতদূর এগিয়েছ তা আমি ভাবতে পারিনি, থাক তবে বলি, আমি ভাই এক গুণ্ডার দলে চাকুরি করি, তাদের সব হিসেব-পত্র আমাকে লিখতে হয়; গুণ্ডাদের সঙ্গে বেশ একটু খাতির পশারও আমার আছে, এই পর্য্যন্ত। তা দেখ তুমি ত লেখাপড়া জান না যে আমার সহকারী ভাবে তোমায় নেব; তবে তাদের কাছে বলে কয়ে তোমায় যে কোন একটা চাকরী করে দিতে পারি, তা গুণ্ডাগিরিই হোক আর যাই হোক, ভাব, রাজি হও ত বল। আমার সে বন্ধুটিও গুণ্ডার দলে গুণ্ডামিই কর্ত্তেন, কেবল আমার কাছে নিজের সম্মান বাঁচিয়ে কথাটা বলেন, তার কারণ যদি আমি রাজি না হই তাহলেও তাঁর কোন অখ্যাতির কথা দেশে প্রচার হবে না। সে অবস্থায় আমি রাজি না হয়ে আর থাক্‌তে পারলাম না,—চারিদিকে একটা বিভীষিকা দেখছি, তার নিষেধ আজ্ঞাগুলো যেন তপ্ত লোহার শলা হয়ে পাঁজরে পাঁজরে বিঁধছে আর তুলছে তবুও উপজীবিকার উপায় পেয়ে আরামের নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

গুণ্ডার দলে খাওয়া বাদে মাইনে হ'ল বার টাকা; আমি হাতে স্বর্গ পেলাম। প্রথম প্রথম তারা আমায় কত প্রলোভনে পরীক্ষা করেছিল আমি নিমক হারাম কি না;

কত ভাবে যে আমায় দেখেছিল তা আর বলে শেষ করা যায় না। যাই হোক স্ত্রীপুত্র যে দুটো খেতে পাবে এই আমার খুব আনন্দ। এই দলে দিশে একটু একলা হলেই নিরিবিলি পেলেই কেবল তার কথাই মনে হত, সে আমায় শতবার যা নিষেধ করেছিল আমি তাই করেই তাদের ভরণ পোষণ কচ্ছি, এ কথা সে কিছুই জানে না, জানতেও পার্বে না, কিন্তু আমি কোন মুখে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াব। এই অবিশ্বাসের কালি মেখে ফিরে যেতে ত পার্ব না; অন্য সকলের সঙ্গে যাই করি না কেন তার সঙ্গে ঐ আচরণ, ছি! থাক ফিরে আর যাব না, যতদিন পারি তাদের সাহার্য্য করি, তারপর ভগবান করুন এইখানেই যেন আমার সব শেষ হয়ে যায়।

এমন করে ছ'মাস কেটে যাওয়ার পর, তারা আমার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখে গোয়েন্দা বিভাগে কাজ দিলে, সে হচ্ছে দিল্লীতে যে সব ধনী লোক নূতন আসে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা। এই কাজ দুমাস করার পর আমাদের একটা দল বোম্বে রওনা হল, সেই সঙ্গে আমিও চলে গেলাম। সেখানে গোয়েন্দা বিভাগে একজন লোক ছিলেন খুব পাকা লোক; তার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর আমি তার সাহচর্য্য কর্তে লাগলাম। তখন আমি একেবারে ফুলবাবু; পোষাক-পরিচ্ছদ সে সব আমার তারাই দিত। বোম্বে বেশ পরিষ্কার জায়গা, ধনী লোকের আমদানি রপ্তানিও খুব, সুতরাং ব্যবসা বেশ ভাল ভাবেই চলতে লাগল। এইখানে এসেই আমার কুড়ি টাকায় পদোন্নতি হয়, এই আমার জীবনের প্রথম অধ্যায়।

(ক্রমশঃ)



১ম বর্ষ। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ ২য় সংখ্যা।

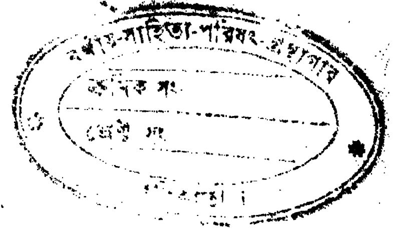
আহ্লাদ

সম্পাদক—শ্রীচারুচন্দ্র সান্ন্যাল।



সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

আবাদ



"এমন মানব-জমিন্ রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোণা।"
—রামপ্রসাদ।

১ম বর্ষ { জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ } ২য় সংখ্যা

অভদ্র-কাব্য।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

প্রভাত হইতে ভদ্রপাড়ায় ঘুরে'-ঘুরে' সারা বেলা,
হজম করিয়া হরেক রকম ভদ্র-আনার ঠেলা—
মুখোস-পরান মোলাম মিথ্যা, বিনীত অহঙ্কার,
গরীবের পরে সহৃদয় ঘৃণা, ভণ্ডামি করুণার—
সন্ধ্যাবেলায় শূন্য জঠরে এলাম রে তোর দ্বারে
ওরে চাষা, তোর আগড়টা খোল্, ঠাঁই দে দাওয়ার ধারে;
তোরি ঘরে আজ রাতটা কাটাব, কয়ে দুটো সোজা কথা,
ঠিক জানি, তুই চিরদুখী বুকে বুঝিবি আমার ব্যথা;
না যদি বুঝিস্, তাও ত বুঝিব, রহিবে না কোন গোল,
নহে সে মিথ্যা মাথা-নাড়া শুধু—ভদ্র-আনার ভোল!

থাক্ থাক্ ভাই, ব্যস্ত হোস্নে, কাঁথাতেই হবে বেশ,
খড়ের বুঁদীটা ওই ত রয়েছে, ঘুম পেলে দেব ঠেস্;
এই শীতে আর পা-ধোবার জলে কোন দরকার নাই;
থাক্রে পাগ্লা, হয়েছে প্রণাম, বোস্ দেখি কাছে ভাই।
…খাবার যোগাড়—এখনি কি তার? হোক্ না খানিক রাত,
হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই হবে,তোর ঘরে খেলে যাবেনাক আর জাত!
দাঁড়িয়ে কেরে ও? তোরি ছেলে নাকি? মদ্না না ওর নাম?
তোরি মত দেখি যোয়ান হয়েছে! করে ত রে কাজকাম?
ক্ষেতের কর্ম্মে ভারি দড় নাকি! আহা! ভারি খুসী শুনে'—
কি বল্লি—এই কুড়িতে পড়িবে সাম্নের ফাল্গুনে!

সারাদিন ভাই, কিছু খাই নাই—সত্যি কথাই বলি,
বড় লোক যারা—খেতে বলে কেউ? মিছে এত বড় হ'লি!
চা ও খানদুই বিস্কুট্ নামে সঙ্গে তাহারি চাট্—
তাই দিয়ে বটে রাখে কেউ কেউ ভদ্র-আনার ঠাট্;
বাজে কথা থাক্—ক'বিঘা চোতেলি করেছিস্ এই সন?
পাটে কত পেলি, নয়ালির ধান ঘরে এল ক'কাহন?
মহাজন-দেনা রাজার খাজ্না—হয়েছে ত সব শোধ?
বেশ বেশ ভাই, বড় খুসী তোর দেখে' বিবেচনা বোধ!
ওরে ও মদ্না, একটা কল্কে তামাক পারিস্ দিতে?
দিয়েছিস্ নাকি! এ যে দেখি তুই বাপেরেও গেলি জিতে'

ত্যাগ, মানুষের কষ্ট থাকে না, হয় যদি লোক খাঁটি,
সোনার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলার মাটি!
মাটিরই যদি না এ হেন মূল্য, মানুষের দাম নাই?
এই সংসারে এই সোজা কথা সব আগে বোঝা চাই।
বিশ্বপিতার মহা কারবার এই দিন দুনিয়াটা,
মানুষই তাঁহার মহামূলধন, কর্ম্ম তাহার খাটা;
তাঁরি নাম নিয়ে খাটিবে যে জন, অন্ন ত তার মুখে,
বিধাতার সেই সাচ্চা খাচ্চা কখনো পড়ে না দুখে;
তবে যে হেথায় দেখিবারে পাই গরীবের দুর্গতি,
অর্থ তাহার, চেনে না সে তার শক্তির সংহতি।

সেই শক্তির মূল কথাটাকে ভালো করে' বেশ বুঝে',
আপনার মাঝে আপনার বল লইতে হইবে খুঁজে ;
নিজ ঘরে থেকে পর-ঘরে' যত শিক্ষা সভ্যতার
সেই শক্তির গোড়ায় হেনেছে কুঠার তীক্ষ্ণধার !
নিজেরে যে মূঢ় আপনি মেরেছে, কে তারে বাঁচাবে বল্,
তাই তারে নিয়ে জুয়ো খেলে যত জাত-জুয়াড়ীর দল !
ধনী মহাজন, মনিব কৃপণ রাজা প্রভু সরকার
নানা নামে তারে খেল্‌না সাজিয়ে সাধে নিজ দরকার !
পোষণের নামে শোষণ তাই ত শাসন করিছে বিশ্ব,
নিত্য নিয়ত নিঃশক্তিরে নিঃশেষে করি নিঃস্ব !

পায়ের তলার ধুলো সেও, যদি কেউ পদাঘাত করে,
নিমিষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি' তার শিরোপরে,
মানুষ কি সেই ধূলি চেয়ে হীন, সহিবে যে অপমান,
আত্মার সেই মহা দুর্গতি নহে দেবতার দান !
নাই ভগবান নাইক ধর্ম্ম যাদের শিক্ষামূলে,
ছিন্নমস্তা শিক্ষা সে শুধু শয়তানি ইস্কুলে।
দূর করি সেই ঝুটো সভ্যতা যত ফুঁকো শিক্ষার
দূর করি সেই ভেক্-নেওয়া যত অপমান ভিক্ষার,
আপনার মত আপন শিক্ষা নিজে নিতে হবে জিনে,
মুক্তির পথ মিলিবে তবে ত দেশযোড়া দুর্দ্দিনে।

কি হোল মোড়ল, কথা যে কওনা—ভয় হয় মনে নাকি ?
নিজ ছায়া দেখি উঠিছ চমকি' নিজেরই আবাসে থাকি !
নিজের বলিয়া বিশ্বাসটুকু হারায়েছ যেই দিন,
সেই দিন থেকে জেনো ভাই সবে হয়েছ শক্তিহীন ;
সেই বিশ্বাস ফিরে' পেতে হবে আপন মর্ম্মমাঝে,
দেখিবে সকলি সোজা হয়ে যাবে কথায় এবং কাজে ;

মাথার মধ্যে ভগবান আর বুকের মধ্যে বল,
আজ থেকে তাই করে নে সবাই যাত্রার সম্বল ;
করিনু শপথ, সোজা হবে পথ, লক্ষ্মী আপনি সেধে
তোদেরি আবাসে করিবেন বাস দখলি-পাট্টা বেঁধে।

ডাকিছে শেয়াল, রাত্রি দুপুর হ'ল বুঝি এইবার,
খাটুনির দেহ, এইবার ভাই বিশ্রাম দরকার।
সৌরভ যেন পাই বা কিসের, চিড়ে কোটা বুঝি হয়,
ঢেঁকির শব্দ—তাই ত রে ঠিক ; সমস্ত বাড়ীময়
নূতন ধানের মধুর গন্ধ মাতায়ে তুলিছে মন—
আর কি চাইরে, কোনও আয়োজনে নাই কিছু প্রয়োজন।
অতখানি দুধ—কি হবেরে ভাই, খানিকটা রাখ্ তুলে',
হজমই হয় না খাঁটি দুধ, সে ত বহুদিন গেছি ভুলে'।
এখো গুড় নাকি ? বাড়ীতে হয়েছে ? তিন মন দশ সের !
সবি ত বাড়ীর ? হায় একি দান গরীব গৃহস্থের !

শু'তে যাও ভাই—রাত্রি অনেক, নিদ্রাও পায় ভারি,
হেন মনে হয়, আজ বুঝি প্রাণ শান্তির অধিকারী।
বড়লোক আর ভদ্রলোকের অভদ্র ব্যবহারে
যে জ্বালা পেয়েছি, মনে হয় বুঝি জুড়াইল এইবারে।
সহজ উদার সরল পরাণ, ছেঁদো সভ্যতাহীন,
শুষ্ক রুক্ষ শিক্ষাশূন্য চির নিরুপায় দীন,
তোরি ঘরে যেন মনে হয় আজি সারা ভারতের পথ
অশ্রুসজল রয়েছে চাহিয়া অদূর ভবিষ্যৎ।
দেহ মন দিয়া প্রণতি আমার করি আজ তোরে চাষা,
তোরি দ্বারে আজ দিয়ে গেনু বাঁধা হৃদয়ের ভালবাসা।

নানা কথা।

মহাত্মা গোখ্‌লে বলিয়াছেন, "বাঙ্গলাদেশ আজ যাহা চিন্তা করে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সে চিন্তার ঢেউ লাগে অনেক পরে।" মনস্বী গোখ্‌লের এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় ভারতের ভাব-জগতে বাঙ্গালীর আসন ছিল কত উচ্চে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বাঙ্গালী এই মহনীয় আসন হইতে অনেকখানি নামিয়া গিয়াছে। যে অতুলনীয় ধীশক্তি ও মনীষার গৌরব-তিলক বঙ্গবাসীর ললাটে একদিন হোম-শিখার মত দীপ্যমান ছিল আজ যেন তাহা কোন্ অলক্ষ্য হস্তের অকরুণ ইঙ্গিতে ম্লান হইয়া গিয়াছে। কেন তাহা বলি। বাঙ্গালী আজ অন্নের কাঙ্গাল। ঘরে আহারের সংস্থান নাই, শস্যপ্রসবিনী মাতৃভূমির প্রদীপ্তআনন আজ অনশনে অবমানে ক্লিষ্ট ও পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। অনন্য-উপায় বাঙ্গলার ভদ্রসন্তান চাকুরীর উমেদারী করিয়া করিয়া তাহার নিজস্ব প্রতিভা হারাইয়া ফেলিয়াছে। অভিশপ্ত দাস-জীবনের দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা তাহার মানসিক বৈভবের প্রোজ্জল চিহ্ন যেন নিঃশেষে মুছিয়া দিয়াছে। একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা, লব্ধ-চাকুরী বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্ববিধ হীনতাকে আশ্রয় করা—ইহাই কি বাঙ্গালীর চিন্তাশীলতার অপ্রতিবিধেয় পরিণাম? যে বিশ্বগ্রাসিনী বণিক্-সভ্যতা তাহার রাক্ষসী ক্ষুধার তাড়নায় লেলিহান রসনা বিস্তার করিয়া পৃথিবী গ্রাস করিতে উদ্যত, যে বিরাট যন্ত্রশক্তি মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রার পথে পর্ব্বত-প্রমাণ বাধার সৃষ্টি করিয়া তাহার অনাহত ধারাটীকে আবর্ত্ত-সঙ্কুল ও বস্তুমুখী করিয়া দিয়াছে, সেই নৃশংস দস্যুতার লুণ্ঠনের ফলে বাঙ্গালীর নিজস্ব যাহা কিছু ছিল সবই যাইতে বসিয়াছে। বাঙ্গালী-জীবনের এ অসীম রিক্ততার এই কায়াময়ীমূর্ত্তি;—লাঞ্ছিত, পদ-দলিত জাতির এই অরুন্তুদ বেদনার কাহিনী কি কোনদিন অনাগত বিপুল ভবিষ্যতের উদয়-সম্ভাবনায় অরুণ-বসনা ঊষসীর মত অপূর্ব্ব সুষমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে না?

আজ চাই যুগ-যুগ-সঞ্চিত আলস্য ও জড়তাকে সবলে ঠেলিয়া দেশব্যাপী বেকার সমস্যার সমাধান করিবার জন্য মিলিত প্রচেষ্টা।

কি উপায় অবলম্বন করিলে চাকুরীর জন্য উমেদারীর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া স্বাধীন জীবন যাপন করা যায়—কোন্ পথ ধরিয়া চলিলে সামান্য উপজীবিকার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার করঙ্ক বহিয়া বেড়াইতে না হয় সে প্রশ্নের সমাধান না করিলে জাতীয় জীবনে উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই কঠিন সমস্যার সরল সমাধান মিলিবে কৃষিবৃত্তি অবলম্বনে। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে বিদ্যায়তনগুলির মধ্যে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত তাহার পরিবর্ত্তন আশু আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যে শিক্ষারীতি মানবের ভিতরকার সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে পারে না—পরন্তু শরীরকে দৃঢ় ও পেশীবহুল না করিয়া মস্তিষ্ক সার করিয়া তুলে—আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান্ না করিয়া কেবলমাত্র অনুকরণ-পটু করিয়া তুলে—সে শিক্ষারীতি বেশী দিন ধরিয়া চলিলে যে আমাদের জাতীয় অধঃপতন অনিবার্য্য সে কথা না বলিলেও চলে। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় দুইটী কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কর্ত্তৃপক্ষগণ কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। বাঙ্গলা কৃষি-প্রধান দেশ—অথচ এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে রীতিমত ব্যবস্থা করেন নাই; শিক্ষার এরূপ বিড়ম্বনা আমাদের মত পরাধীন দেশেই সম্ভব। অপিচ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে কৃষিশিক্ষা কেন্দ্রগুলি আছে সেখানেও কতকগুলি কেতাব মুখস্থ করাইয়াই কর্ত্তব্য শেষ করা হয়, কৃষি বিষয়ে কার্য্যকরী জ্ঞান লাভ করিবার কোন সুবিধাই সেখানে নাই। ফলে সে সকল ছাত্রেরও মুখ্য পেশা চাকুরীর অন্বেষণ—আর মুখে স্বাধীন কৃষিজীবনের স্তবগান। তবে বাঙ্গলার পক্ষে সুবিধার কথা এই যে, এইরূপ অকর্ম্মণ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা না থাকায় বঙ্গীয়

যুবকগণের উৎসাহ এবং দেশের কিছু অর্থ বাঁচিয়া গিয়াছে।

কিছুদিন হইতে ঢাকায় একটী সুবৃহৎ কৃষি-কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। ইহাতে বিস্তর অর্থ ব্যয় হইবে এবং সে অর্থের অধিকাংশ দরিদ্র কৃষক-কুলের অভাববহুল জীবনের বাধ্যতামূলক অবদান। সুতরাং ইহার ভাল-মন্দ সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিবার অধিকার প্রত্যেক বাঙ্গালীর আছে। প্রথমতঃ এইরূপ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা কৃষককুলের লাভের সম্ভাবনা অল্প। দ্বিতীয়তঃ ইহার দ্বারা কৃষকবালকদের কোন উপকার দর্শিবে না যেহেতু এই সকল কৃষিআয়তনের প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইলে যে বিদ্যার মূলধন আবশ্যক তাহা শতকরা নিরানব্বই জন কৃষক সন্তানের নাই। প্রকৃতপক্ষে, ইহারাই কৃষিশিক্ষার উপযোগী, কারণ, এবিষয়ে তাহাদের সংস্কার জন্মগত এবং কৃচ্ছ্র সাধনে পারগও তাহারাই। তথাকথিত ভদ্রসম্প্রদায়ের কৃষিশিক্ষা লাভ করিয়া কার্য্যকরী কিছু করিয়া তোলার ইচ্ছা এবং চেষ্টা দুইএরই বিশেষ অভাব। কাজেই কেবল কৃষি-বিভাগের কতকগুলি উচ্চ বেতনভোগী কর্ম্মচারী গঠন করিবার নিমিত্ত এই ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠানের কোনরূপ সার্থকতা আমরা দেখিতে পাই না। সাবরের কৃষিকলেজ কৃষি শিল্পের উন্নতি-বিধায়ক স্থায়ী কিছুই করিতে পারে নাই। চুঁচুড়া কৃষিবিদ্যালয় উপযুক্ত বিদ্যার্থীর অভাবে যাইতে বসিয়াছে এবং ইদানীং উহা দেশের অবস্থার উপযোগী করিয়া গঠন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ঢাকা বিদ্যালয়ের অবস্থাও আশাপ্রদ নহে।

ভারতীয় কৃষিনিকেতনগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে বনেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ছাদে উঠিতে হইবে। প্রথমে চাই কতকগুলি কৃষিবিদ্যায় অনুরাগী ব্যক্তি যাঁহারা কার্যের দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিবেন, আধুনিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া চাষবাস করিলে কৃষি শিল্পের কতদূর উন্নতি হইতে পারে। যাহাতে বাল্যজীবন হইতেই দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়—যাহাতে কৃষকসন্তান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করিতে পারে,—পরাধীন চাকুরীর জীবন অপেক্ষা শস্পশাদ্বলোদ্বেলিত দেশজননীর শ্যামল অঞ্চলচ্ছায়ায় অনাড়ম্বর মুক্ত জীবন যাপন সহস্রাংশে শ্রেয়ঃ সেবিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করা প্রত্যেক বিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য ঐশ্বর্য্য ও বাহুল্যের জীবনের প্রতি চিত্ত একবার ধাবিত হইলে তাহাকে সে প্রভাব হইতে ফিরাইয়া আনা সহজ নহে।

কিন্তু সকল বিপত্তি মূলে। পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত আমরা যদি একটু একটু করিয়া কৃষি-বিষয়ক শিক্ষা পাইতে থাকি তবে পরিণত বয়সে চাষবাসে আমাদের অনুরাগ না জন্মিয়াই পারে না এবং কৃষি সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষালাভও অনেক পরিমাণে সুগম ও সহজ হইয়া যায়। নতুবা অধিক বয়সে আমরা কৃষিকলেজে প্রবেশ করি, অবিমিশ্র চাকুরীর লালসায়, চাষআবাদের প্রতি কোনরূপ অনুরাগ প্রণোদিত হইয়া নহে। আধুনিক শিক্ষা প্রণালীই এজন্য মূলতঃ দায়ী। গত বৎসর গ্রীষ্মের সময় বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে কৃষিশিক্ষা বিধানের প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দ্ধারণ কল্পে পঞ্জাবে এক বৈঠক হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নির্দ্ধারিত পন্থা এখনও সাধারণে প্রচারিত না হওয়ায় উপস্থিত এ বিষয়ে কোন মতামত দেওয়ার উপায় নাই। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, বৈঠকের মীমাংসা যাহাই হউক না কেন প্রস্তাবিত ঢাকা-কৃষি-আয়তন এখন মুলতুবী রাখাই ভাল এবং নির্দ্দিষ্ট অর্থ, কৃষিবিদ্যা শিখাইতে ইচ্ছুক এরূপ প্রাইমারী ও উচ্চবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে ব্যয় করাই বাঞ্ছনীয়। আমাদের বিশ্বাস এইরূপ প্রণালীতে কৃষি প্রচার-কার্য্য আরব্ধ হইলে অর্থব্যয় সার্থক ও দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

প্রত্যেক সভ্য দেশেই এইরূপ ধারাবাহিক শিক্ষারীতি প্রচলিত আছে। জার্ম্মানীতে কৃষিশিক্ষার প্রথম সোপান (১) "Country Continuation Schools" অর্থাৎ প্রাইমারী বিদ্যালয় সংলগ্ন কৃষি-শিক্ষা-বিভাগ। ইহার অব্যবহিত পরের সোপান (২) "নিম্নতর কৃষি-বিদ্যালয়" (Lower Agricultural School). (ক)* এই বিদ্যালয়ে দুই হইতে তিন বৎসর শিক্ষালাভ করিতে হয়; (খ) শীতকালীন কৃষি-বিদ্যালয় (Agricultural Winter School) এখানে

* *Ackerfanschulen

শীতের সময়ে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। চাষআবাদের পক্ষে শীতকাল উপযোগী নহে বলিয়া কৃষক সম্প্রদায় এ সময়ে পুত্রদের অনায়াসেই কৃষি-শিক্ষার জন্য পাঠাইতে পারে। ইহার পর (৩) "উচ্চ কৃষি-বিদ্যালয়" এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কৃষি প্রতিষ্ঠান সমূহ। উপরে প্রদত্ত বিবরণ হইতে সহজেই বুঝা যায়, কি সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জার্ম্মানীতে কৃষিশিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতের ব্যবস্থা সবই বিচিত্র। এখানে বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাইমারী স্কুলে নামাই গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। এই নিদারুণ অঙ্গব্যবচ্ছেদে মৃতকল্প অসহায় ভারতের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্ষীণ স্পন্দনটুকুও বুঝি বা থামিয়া যায়।

গো জাতির উন্নতি বিধান।

গো জাতির উন্নতির উপর দেশবাসীর জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতি বিশেষভাবে নির্ভর করে। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতিই আপন আপন গোধনের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট। একমাত্র ভারতবর্ষেই এ বিষয়ে কি দেশবাসী, কি সরকার সকলেই সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু আমাদের মনে হয় সময় থাকিতে এখনও এইদিকে প্রত্যেকের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক। চারিদিক হইতে এ বিষয়ে সকলের যত্নবান হওয়া ও যথাসাধ্য চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। দেশীয় গরুগুলি যাহাতে ভাল জাতীয় বলদের সংশ্রবে আসিয়া সুস্থ ও পুষ্টতর বৎসের উৎপাদন করিয়া ক্রমে শক্তিমান হইয়া উঠিতে পারে —এইজন্য বর্ত্তমানে অনেক চেষ্টা চলিতেছে।

কৃষি বোর্ডের গত বর্ষের অধিবেশনে এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে গো-জাতির উন্নতি সাধনের জন্য ভাল বলদের আমদানী আবশ্যক বলিয়া, রেলওয়ে বোর্ডকে অনুরোধ করা হইবে যে তাহারা যেন বলদ স্থানান্তর করিবার রেলওয়ে মাশুল কমাইয়া দেন। আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে বাংলা দেশে রংপুর সরকারী গোশালাতে বলদের জন্য অতি উচ্চ মূল্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ইহার কারণ দর্শাইতে গিয়া সরকার বলেন যে ইংলণ্ড হইতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ষ্টাড্‌ জাতীয় বলদ রপ্তানি করা হয়; সেখানেও ষাঁড়ের দাম অতি উচ্চ হ'রেই লওয়া হয়। কিন্তু একথা সহজেই বোধগম্য যে ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে অধিক খরচে দামী ষাঁড় প্রতিপালন করিবার প্রথা চালন, অত্যন্ত কঠিন কারণ এখানে বিনামূল্যে ষাঁড় পাওয়া যাইতে পারে—অবশ্য এরূপ ষাঁড় ভাল জাতীয় নহে। এরূপ স্থলে সরকার উচ্চ মূল্য গ্রহণ করিলে ভাল ষাঁড়ের প্রচলন করা সম্ভব হইবে না।

এই প্রসঙ্গে আমরা মিউনিসিপালিটী এবং জিলা বোর্ডকে এ বিষয়ে সকলকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করি। এ বিষয়ে সত্বর মনোনিবেশ করা তাঁহাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্য।

এই সম্বন্ধে মধুপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ঔদাসীন্য ও মনোযোগের অভাব লক্ষ্য করিয়া অতীব দুঃখিত হইলাম। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল যখন উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন তখন প্রয়োজন বুঝিয়া মিউনিসিপ্যালিটীকে দিয়া একটী মুলতানী ষাঁড় ক্রয় করাইয়াছিলেন। বিহার উড়িষ্যা সরকারের ডিরেক্টর অব্ এগ্রিকাল্‌চার ষণ্ডটী খরিদ করাইয়া দেন। এই ষাঁড়টীর দ্বারা স্থানীয় গোজাতির বিশেষ উপকার হইতেছিল। কিন্তু সহসা কমিশনারগণ এই ষণ্ডটী পোষণ অনাবশ্যক বলিয়া স্থির করেন এবং গত ২২শে মার্চ্চ সেটীকে নিলামের বিষয় করা হয়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে মৌলবী মহম্মদ এসোক নামক জনৈক কমিশনের চেষ্টায় ষাঁড়টী উদ্ধার হয় এবং উহাকে স্থানীয় লোকালয়ে দেওয়া হয়। বাবু জগন্নাথ মাড়োয়াড়ী, অনন্তনাথ বসু, হরিচরণ ঘোষ এবং রাধাকৃষ্ণপ্রসাদ মহাশয়গণ ষণ্ডটী বিক্রয় করিবার পক্ষে মত দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ভাইস চেয়ারম্যান উহাকে রক্ষা করিবার স্বপক্ষে ছিলেন। কমিশনারগণ যে এরূপ উৎকৃষ্ট ষণ্ড পোষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই ইহা বাস্তবিক দুঃখের বিষয়।

বিহার উড়িষ্যা সরকার সে প্রদেশের গোজাতির উন্নতিকল্পে একটী আইন পেশ করিতেছেন। তাহাতে ব্যবস্থা থাকিবে—মিউনিসিপ্যালিটীগুলিকে খোয়াড়ের

আয়ের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ ষণ্ড রক্ষার্থ ব্যয় করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে যদি এইরূপ আইন করা হয় যে কেহ ষণ্ড মারিয়া ফেলিলে দণ্ডনীয় হইবে তাহা হইলে সুফল হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে ধর্ম্মের ষাঁড় কাহারও সম্পত্তি নহে স্থির হওয়ায় অনেক দুষ্ট লোক ষণ্ড মারিয়া ফেলে। এই নির্দ্দেশ পরিবর্ত্তন করা একান্ত প্রয়োজন।

গরুর উন্নতি কল্পে মহীশূরের সরকার যেরূপ উৎসাহ দিতেছেন ও বিশিষ্ট ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ষণ্ডের মূল্য একশত টাকার অধিক হইতে পারিবে না অধিকন্তু ক্রেতাকে উক্ত মূল্যের অর্দ্ধেক মাত্র বহন করিতে হইবে বক্রী অর্দ্ধ সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে—তবে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি ক্রেতাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে :—

(১) গাভীর প্রয়োজন সময়ে ব্যবহারের জন্য মাত্র এক টাকা লইয়া ষণ্ডের অধিকারী ক্রীত ষাঁড়টীকে সর্ব্বসাধারণকে দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) যে কোন সময় সরকারপক্ষ ষণ্ডটীকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন। উহাকে ভালরূপে যত্ন সহকারে পালন করিতে হইবে এবং ব্যবহারের সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ হইতে এইরূপ অভিযোগ শুনা গিয়াছে যে রঙ্গপুর গোশালার ষণ্ড ব্যবহার সম্বন্ধে নাকি সাধারণের সহানুভূতি পাওয়া যায় না। উক্ত গোশালার ডিরেক্টর মহাশয় গত বৎসরের রিপোর্টে লিখিয়াছেন—"প্রতি নিয়ত গোজাতির অবনতির কথা রটনা করা সত্ত্বেও বাংলা দেশে উৎকৃষ্ট ষাঁড় ব্যবহারের আগ্রহ দেখা যায় না।" তিনি আরও বলেন—"সর্ব্বসাধারণ লোক ষণ্ডের অত্যধিক মূল্য (৩০০৲।৩৫০৲) অবগত হইয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। অনেকে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করে।"

আমাদের মনে হয় এত অধিক দামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা অসঙ্গত নহে। সরকার পক্ষ হইতে এইরূপ ষণ্ডের মূল্য কমাইয়া দেওয়া উচিত। মহীশূর সরকারের প্রথা অবলম্বন করিলে বোধ হয় বিশেষ ফল হইবে। আমাদের সরকার বাহাদুর কি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন?

আনারসের চাষ

ফিজি দ্বীপে পথের দুইপাশে অথবা সযত্নবর্দ্ধিত বাগানে আনারস যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সব জমিতে ন্যূন পক্ষে ৬০" ইঞ্চি এবং ঊর্দ্ধপক্ষে ১৪০" বৃষ্টিপাত হয় সেখানে আনারস খুব বেশী জন্মে। উত্তমরূপে আনারসের আবাদ করিতে হইলে অথবা ব্যবসায় করিতে হইলে নিম্নলিখিত কতগুলি বিষয় লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন :—

জল বায়ু

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে যে স্থানে শীতকালে ৭৫০ ও গ্রীষ্মকালে ৮৫ ডিগ্রি উত্তাপ হয় এবং দিন ও রাত্রির উত্তাপের পার্থক্য খুব অল্প ও বাৎসরিক ২ হইতে কুড়ি ইঞ্চি পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত হয় সেই সকল জমিই আনারস আবাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট। জমিতে জল না আটকাইলে

খুব বেশী বৃষ্টিতেও আনারস চারার ক্ষতি হয় না। আনারস গাছ ভালরূপে জন্মাইতে হইলে জল সরিয়া যাইবার জন্য পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত খুব ভাল থাকা প্রয়োজন এই জন্য সমতলভূমি অপেক্ষা গড়ান জমিই ইহার আবাদের পক্ষে প্রশস্ত। বেশী রকম খাড়া জমিতে আনারস খুব ভাল জন্মিয়া থাকে বটে তবে অল্প গড়ান জমিতে চাষের পক্ষে সুবিধা হয় এবং খরচও কম লাগে সে জন্য এই রকম জমিতেই ইহার চাষ করা উচিত। সেই কারণে শিলংগ (shillong) কালিমপোঙ্গ (kallimpong) চট্টগ্রাম প্রভৃতি দেশে সাধারণতঃ আনারসের চাষ বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে। পাঁচশত হইতে আটশত ফিট উচ্চ জমিতে আনারস চাষ করা প্রয়োজন কারণ নিম্নতর স্থানে চাষ করিলে চারাহানিকর নানাপ্রকার পোকা জন্মিয়া গাছগুলি নষ্ট করিয়া দিবার আশঙ্কা থাকে। অতি বৃষ্টির জল যাহাতে জমির স্থানে স্থানে জমিয়া যাইতে না পারে এইজন্য জমির নিম্নাভিমুখে প্রণালী কাটিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

মাটি।

আনারস গাছ জোলো মাটি অথবা এঁটেল মাটিতে জন্মিতে পারে না। এই জন্যই ইহার পক্ষে বেলে মাটির জমি প্রয়োজন যাহাতে শিকড় চারিধারে মাটির মধ্যে সহজেই প্রবেশ করিতে পারে এবং বাতাস যাওয়া আসা করিতে এবং বায়ুস্থিত জলকণাগুলি কাজে লাগিতে পারে। যে সকল জমিতে মান্‌গানীজ (manganese) অথবা চুণের আধিক্য আছে সেই জমিতে আনারস চারার পাতাগুলি হলুদবর্ণ হইয়া যায় এবং ফল খুব ছোট এবং টক্ হয়। অল্প পরিমাণে সালফেট্ অব আইরন্ জলে গুলিয়া মাসেক অন্তর সেই জল জমিতে ছিটাইয়া দিলে উক্ত দোষ দুরীভূত হইতে পারে। যে দেশে উল্লিখিত রূপ মাটির অভাব সেখানে খুব গম্ভীর করিয়া লাঙ্গল দিলেও ইহার চাষ করা যাইতে পারে। অথবা আনারস রোপনের পূর্ব্বে গরুর খাদ্যের জন্য মটর অথবা সীম চাষ করিলে পরে আনারসের চাষের অনেক সাহায্য হয়।

চাষ

যেখানে সার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না সে স্থানে চাষ করিলে যথেষ্ট লাভ আছে সন্দেহ নাই। ফিজি দ্বীপে যে প্রথায় চাষ হয় তাহা অল্প জমির পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও বৃহৎ জমির পক্ষে উপযুক্ত নহে। ফিজিতে স্থানীয় লোকেরা "ডোকো" নামে একপ্রকার লাঠির দ্বারা জমি চাষ করে। এই লাঠির অগ্রভাগ সরু। কৃষক লাঠির উপরিভাগে চাপ দিয়া প্রায় ৯ ইঞ্চি আন্দাজ মাটির ভিতর উহাকে প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং তারপর ধীরে ধীরে ঠেলিতে থাকে এইরূপে মাটীগুলি নরম হইয়া যায়। অধিক জমি চষিতে হইলে বিভিন্ন দিক হইতে উক্ত প্রথাই অবলম্বন করা হয়। অতঃপর উক্ত 'ডোকো' দিয়া স্থানে স্থানে প্রয়োজন মত গর্ত্ত করিয়া লওয়া হয়। এই গর্ত্তের মধ্যেই আনারসের বীজ রোপণ করিয়া মাটি দিয়া তাহা বুজাইয়া দিয়া জমি চৌরস করাইয়া লওয়া হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে চাষ করিতে হইলে ঝাড় জঙ্গল তুলিয়া না ফেলিলেও চলে এবং এই প্রথাতে অতি গড়ান বা খাড়া জমিও চাষ করা অসম্ভব হয় না। পরবর্ত্তী কালে আগাছা পরিষ্কার করিতে খরচা অনেক বেশী হয় তবে কর্ষিত জমিতে ফল পাকিবার সময় উক্ত কার্য্য অনেকটা সুবিধাজনক হয়। যে সকল জমিতে আগাছায় আগুন লাগাইয়া পরিষ্কার করা চলে সেখানে আগাছা পরিষ্কার কার্য্যে খরচ কম লাগে। জমি একবার পরিস্কৃত করিয়া লইতে পারিলে তাহা চাষের পক্ষে সহজ হইয়া পড়ে এবং পুনঃ পুনঃ মই দিয়া মাটী নরম এবং জমি চৌরস করিয়া লইতে হয়। এই অবস্থায় চারি পাঁচ সপ্তাহ রাখিলেই আগাছার শিকড়গুলি নষ্ট হইয়া যাইবে এবং অবশেষে জমি বীজ বপনের জন্য লাইন বাঁধিবার মত নরম এবং ঝুরা হইবে। এই প্রথায় কর্ষিত জমি বাজে গাছ জন্মিবার হাত হইতে সহজেই রক্ষা পাইবে এবং বহুদিন অনাবৃষ্টি হইলেও জমি বাতাস হইতে জলকণা টানিয়া লইয়া নরম এবং ভিজা থাকিবে।

ফিজি দ্বীপে একপ্রকার খুব বড় আনারস পাওয়া

যায়। সেখানকার লোকেরা উহাকে "কুইনপাইন" অথবা "জায়েন্টফিউ" বলে।

আনারস গাছের পাতাগুলি খুব লম্বা, চওড়া এবং মসৃণ হয়; ডগার দিকে শিরও দেখা যায়। পাতার রং গভীর সবুজবর্ণ। ফুলগুলি লাল এবং নীলবর্ণ মিশ্রিত রং (purple) হয়। ফল বড় হইলে ওজনে প্রায় দেড় সের হইতে ছয় সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পক্কাবস্থায় ফল কমলা নেবুর মত গভীর হলুদবর্ণ হয়—ভিতরের রং ফিকে হলুদবর্ণ হয়। এই জাতীয় আনারস বেশ পুষ্টিকর এবং সুগন্ধ। ইহার বীজগুলি বড় এবং চেপ্টা হইয়া থাকে।

এই জাতীয় আনারস অপরাপর আনারসের মত সহজে শুকাইয়া যায় না। গ্রীষ্মকালেই সাধারণতঃ ইহা পাকিয়া উঠে। শীতকালে এবং বসন্তাগমে এই আনারসই ইংলণ্ডের বাজারে বিক্রীত হয়।

ফিজি দ্বীপে যে আনারস সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় তাহার নাম "রাইপলি কুইন"। ইহার পাতাগুলি সবুজ বর্ণ; পাতায় শিরা থাকে কিন্তু বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই দাগগুলি মিলাইয়া যায়। এই ফলের আকার ছোট। ভিতরের রং সোনালী বর্ণ। ইহা খাইতে সুস্বাদু, রসাল এবং সুগন্ধ।

রোপণ-প্রথা

বীজ রোপণ করিয়া আনারসের চাষ করিবার প্রথা ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রশংসার্হ নহে কারণ ইহার বীজ হইতে গাছ জন্মাইতে বহু বৎসরের প্রয়োজন এই জন্য চারা অথবা শাখা প্রশাখাই রোপণ করা নিয়ম। আনারস গাছ একবার মাত্র ফল দেয়। পরে মূল গাছ হইতে চারিপাশে শাখা গাছ গজায় এবং কালক্রমে তাহাতে ফল হয়। মূল গাছের ফল কাটিয়া লইবার পর তাহা তুলিয়া ফেলিবার সময় দেখিতে হয় যে কলমচারা হইয়াছে কিনা। কলমচারা রাখিয়া পুরাতন গাছটী উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হয় এবং যদি বেশী কলম জন্মিয়া থাকে তবে মাত্র ২।৩টী রাখিয়া দেওয়াই বিধেয়। অনেকে মূল গাছজাত চারা অপেক্ষা "প্রশাখা চারাই" অধিকতর উপযুক্ত বিবেচনা করেন কারণ এই পার্শ্বজাত চারায় যে ফল জন্মে তাহা আসল ফলের মত হয় না।

পাতার গোড়া হইতে যে পৃথকভাবে চারা জন্মায় তাহাকেই "প্রশাখা চারা" বলা হয়। একই গাছে এইরূপ দুই বা ততোধিক চারা জন্মিতে পারে। যদি এই চারা ফলের আকার বৃদ্ধির পথে বাধা জন্মায় তবে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা প্রয়োজন। ফল হইতে আর এক রকম চারা জন্মিয়া থাকে। ইহারা আকৃতিতে ক্ষুদ্র হয় কিন্তু সংখ্যায় 'কলমচারা' অথবা "প্রশাখা-চারা" অপেক্ষা অধিক জন্মে। এই চারা পরে পৃথকভাবে ফলের আশায় রোপণ করিতে হয় কিন্তু ইহার মধ্যে দুই তিনটীকে নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত।

ফলের উপরিভাগে একপ্রকার চারা জন্মে তাহাকে "শীর্ষ-চারা" বলিতে পারা যায়। এই চারাগুলি প্রয়োজন মত রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয় নতুবা ইহাতে রসাধিক্য হেতু গাছের প্রয়োজন মত বৃদ্ধি হয় না।

অন্যান্য অংশ ছাঁটিয়া ফেলিয়া যে চারা পাওয়া যায় তাহাও খুব সত্বর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আনারস গাছের এই অংশে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষার থাকে।

আকের চারার মত ইহাও গর্ত্ত করিয়া রোপন করা চলে। ফলনের সময় সাধরণতঃ চারা-গাছের শক্তির উপরই নির্ভর করিয়া থাকে।

মূলগাছের পার্শ্ববর্ত্তী চারা তেজীয়ান হইলে প্রায় ১ বৎসরের মধ্যেই ফল দেয়। প্রশাখা চারায় ফল ধরিতে প্রায় ১৫ মাস হইতে আঠার মাস সময় লাগে। 'শীর্ষচারায়' তদপেক্ষাও অধিক সময় লাগিয়া থাকে।

অনারস গাছ ভাল করিয়া জন্মাইতে হইলে উপযুক্ত সাবধানতা সহকারে রোপন করা প্রয়োজন। গোড়া যাহাতে পচিয়া না যাইতে পারে এই জন্য প্রত্যেক চারাকে রোপন করিবার পুর্ব্বে মূলের দিকটা রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া উচিত। যদি চারার গোড়াতে খাদ্যান্বেষী কোন পোকা লক্ষিত হয় তবে সেই দিকটা কয়েক-মিনিটের জন্য কেরোসীনে ডুবাইয়া লওয়া প্রয়োজন। যদি চারা একটু অধিক দূরে লইয়া যাইবার প্রয়োজন

হয় তবে তাহা থলি কিংবা বাক্সে বন্ধ না করিয়া ডগার দিকগুলি এক দিকে লইয়া ২৫,৩০টী চারা দিয়া এক একটী আঁটী বাঁধিয়া লওয়াই উচিত।

চারাগুলি পুঁতিবার পূর্ব্বে রৌদ্রে গোড়া শুকাইবার সময় সেই দিকের ছোট পাতার দাগগুলি তুলিয়া ফেলা উচিত তাহা না হইলে শিকড় গজাইবার সময় তাহারা অন্তরায় স্বরূপ হইবে। উক্ত পাতা-দাগগুলি সময় সময় মূলের চারিদিক এমনভাবে বন্ধ করিয়া দেয় যে শিকড় কিছুতেই বৃদ্ধি পাইতে পারে না। ফলে চারাগুলি পুনরায় তুলিয়া ক্ষীণ জড়ানশিকড়গুলি কাটিয়া আবার বপন করিবার পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়।

রোপনকার্য্য বৎসরের যে কোন সময়ই আরম্ভ করা যায়। তবে দেখা প্রয়োজন যে মাটি যেন একেবারে শুষ্ক না হইয়া একটু জলকণাক্ত ভিজা হয়। অবশ্য বর্ষাকালে রোপন করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত কারণ ঐ সময় হইতেই গাছের বৃদ্ধি আরম্ভ হয় এবং তাহাতে শীতকালেও কোনরূপ ক্ষতি হইতে পারে না।

চারার ব্যবধান

জাতি অনুসারে তিন বিঘা জমিতে ৩০০০ হইতে সাত হাজার চারা রোপন করা চলে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে আনারস চারা কাছাকাছি রোপন করা চলে তবে দেখিতে হইবে যে জমি যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায় এবং ফসল কাটিয়া লইবার জন্যও যেন যথেষ্ট পরিমাণে স্থান থাকে।

হাইই এবং কুইনসল্যাণ্ডে সাধারণতঃ প্রতি সারিতে ১৮ হইতে ২৪ ইঞ্চি দূরে এক একটি গাছ দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে এক একর জমিতে প্রায় ৫০০০ হাজার চারা লাগান হয়।

সিঙ্গাপুরে সাধারণতঃ পাঁচ ফিট্ অন্তর সারিতে পাঁচ ফিট্ অন্তর চারা লাগান হইয়া থাকে এবং প্রতি ১০০ ফিট অন্তর ৬ ফিট করিয়া রাস্তা রাখা হয়। এখানে প্রতি তিন বিঘাতে প্রায় তিন হাজার গাছ লাগান হইয়া থাকে। ফ্লোরিডাতে বার হইতে ১৫ ফিট জমির চারি দিকে পথ রাখিয়া ঘন করিয়া চারা বিশ ইঞ্চি ও বড় জাতীয় চারা ৩৬ ইঞ্চি দূরে রোপন করা হয়।

ঘন করিয়া রোপন করিলে ক্ষেত্র শীঘ্র আচ্ছাদিত হইয়া যায় আগাছা জন্মিতে পারে না, চারাগুলি পরস্পর পরস্পরকে বৃদ্ধি পাইতে সাহায্য করে এবং সূর্য্যোত্তাপ ও কম লাগে। অবশ্য এই প্রথার অসুবিধাও আছে,—যেমন অল্প জমিতে অধিক চারার প্রয়োজন হয় এবং অশ্ব দিয়া জমি চাষ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। জমি হইতে চারা অনেক সময় তুলিয়া ফেলিতে হয় নতুবা ফল সংগ্রহের সময় বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায় না।

চাষ।

চারা রোপনের পর হইতেই আগাছা বিনাশ ও মাটি ঝুরা ও নরম রাখিলে চারাগুলি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে পারে। যেখানে ঘোড়ার চাষ চলে সে সব জমিতে Planet Junior Hoeর সাহায্যে কোদালি দিয়া মাটি আলগা করিয়া দেওয়া এবং এবং হাত দিয়া আগাছা পরিষ্কার করিয়া ফেলা উচিত। "হাউই" Hawaii প্রদেশে আগাছা নষ্ট করিবার জন্য এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত জিনিষের ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাতে আগাছাও বিনষ্ট হয় এবং অধিক রৌদ্র লাগিয়া জমি হইতে জল শুকাইতে পায় না ফলে ফসলের পরিমাণ এবং জাতি ভাল হয়। নালা কাটিতে হইলে আগাছার দিকেই কাটা উচিত নতুবা আনারস চারার গোড়তে অধিক জল জমিয়া উহা পচিয়া যাইতে পারে। গাছগুলি পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে ইতস্ততঃ আগাছাগুলি তুলিয়া ফেলা প্রয়োজন এবং মধ্যবর্ত্তী জমিগুলি চষিয়া দেওয়া উচিত। এই সময়েই পুরাতন বৃক্ষ ও শাখা গাছ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলা দরকার।

কেবলমাত্র যে সকল চারা গাছের গোড়া হইতে জন্মায় তাহারই দুই একটা প্রতি গাছে রাখিয়া দেওয়া চলে। অধিক রাখিলে ঐরূপ ক্ষুদ্র চারাগুলি পরিপুষ্ট হইতে পারে না এবং গাছের ফলগুলিও ক্ষুদ্রকায় হয়। যে সকল গাছে ফল হইল না সেগুলি এবং অপরিপুষ্ট চারাও

বিনষ্ট করিয়া ফেলা উচিত। যে সকল উপচারার পাতার নিম্নে লম্বালম্বিভাবে কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায় সেইগুলিই সাধারণতঃ খারাপ চারা। যে গাছের পাতাগুলি সরু এবং সোজা হইয়া উঠে সেইগুলিই সাধারণতঃ দুর্ব্বল গাছ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। অপ্রচুর কর্ষণ, জল সরবরাহের অপ্রাচুর্য্য অথবা জমি অত্যধিক ক্ষারযুক্ত হইলেই এইরূপ দুর্ব্বল গাছ জন্মিয়া থাকে। উক্ত কারণ গুলি দূরীভূত হইলে বৃক্ষও বেশ সতেজ হইবে।

ফসল পাকিবার ও কাটিবার সময়।

গ্রীষ্মের ফসলই প্রধান ফসল। এই সময়কার ফল অতি সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত হয়। জাহাজে চালান দিতে হইলে সম্পূর্ণ পাকিবার পূর্ব্বে রং ধরিলেই আনারস কাটিয়া লওয়া উচিত। স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করিতে হইলে আরও একটু বেশী পাকিলেই কাটা উচিত তবে দেখিতে হইবে যে অত্যধিক পাকিয়া আনারসের ভিতরটা যেন পচিয়া না যায় এবং ফল যেন টক না হইয়া পড়ে। আপেল প্রভৃতির ন্যায় আনারস কাটিয়া লইবার পর অধিক মিষ্ট হইবার সুযোগ পায় না কারণ ইহার গাছের মধ্যেই চিনি থাকে; ফল তুলিয়া লইলে আর মিষ্টত্ব জন্মাইতে পারে না।

সবুজ অবস্থায় কাটিয়া জাহাজ বোঝাই করিলে কিছু দিন পরে আনারসের রং আরও খোলে বটে তবে মিষ্টত্ব শতকরা পাঁচ কি ছয় ভাগ থাকে মাত্র। খাইবার উপযুক্ত করিয়া পাকিবার সময় দিলে মিষ্টত্ব এবং সুগন্ধ যথেষ্ট বাড়িয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে যে অল্প পক্ক ফলের মিষ্টত্ব কাটিবার পর মোটেই বৃদ্ধি পায় না যদিও ইহার বর্ণ সুপক্ক ফলের মতই প্রায় হইয়া থাকে। রংয়ের তুলনায় উভয় প্রকার ফলই সমান হইতে পারে তবে মিষ্টত্ব সুপক্ক ফলেই তুলনায় নিশ্চয়ই বেশী থাকে। যদি জাহাজে ফল ঠাণ্ডা রাখিবার বন্দোবস্ত ভাল করা হয় তবে অধিকতর সুপক্ক ফল চালান দিয়া দূরদেশে পাঠাইলে সে স্থানের লোকেরা গাছ-পাকা ফলের সুন্দর আস্বাদ পাইতে পারে। চালান দিতে হইলে ফলগুলিকে ২।১ ইঞ্চি নিম্নে কাটিতে হয়।

ফলন।

জমি, জলহাওয়া, চাষ এবং পোকা ও রোগবিহীনতার উপরেই আনারসের ফলন নির্ভর করে। প্রথমে একটী গাছে একটী ফলই হইয়া থাকে। কতকগুলি গাছে ফল হয় না। এই সমস্ত গাছগুলি তুলিয়া ফেলা উচিত। সাধারণতঃ প্রতি তিন বিঘা জমিতে পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে চারা লাগাইলে সাড়ে চারি হাজার হইতে পাচ হাজার ফল জন্মিতে পারে। সিঙ্গাপুরী নিয়মে ৩০০০, ফ্লোরিডার নিয়মে ৬০০০ বা ততোধিক ফল প্রথম ফলনেই হয়। পরে ফসলের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইতে পারে। প্রত্যেক আনারসই যে বিক্রীত হইতে পারে এমন নহে। কারণ অনেক ফল রৌদ্রে শুকাইয়া যায় এবং ইঁদুর প্রভৃতিতেও নষ্ট করিয়া দেয়।

সিঙ্গাপুরে প্রতি একরে ৬ হইতে ১২ টন, হাউইয়ে ৮ হইতে ২০ টন বা ততোধিক, ফ্লোরিডাতেও প্রায় ঐ পরিমাণে এবং ফিজিদ্বীপে সার না দিয়া পুরাতন প্রথায় চাষ করিয়াও এক একরে (৩ বিঘায়) প্রায় ৭ হইতে ১৪ টন ফল পাওয়া যায়। ফিজিদ্বীপে সার ব্যবহার না করিয়াও একই জমিতে ৩।৪ বার ফসল পাওয়া যায়। সার সংযোগে আধুনিক প্রণালীতে চাষ করিলে নিশ্চয়ই অধিকবার ফসল পাওয়া যাইতে পারে। চারা কিনিয়া আবাদ করিতে না হইলে গৃহে চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিলে খরচ অনেক কম লাগে। তবে ২।৩ বছর বাদ ভাল চারা নূতন করিয়া লাগাইলে উত্তম ফল অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে।

Tropical Agriculturist.

কাজের কথা।

পাথরীর মহৌষধ—

কুলথ কলাই ভিজাইয়া প্রত্যহ প্রাতে তাহার জল (যাহাকে ছোট নাগপুর অঞ্চলে কুল্‌তি বা কুর্‌তির ডাইল বলে) খাইলে দুরারোগ্য পাথরী রোগ সারিয়া যায়।

তুলসীর গুণ—

প্রত্যহ ৩টী করিয়া তুলসী ও ৩টী গোলমরিচ চিবাইয়া খাইলে অগ্নিমান্দ্য, অম্ল, ম্যালেরিয়া, প্রভৃতি রোগ সারে ও অরুচি দোষ কাটিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

তুলসীগাছের শিকড় পানের সহিত ৩।৪ বার করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে রক্তামাশয় সারে।

আমিষ ও নিরামিষ ভোজন—

অধ্যাপক বেরণ কিউভার প্রচার করিয়াছেন, মানব শরীরের গঠনপ্রণালী যেরূপ, তাহাতে ফলমূলাহারের উপযোগিতাই মানবমাত্রে পরিলক্ষিত হয়। ডাক্তার জোসিয়া লেড্ ফিল্ড জীবনব্যাপী অনুধাবনের পর বলিয়াছেন যে, মানবেরা মাংসাশী জীব নহে, পরন্তু ফলমূলভোজীজীব শতকরা ৯৯ জন একমাত্র মাংস ভক্ষণের জন্য নানাবিধ কঠিন রোগে ভুগিয়া থাকে। কর্কট রোগ, ক্ষয় রোগ, দূষিত জ্বর, দদ্রু, কুষ্ঠ প্রভৃতি আমিষাশীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ডাক্তার হেগ বলিয়াছেন, অর্দ্ধ সের গো-মাংসে ১৪ গ্রেণ ও অর্দ্ধ সের যকৃতে ১৯ গ্রেণ ইউরিক এসিড পাওয়া যায়। এই ইউরিক্ হইতেই বায়ুরোগ, বাতব্যাধি, হাঁপানি, যকৃতের দোষ, বহুমূত্র প্রভৃতি হয়। অধ্যাপক রবার্ট পার্ক্স বলিয়াছেন, মাংসে এমন এক প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য আছে, যাহা ধীরে ধীরে শরীরে সঞ্চিত হইয়া উহাকে নষ্ট করিয়া দেয়।

—বসুমতী।

পেটের পীড়া ও বদ্‌হজম—

অধিক, অশুদ্ধ অনিয়মিত আহারের ফলে বুক জ্বালা, উদ্গার প্রভৃতি রোগ হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে আহার বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

পেটের পীড়া বদ্‌হজমে নিম্নের নিয়ম পালন করিবে—

(১) আহারের সময় বা আহারের অব্যবহিত পরে জল পান করিও না।

(২) যথোপযুক্ত বিশ্রাম লাভ না করিয়া কিছুই খাইবে না।

(৩) রোজ দুই বেলা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবে।

(৪) সকালে লবণ আদা ও আহারান্তে হরিতকী যোয়ান খাইলে অম্ল, উদ্গার প্রভৃতি নিবারিত হয়।

(৫) বৈকালে সামান্য পরিমাণ ছানা, চিনি সহ খাইলে ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া দাস্ত রোগ সারে ও আহারের অব্যবহিত পরেই জলের পরিবর্ত্তে গরম দুধ এক পোয়া খাইলে দীর্ঘ দিনের পেটের অসুখ নিবারিত হয়। অসুখ বাড়িল বলিয়া দুধ খাওয়া বন্ধ করিবে না। দাস্ত অল্প বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াই কমিতে থাকিবে।

(৬) পেটের যে কোন গোলমালে দধি বা মাঠা মাখা ভাত খাওয়া ভাল। অত্যধিক দাস্তে উপবাস দিবে।

) আম	খাইয়া	অজীর্ণ হইলে		দুধ	খাইলে	সারে
কাঁঠাল	„	„	„	কলা	„	„
নারিকেল	„	„	„	চাউল	„	„
কলা	„	„	„	সৈন্ধবলবণ	„	„
দুধ	„	„	„	মাঠাঘোল	„	„
দধি	„	„	„	লবণ	„	„
ঘৃত	„	„	„	গোঁড়ালেবু	„	„
পিঠা	„	„	„	গরম জল	„	„
মাছ	„	„	„	কাঁজি	„	„
কলাইডাল	„	„	„	চিনি	„	„
জল	„	„	„	মধু	„	„

সাধারণ অজীর্ণ অল্প মাত্রায় যবক্ষার সেবনে আরোগ্য হয়।

রৌদ্র-চিকিৎসা—

শিশুকে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে তাহার শরীর মধ্যস্থ জীবাণু নষ্ট করিবার প্রথা চিরদিন হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক বহুদিন হইতে ভারতের এই প্রথার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিয়া সূর্য্য কিরণে রোগ-নিরাময়ের ক্ষমতা আছে এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ডাক্তার এ, রোলিয়ার নামক সুইজার্লাণ্ডবাসী জনৈক বিশেষজ্ঞ সুইজার্লাণ্ডের সেইসিন প্রদেশে সুউচ্চ আল্‌পস্ পর্ব্বতের উপর একটী রৌদ্র-চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং এই চিকিৎসা দ্বারা অনেক কঠিন কঠিন রোগ যথা (Consumption), ক্ষয় (pthisis) কর্কট রোগ (cancer), অজীর্ণতা (Dyspepsia) প্রভৃতি আরোগ্য করিতেছেন। এ চিকিৎসার গোপনীয় তথ্য বিশেষ কিছুই নাই। কেবল রোগীর সহ্য করিবার ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া তাহাকে রৌদ্রে চিৎ ও উপুর করিয়া শোয়াইয়া রাখা, রৌদ্রে ভ্রমণ করিতে দেওয়া, রৌদ্রে খেলা ধূলা করা ইত্যাদি।

—কংসবণিক পত্রিকা।

ফলের বাগান।

আজ জগতের প্রায় সর্ব্বজাতিই কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে—আমরাই কেবল দিন দিন জীবন-সংগ্রামে সকলের নিকট পরাস্ত হইতেছি। দেখিতে দেখিতে আমাদের সকল শিল্প, বাণিজ্য, এমন কি, কৃষি অবধি বিদেশী আজ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাই আমাদের দুর্দ্দশার সীমা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। এই সে দিনের কথা অষ্ট্রেলীয়া একটী মরুভূমি মাত্র ছিল। সেখানে ইংলণ্ডের গুরুতর অপরাধীদের নির্ব্বাসিত করা হইত—সেই অষ্ট্রেলীয়া আজ জগতসমাজে নিজ কর্ম্মশক্তির বলে ফলের কাজে, পশম শিল্পে দেশের এক হইয়া উঠিয়াছে আর আমরা, কথায় কথায় আর্য্য সভ্যতার দোহাই দিই, কিন্তু কার্য্যের সময় নিজেদের শক্তি একেবারেই প্রয়োগ করি না; পরের দাসত্ব করিয়া জীবন যপেন করাই এখন আমাদের বড়ই প্রিয় হইয়াছে—দাসত্ব করিয়া আমাদের কর্ম্মশক্তি ক্রমেই লোপ পাইতে বসিয়াছে। জানি না, ভবিষ্যতে আমাদের দুর্দ্দশা আরও কত ভীষণ হইবে—তাই ভাবিবার সময় আসিয়াছে কিরূপে আজ এই বিপদ হইতে জাতিকে রক্ষা করা যায়। যদি এখনও আমরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে জাতিকে বাঁচাইতে চেষ্টা করি তবে নিশ্চয়ই আমরা সফল হইব।

বিদেশী আমাদের বহুমূল্য যাহা ছিল সবই বিদেশে চালান দিয়াছে কিন্তু একটী দ্রব্য সে পারে নাই এবং কখনও পারিবে না, সেটী—আমাদের দেশের মাটি—তাই আজ আবার আমাদিগকে মাটির দিকে নজর ফিরাইতে হইবে।

মাটিকেই ভিত্তি করিয়া জাতির অন্ন কর্ম্ম প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। এ শুধু আমাদের কথা নহে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটন যখন স্বাধীন আমেরিকার প্রথম উদ্বোধন করেন—সেই সময় তাঁহার অভিভাষণে বলেন, "Where Agriculture leads all other arts follow" যে দেশে কৃষি প্রধানস্থান লাভ করিয়াছে সে দেশে অন্যান্য শিল্পেরও উন্নতি অবশ্য সম্ভব। একদিন ছিল, যখন আমরা কর্ত্তাদের কথায় শুধু শিল্পের দিকেই মনোযোগ দিয়াছিলাম, ফলে হইয়াছে আজ যদি, Protec-

tion বা সংরক্ষনীতি দেশে না স্থাপিত হয় তবে আমাদের সকল যন্ত্র শিল্পই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

জার্ম্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি যে সকল জাতি আজ যন্ত্র শিল্পে জগতের শীর্ষ স্থান লাভ করিয়াছে তাহারা প্রথমে কৃষির উন্নতি সাধন করিয়াছিল পরে সেই কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া বিদেশ হইতে বহু অর্থ লাভ করে—সেই অর্থবলে ক্রমে দেশে তাহারা ধীরে ধীরে. এক একটী শিল্পের প্রতিষ্ঠা করে। আমাদেরও তাহাই করিতে হইবে। আজ তাই ইংলণ্ডেও Lyod George যাহাতে কৃষকেরা আবাদী জমি অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমরা সকলেই অল্প বিস্তর ভূমির অধিকারী এবং সকলেই সেই জমিতে কোন না কোনরূপ কৃষিকার্য্য করি।

সাধারণতঃ চারি রকম চাষ দেখা যায়—ফসলের চাষ মাঠে হয়। সেখানে সাধারণতঃ ধান, পাট, আক, ছোলাই বেশী হয়, এ চাষ বিস্তৃত জমি লইয়া হয়—দশ বিঘার কম কোনই লাভই হয় না। সব্জী চাষ বাগানে হয়, কেহ বা সখ করিয়া নিজের জন্য, কেহ বা বাজারে তরকারী চালান দিবার জন্য বিস্তৃতভাবে করেন—সাধারণতঃ লোকে তুই তিন বিঘা জমি লইয়া এই কার্য্য করে।

ফুলের চাষ লোকে সখের খাতিরেই বেশী করেন; আজ কাল চালানের জন্যও কেহ কেহ দেওঘর অঞ্চলে করিতেছেন, একাযে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকিলে ভয়ানক ঠকিতে হয়।

ফলের চাষ—এটা সকলেই করিয়া থাকেন—আনাচে কানাচে যার জায়গা আছে তিনিই করেন। আর আজ কাল আমরা যে রকম অলস হইয়া পড়িয়াছি তাতে এই চাষই আমাদের পোষায়। গাছগুলিকে প্রথম মুখে একটু মনোযোগ দিই, বড় হইলে আর কিছুই করি না, তারাও কিছু কিছু ফল দেয়, আর আমরাও তাতেই সন্তুষ্ট থাকি, আর এতে ক্ষতির কোন আশঙ্কা নাই। সর্ব্বদা সেখানে গাছগুলি দেখিবার জন্য থাকিতে হয় না, এটাতেই লাভ কারণ আমরা সহরবাসী হইয়াছি—তাই ফলের চাষে এখনও ভদ্রলোকের হাতে কিছু রেস্ত আছে। আমরা ফল বড় ভালবাসি। দোকানে সুপক্ক ফল দেখিলেই আমাদের সেই ছায়া বাগান, কলমের গাছ কতই না মধুর স্মৃতি মনের মধ্যে আসিয়া পড়ে। ফল খাইলে স্বাস্থ্যও ভাল হয়। এই যে আমরা প্রায় রোগ ভোগ করি তাহার কারণ আমরা সহরে একেবারে ফল খাইতে পাই না। ফলে আমাদের শরীর গঠন করিবার সকল দ্রব্যই বর্ত্তমান তাই উহা আমাদের পক্ষে এত উপকারী। হিন্দুস্থানীদের শরীর কেমন সবল, তাহারা কলিকাতায় যত ফল খায়, বোধ হয় অন্য কোন দেশবাসী এত ফল খায়না—আজ সুদুর America ও এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছে, তাই সেইখানে এখন এক বিরাট আন্দোলন চলিতেছে—"Eat more fruits" এবং এই সঙ্গে Americaয় ফলের চাষের আয়োজনও খুব হইতেছে। আমরাই কি শুধু নীরব হইয়া থাকিব? আমাদের দেশে যত প্রকারের ফল পাওয়া যায় পৃথিবীতে কোন দেশে সেরূপ পাওয়া যায় না। তাই এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দিতে হইবে। আর এবিষয়ে মনোযোগ দিলে আমাদের বাগানের দিকে নজর পড়িবে। এখন ফলের বাগানের কি ভীষণ অবস্থা হইয়াছে!

এই চাষের উন্নতি করিতে পারিলে বিদেশে চালানী কাজও চলিতে পারে, আর দেশেও চাটনী মোরব্বা প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ারীর কারখানাও স্থাপিত হইতে পারে, সেই জন্য এই চাষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

বাগানগুলি জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে; দিবালোকে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারা যায় না—সেগুলি যত সর্প, কীট ও মশকের কারখানায় পরিণত হইয়াছে। গ্রামের যত রোগ তাহার খনি এই বাগানগুলি—এই বাগানগুলি আগেকার মত "পাট" করিয়া লইলে ফল খুব হইবে। সকল প্রকার পোকার ধ্বংস হইবে—রোগ চলিয়া যাইবে এবং অগ্রগমের সূচনা দেখিলে আমরা আবার গ্রামমুখী হইব। তখন আবার চণ্ডীতলায় মজলিস্ বসিবে—বারোয়ারি তলায় মায়ের পূজার ঢাক বাজিবে—গ্রামের সেই পুরাণ শ্রী আবার ফিরিয়া আসিবে। —ক্রমশঃ।

দুরাশা।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

পল্লী-মায়ের বুকের দুলাল
সবার পিছে সভার নীচে
রইল যদি,—মা'র আবাহন
সত্যি মিছে, সত্যি মিছে।
—ফুলের বোঝা—ভূতের বোঝা,
মিথ্যা-গড়া সিংহাসন ও
এই অপমান ছেলের দিয়ে
মায়ের পূজা হয় না কোনো।
দেবীর আশায় গড়্‌লে তুমি
মন্দির যে অভ্রভেদী,
মৃণ্ময়ী অই মূর্ত্তিখানি
যত্ন-করা রত্ন বেদী ;
সব আয়োজন হচ্ছে বটে—
প্রাণ দেবে যে কই সে মানুষ ?
তোমার আমার কর্ম্ম তা নয়
—হাওয়ায় ভরা আমরা ফানুষ।
যাদের বুকের দুখের ডাকে
মৃণ্ময়ীতে আনবে সাড়া
পল্লী-মায়ের আঁচল তলে
সবার পিছে অই যে তারা,
যাদের কাছে আপ্‌নি মাতা
দে'ছেন ধরা বনের ছায়ে
ভাব্‌ছি তারা তুচ্ছ "চাষা" ;
আমরা ডেকে আন্‌ৃখো মায়ে!

ধানের আবাদ।

শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল

শস্যজাতীয় খাদ্যের মধ্যে ধানই জগতে সর্ব্বপ্রধান। গম ভুট্টা প্রভৃতি অপেক্ষা ধান অধিকতর পরিমান জমিতে চাষ হইয়া থাকে। আমেরিকার বহু জনাকীর্ণ স্থান সমুহে চাউলের ব্যবহার কম বলিয়া ইহা প্রচলন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। দরিদ্র সম্প্রদায়কে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে চাউল অন্যান্য সমজাতীয় খাদ্য অপেক্ষা অল্প মুল্যে পাওয়া যাইতে পারে অথচ ইহা সহজপাচ্য এবং শক্তি দানেও ঐ জাতীয় অন্যান্য আহার্য্য অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। আশা করা যায় যে অদুর ভবিষ্যতে সমগ্র জগতে চাউলের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পাইবে। সেই সময় ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধান্যচাষের কেন্দ্র আমাদের বাংলা দেশ যেন ধানের চাষের অবহেলা করিয়া পিছনে পড়িয়া না থাকে সে বিষয়ে আমাদের এখন হইতেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এবং ইহাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যদিও ধান ইষ্ট ইণ্ডিস এবং অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপের স্থানীয় শস্য তথাপি এই কথা সত্য যে পৃথিবীর সমস্ত গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই ইহার চাষ আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভারতে প্রায় ৮১৪৬১০০ একর ভুমিতে

ইহার চাষ হইয়া থাকে। কোন প্রদেশে কত জমিতে ধানের আবাদ করা হইয়া থাকে নিম্নে তাহা দেওয়া হইল :—

বঙ্গদেশ	২০৯৬৭০০০
বিহার ও উড়িষ্যা	১৫৯০৩০০০
মাদ্রাস	১২২০১০০০
ব্রহ্মদেশ	১০৪১২০০০
যুক্তপ্রদেশ	৬৭৯০০০০
আসাম	৪৫০৫০০০

উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বঙ্গদেশেই অধিক জমিতে ধানের আবাদ হয়। যদি কৃষকগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলা যায় তবে এই ধানের ব্যবসায় বঙ্গদেশে আরও উন্নত করিয়া তুলিতে পারা যায়। পাট চাষে অধিক লাভের আশায় আমাদের কৃষকদিগের ধানের আবাদ প্রতি লক্ষ্য অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

ধান্য উৎপাদন কমিয়া যাওয়ায় অথচ আমাদের দেশ হইতে চাউলের রপ্তানী ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়ার ফলে আমাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে চাউল পাওয়া যায় না। সমগ্র ভারতের জন্য প্রায় তিন চারি কোটী টন এবং রপ্তানীর জন্য প্রায় ২ লক্ষ মন ধান্যের প্রয়োজন। দেশীয় কৃষকের আর্থিক অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত ব্যাপারটী হইতে সহজেই অনুমান করা যাইবে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে চাউলের মনকরা মূল্য ছিল পাঁচ টাকা বর্ত্তমানে উহা প্রায় ৮৷৷০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে! উপরন্তু লোকসংখ্যাও শতকরা প্রায় ১৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বর্দ্ধিত লোকসংখ্যার আহার্য্য যোগাড় করিতে হইলে অধিকতর ধান্য উৎপাদন অবশ্য কর্ত্তব্য। অপরপক্ষে কৃষকের বস্ত্রাদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম শতকরা প্রায় ২০০৲ টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। এস্থলে ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্রের হ্রাস করিতে হইলে আবাদী জমির পরিমান বৃদ্ধি করিয়া অধিকতর ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন।

বঙ্গদেশে পাটের চাষ বৃদ্ধি পাওয়ায় ধানের চাষের জন্য জমি, শ্রমিক এবং অর্থ এই তিনটী প্রয়োজনীয় জিনিষেরই অভাব হইয়া পড়িয়াছে। জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী কার্য্যের অভাব দূর করিতে হইলে অন্যান্য ফসল চাষ করিবার জমি হ্রাস না করিয়া ধান্যের চাষ এমন প্রণালীতে করিতে হইবে যাহাতে প্রতি বিঘায় অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ধান জন্মিয়া পাটের লাভের সহিত তুল্য হয়।

বঙ্গদেশে বহুবিধ ধান জন্মিয়া থাকে। তাহাদের তালিকা দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রায় অসম্ভব। ডাঃ ওয়াট্ কেবলমাত্র বঙ্গদেশেই প্রায় চারিহাজার বিভিন্ন রকমের ধান্য লক্ষ্য করিয়াছেন। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ আমন এবং আউশ ধান্যের মধ্যে কোন বিশিষ্টজাতি অধিকতর ফসল দেয় তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া আমন ধানের মধ্যে "ইন্দ্রসাইল" ও "দুধমার" ধানের ফলন সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক পাইয়াছেন। আউশ ধান্যের মধ্যে "কটক তারা" "সূর্য্যমুখি" এবং "চারনাক" ভাল জাতি—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ধানের মধ্যে যেগুলি বুনোজাতি তাহাদের গায়ে অনেক সময় শোঁয়া থাকে অবশ্য অনেকগুলি শোঁয়াশূন্যও হইয়া থাকে। ইহাদের অন্যান্য বিশেষত্বের মধ্যে অর্থনৈতিক দিক হইতে দেখিলে দেখা যায় যে কতগুলি ধান গাছ অনাবৃষ্টি সহিতে পারে এবং অপর কতকগুলি অতি বৃষ্টিতেও নষ্ট হয় না।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিতে গেলে "ধানকে" তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা চলে :—

১। Oryza Garnulata :—এই জাতীয় ধান্য সাধারণতঃ পাহাড়ি দেশে সমুদ্র হইতে ৩০০০ ফিট উচ্চ ভূমি—সিকিম, আসাম, বর্ম্মা, পরেশনাথ, রাজমহল মালাবার প্রভৃতি স্থানেই জন্মিয়া থাকে। ইহা প্রায় সমস্ত ঋতুতেই ফলদায়ী হয় এবং ইহার শিকড়গুলি অনেকটা শক্ত গাছের শিকড়ের মতই হইয়া থাকে। এই জাতীয় ধান্য এত সুমিষ্ট ও গন্ধযুক্ত হয় যে বালক বালিকারাও সেগুলি আহরণ এমন কি কাঁচা অবস্থায়ই খাইতে পর্য্যন্ত পছন্দ করিয়া থাকে। ইহার ভিতরকার দানাবাঁধা গঠন ইহার একান্ত বিশেষত্ব।

২। Oryza Offlcinalis :—ইহাও একপ্রকার বৃক্ষের মত শিকড়ওয়ালা ধান্য। ইহাদের কতগুলি লম্বা প্রয়োজনাতিরিক্ত শাখা থাকে। এই জাতীয় ধান O,

gramulata এবং O, Sativa নামক দুইটী প্রচলিত জাতির মধ্যবর্ত্তী।

৩। Oryza Sativa :-এই জাতিই সাধারণতঃ বাংলা, মাদ্রাস, উড়িষ্যা, আরাকান এবং কোচিন, চায়না প্রভৃতি জোলো নিম্নভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা দেশে বন্যজাতি ধান্যের মধ্যে উরি বা ঝাড়াধান সুপরিচিত। এই ধান হইতেই আউশ, আমন এবং রোপা ধানের অনেক প্রকার বিশিষ্ট জাতি জন্মিয়াছে। বন্য ধান আবাদী ধান অপেক্ষা অধিকতর কষ্টসহিষ্ণু। ইহা সাধারণত আপনা হইতে উপ্ত হইয়া এক জমি হইতে অন্য জমিতে ছড়াইয়া পড়ে। মাঝে মাঝে এই জাতীয় ধান আবাদী ধান্যকে মাঠ হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়া দেয়।

আউশ, আমন, বোরো এবং বেজ—এই চারি প্রকার ধানই সাধারণতঃ চাষ হইয়া থাকে। আউশ ধানই যদ্যপি মোটা হওয়ার দরুণ মধ্যবিত্তদের পক্ষে হজম করা শক্ত তথাপি সত্যসত্যই ইহাই আমাদের দরিদ্রের আহার্য্য। আউশ ধান উচ্চ জমিতে এবং নদীর বালুকাময় তীরে জন্মিয়া থাকে। আমন এবং বোরো ধানের অপেক্ষা আউশ ধানের গাছে কম জলের প্রয়োজন হয়। ইহা খুব অল্প সময়ের মধ্যে—প্রায় বর্ষাকালেই পাকিয়া থাকে। দুর্ভিক্ষের সময় জনসাধারণকে উপবাসের হাত হইতে রক্ষা করে এই আউস ধানই এবং সেই জন্যই ইহার আদর। ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যবহারের উপযুক্ত মধ্যপ্রদেশে এক প্রকার ভাল জাতির আউশ ধান হইতে উৎপাদিত হইয়াছে। শিবপুর কৃষিশালায় এই ধান গড়পড়তা প্রতি বিঘায় ৩।৪ মন করিয়া ফলন পাওয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান জেলায় একপ্রকার আউশ ধান জন্মে। ইহা আউশ এবং আমনের মধ্যবর্ত্তী গুণযুক্ত। বর্দ্ধমানী আউশ ধানের গাছে সাধারণ আউশ অপেক্ষা অধিকতর জলের প্রয়োজন হয়। অথচ ইহা আমন ধানের মত এক স্থান হইতে সরাইয়া অন্যস্থানে রোপণ করা চলিতে পারে।

বীজ

ধানের আবাদ করিতে হইলেই আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজ যেন ব্যবহার করা হয়। খারাপ বীজ ব্যবহার করিলে ধান মন্দ এবং পরিমাণেও অল্প হইবে অথচ চাষ ইত্যাদি বাবদে খরচ সমানই পড়িবে। ভাল বীজে ফল ভাল হওয়ার দরুণ খারাপ বীজ ব্যবহারের অপেক্ষা মূলতঃ খরচ কম লাগে। সাধারণতঃ শতকরা প্রায় ৯০টী ভাল বীজ হইতে অঙ্কুর হইতে পারে এমন কি অনেক বীজ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে তাহারা শতকরা ৯৯টী পর্য্যন্ত চারাও জন্মাইতে সক্ষম। বীজ ক্রয় করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে উহা কলে ছাটাই করিয়া বিক্রয় করিবার উপযুক্ত না বীজরূপে ব্যবহার করিবার উপযোগী।

নূতন ধান্যে জলকণা সচরাচর একটু বেশীই থাকে কাজেই এই অবস্থায় উহা গুদামজাত করিলে লোকসান হইবার সম্ভাবনা। বীজধান্য গুদামজাত কবিয়া বীজ করিবার পূর্ব্বে তাহার জলীয় অংশ পরীক্ষা করিয়া দেখা একান্ত উচিত। যদি তাহাদের মধ্যে সাধারণ জলীয় অংশ অপেক্ষা অধিক জল আছে দেখা যায় অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ জল থাকিলে উহা শুকাইয়া জলীয় ভাগ কমাইয়া লওয়া উচিত।

বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মিতে দুই হইতে ৭ দিন পর্য্যন্ত সময় লাগিয়া থাকে। বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় জমিতে আর্দ্রতার প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকগণ "Akemines" পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন শুষ্ক শস্য—তাহার ও জলের শতকরা ২৫ ভাগ জল টানিয়া লইতে পারে। এবং তাঁহাদের মতে জমিতে বীজ ভালরূপে অঙ্কুরিত হইবার জন্য অন্ততঃ সেই পরিমাণে জল প্রয়োজন। ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে জলের নীচে থাকিয়া অঙ্কুর উৎপাদন অপেক্ষা ভিজা অবস্থাতেই বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপাদন কার্য্য ভাল হইয়া থাকে। কাজেই লক্ষ্য রাখা উচিত যে জমিতে যেন তাহার জলধারণ শক্তির ৬০ হইতে ৯০ অংশ মাত্র জল থাকে। অঙ্কুরোদ্গম কার্য্যে আলোকের কোনও প্রভাব নাই। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ধানের পক্ষে অঙ্কুর গজাইবার কোনও বিশিষ্ট সময় নাই ধান সুপক্ক হইলে ইহা যে কোন সময়েই অঙ্কুরিত হইতে পারে।

শিলায়ন ধান এক বৎসরের পুরাতন এবং টাটকা অবস্থায় শতকরা ১০০ই অঙ্কুরিত হয়। দেখা গিয়াছে যে ফিলিপাইন দ্বীপে প্রতি বৎসরে ধানের জীবনী শক্তি শতকরা প্রায় পনের ভাগ বিনষ্ট হইয়া যায়। কালিফোর্ণিয়াতে বৎসরে শতকরা ১০ ভাগ মাত্র ক্ষয় হয়—এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের ভারতবর্ষে কৃষি বিভাগ এই ধারার পরীক্ষায় এতাবত মনোযোগ দেন নাই। আশা করা যায় যে তাঁহারা ভবিষ্যতে এই তথ্য সকল ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবেন।

আউশ ধান।

চাষ ঃ—এই ধান যে চাষীদের প্রধান আহার্য্যমাত্র তাহা নহে—ইহা জমিকে আগাছার হাত হইতে মুক্ত করিতে ও অদ্বিতীয়। ইহার সতেজ বৃদ্ধির এবং কষ্ট সহিষ্ণুতার জন্য ক্ষেত্রে উলুঘাস জন্মাইতে দেয় না এবং জন্মিলে ও নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। কেবলমাত্র ধেনো জমি কেনী ফলের বাগান প্রভৃতি যে সকল জমিতে ক্ষতিকর আগাছা জন্মায় সেই সব স্থানে আউশ ধানের চাষ করিলে জমির এই দোষ দূরীভূত হইয়া থাকে। আউশ ধানের ফলন ইহার জমিতে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী আবাদের উপর নির্ভর করে। কোন কোন স্থানে আউশ ধানের পর গম বার্লি প্রভৃতি শস্য সেই ক্ষেত্রে আবাদ করা হয় কিন্তু একটী শস্যের পর অন্য শস্যাদি বপন করা যুক্তিযুক্ত নহে। বর্দ্ধমানে আউশ ধানের জমিতে পরে আলুর চাষ করা হয়—এই প্রথা মন্দ নহে কিন্তু বৎসরের পর বৎসর এই প্রথার অনুমোদন করা যায় না। একটা নিয়ম করিয়া প্রতি বৎসর পর পর একই জমিতে এমন ভাবে এরূপ ফসলের চাষ করা উচিত যাহাতে প্রতি বিঘা হইতে খুব বেশী পরিমাণে শস্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফসল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। কোন ফসলের চাষের পর অন্য কোন ফসলের আবাদ করিলে ভাল হয় তাহা স্থির করিতে হইলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি পরিচ্ছন্নতা এবং ইহার স্থানের উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় ফসল প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যথা—প্রথম বৎসর আউশের ধানের পর Pulse দাইল চাষ করিয়া দ্বিতীয় বৎসর প্রথমে পাট অথবা Mestopat এবং পরে আলু অথবা তৈলবীজ চাষ করিলে ভাল হয়।

তৃতীয় বৎসরে আউশ এবং তাহার পরে ইক্ষুর চাষ মন্দ হয় না। চতুর্থ বৎসরে—ইক্ষু ও আউশ ধান। এইরূপ প্রণালীতে চাষ করিলে সকল ফসলেরই বৃদ্ধি হয় এবং দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফসল অপেক্ষা কৃত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

জমিতে হাল চালন।

রবি শস্য তুলিয়া লইবার পরই জমিতে লাঙ্গল দেওয়া কর্ত্তব্য। তবে জমিতে যদি চাষ দেওয়ার উপযুক্ত না হয় তাহা হইলে প্রথম বৃষ্টি হওয়া পর্য্যন্ত এই কাজ মুলতুবী রাখাও চলে। বৃষ্টি নামিবার পূর্ব্বে জমি শক্ত থাকায় অনেক সময় হল চালন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যায় না। প্রথম লাঙ্গল দিবার কার্য্য যত শীঘ্র সম্ভব আরম্ভ করা উচিত কারণ প্রথম ও দ্বিতীয়বার লাঙ্গল দিবার মধ্যবর্ত্তী সময় যত বেশী হইবে ফল ততই ভাল হইতে বাধ্য এবং ইহাতে বার বার হলচালনের সংখ্যাও কমাইয়া আনিবে। আউশের জন্য বার তিনেক লাঙ্গল ও মই দিলেই জমি বীজ বপন করিবার উপযুক্ত হইবে।

বীজ বপন।

বীজ সাধারণতঃ ছিড়াইয়া বপন করা হয়। অতঃপর মই অথবা একখণ্ড কাষ্ঠ দিয়া জমীকে চৌরস করিয়া দেওয়া হয়।

আউশ ধান—বিশেষতঃ যে সব আউশ বিলম্বে বপন করা হয়—সে গুলি আমন ধানের ন্যায় রোপন করা চলে। চারাগুলি নয় ইঞ্চি দূরে রোপন করা উচিত। এপ্রিলের মধ্য সময় হইতে মে মাসের প্রথম জোর বৃষ্টির পরই রোপা বসাইবার প্রশস্ত সময়।

বীজের পরিমাণ।

ছিটাইয়া বুনিবার জন্য বিঘা করা দশসের বীজ ধানের প্রয়োজন হইবে।

লাঙ্গলের পিছনে বুনিলে রোপন করিবার জন্যে ৩।৪ সের বীজের প্রয়োজন হয়। আউশ ধানের

চারা যখন প্রায় নয় ইঞ্চি দীর্ঘ হয় তখন জমিকে বিছা দেওয়া হইয়া থাকে। এই প্রথা অতি উত্তম কারণ ইহাতে বীজগুলি বেশ ভালরূপে উপ্ত হইতে পায়। এই কার্য্যে বীজের পরিমাণ ও কমে এবং সঙ্গে সঙ্গে আগাছা ও নষ্ট করিতে সাহায্য করে।

সাধারণত জল সেচনের প্রয়োজন নাই তবে বেশী রকম জলাভাব যখন উপনীত হয় তখন জলদানের ব্যবস্থা করিলে ফসল ভাল হইবার সম্ভাবনা।

শিবপুর কৃষিশালায় আউশের বীজধান মনোনয়ন কার্য্য অতি সুচারুরূপে করা হয়। সেখানে প্রথমে মধ্য প্রদেশের একপ্রকার বীজ এবং পেশোয়ারী "স্বতী" বীজের দ্বারাই পরীক্ষা আরম্ভ করা হয়। মধ্যদেশীয় বীজ ব্যবহারে বিঘা করা প্রায় সাতমন ফসল পাওয়া গিয়াছে। পেশোয়ারী বীজ ব্যবহারে ধান যদিও বেশ বড় এবং পুষ্ট হইয়াছিল তথাপি বিঘা করা ২।৩ মনের বেশী ফলন হয় নাই। ধান কাটিয়া লইবার পর আবার দ্বিতীয়বারে সেই গোড়া হইতে নূতন করিয়া গাছ জন্মায় এবং সেই গাছ হইতে অল্প শস্য পাওয়া গিয়াছিল তাহাই পরে বীজধান রূপে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় প্রস্থ শস্য বীজরূপে ব্যবহার করায় ফল অতি চমৎকার হইয়াছিল। এই বীজ ব্যবহারে অনাবৃষ্টিতেও ফসল পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু অন্য বীজে হয় নাই।

মধ্যদেশীয় আউশে নিম্নলিখিত মত ফল পাওয়া গিয়াছে—

১৯০২ খৃষ্টাব্দে—(বিঘা করা ৬মন)
এবং দ্বিতীয় ফসল হইতে ফলন প্রায় ৭মন।

১৯০৩ „ (বিঘাকরা প্রায় তিনমন)
„ (বিঘাকরা পৌনে চারমন)

১৯০৪ „ (বিঘাকরা ৬৷৹ মন)
„ (বিঘাকরা ৮৷৹ মন)

১৯০২ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ারী "স্বতী" ধান্য প্রথমবার জলের অভাবে হয় নাই দ্বিতীয় প্রস্থে বিঘাকরা পাঁচ মণ ফসল হইয়াছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম চাষে বিঘাকরা ৬।০ মণ এবং দ্বিতীয় বারে ৬৷৹ মণ ফসল পাওয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় প্রস্থ শস্যে সব জায়গাতেই অধিকতর ফসল পাওয়া গিয়াছে কাজেই এইদিকে অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন দ্বিতীয় প্রস্থে ফসল যে অধিক জন্মে তাহার কারণ বোধ হয় এই যে প্রথম বারের ধানের ফলাংশ ফুল ফুটিবার সময় শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিতে ধৌত হইয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বারের ফসলে এরূপ হইতে পারে না।

দ্বিতীয় ফসল পাকিতে প্রায় মাসাধিক কাল সময় হয়। কৃষকদিগের আরও দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন বীজের সহিত বুনোধান অথবা ঘাসের বীজ না থাকে। এই বাবদে প্রথমে কিছু বেশী খরচ করিলে পরে আগাছা নিড়াইবার খরচ অনেক কমিয়া যাইবে ফলে ফসলের উৎপাদনের খরচও কম পড়িবে ও ফসলের মূল্যও অপেক্ষাকৃত বেশী পাওয়া যাইবে।

সার ব্যবহার

ধানের সার ব্যবহার ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ফসলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি ধান চাষের পূর্ব্বে সেই জমিতে ইক্ষু, আলু প্রভৃতি যে সব ফসলে অধিক সারের প্রয়োজন হয় সেই প্রকার ফসল চাষ করা হইয়া থাকে তবে তাহারই বাড়তি সার যাহা জমিতে অবশিষ্ট থাকিয়া যায় তাহা ধানের চাষেও কতক পরিমাণে লাগিবে কিন্তু যদি সেই জমিতে গম প্রভৃতি বিনা সারে আবাদ হইয়া থাকে তবে ধানের জমির জন্য ভিন্ন প্রকারের সারের প্রয়োজন হইবে।

আউশ ধানের জমিতে পূর্ব্বে যদি ইক্ষু, আলু প্রভৃতির আবাদ হইয়া গিয়া থাকে তবে তাহাতে সার ব্যবহার না করিলেও চলে। যদি ঐরূপ ফসল না দেওয়া হইয়া থাকে তবে সাধারণতঃ পুকুরের মাটী, ছাই, খইল প্রভৃতি সার রূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক সময় জমির অথবা শস্যের প্রয়োজন সংকুলান হয় না। পুকুরের মাটী প্রতি তিন অথবা চারি বৎসরে প্রতি বিঘার জন্য একবারে ১০ হইতে ৩০ গাড়ী পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রতি বিঘাতে খইলও প্রায় একমন করিয়া প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সার প্রয়োগ করা হয় তবে এইরূপ সারের পরিবর্ত্তে

অনেক কম খরচে সার যোগান দেওয়া যাইতে পারে। অতএব আমন এবং আউশ উভয় ধানের জমর জন্য সার ব্যবহারের বিষয়ই একসঙ্গে আলোচনা করা হইবে অবশ্য বিশিষ্ট কোন স্থানে প্রয়োজনমত বিশেষরূপ সারের প্রয়োগ বিধি উল্লেখ করা থাকিবে। এই বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের জানা উচিৎ যে ধানগাছ জমি হইতে কোন কোন পদার্থ কত পরিমাণে আহরণ করে কারণ সেই অনুসন্ধানেরই উপর সার প্রয়োগ প্রথা নির্ভর করে।

বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করিয়া যেরূপ ফল পাইয়াছেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

লেখক	নাইট্রোজেন	ফসফরিক এসিড্	পটাশ
কেনিয়াস	০˙৯০৭	০˙৩৬৫	০˙৯৩৪
কেল্নুয়ার	০˙৭৫—০˙৯৮২	—০˙২১৪ ০˙২৫—০˙	২০৪-৭ ৫
ম্যাকলোনেল	০˙৪	—০˙৩৬৫	—১˙০৩৭

ধানের চারাতে মোটামুটি কতটা সারের প্রয়োজন তাহা উল্লিখিত তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

Herrero, Gill ও Carrero পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ধানগাছ বৃদ্ধির সময় বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পরিমাণে খাদ্য আহরণ করিয়া থাকে। Carrero সাহেব শেষ অবস্থায় ইহার আনুপাতিকঅল্পতার প্রাধান্য দেখাইয়া বলেন যে ধান গাছের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার ছাইএর মধ্যে পটাশ এবং ফসফরিক এসিড এবং সালফারের অভাব ঘটিয়া থাকে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধানগাছে সিলিকার অংশ বৃদ্ধি পায় এবং নাইট্রোজেন কমিয়া যায়। ফুল ফুটিবার সময় হইতে পরিপক্ক হইবার অবস্থা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে শেষ অবস্থায় অর্থাৎ পাকিয়া উঠিলে ধানের চারাতে পটাশ পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। জমিতে এই পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে আবশ্যক। ইহাও দেখা যায় যে বৃদ্ধির প্রথম অবস্থায় সাধারণ অথবা অম্লযুক্ত জমিরই প্রয়োজন হয় তারপর জমিতে ক্ষারযুক্ত হইলেও ধানের বিশেষ অনিষ্ট কোন হয় না। কিন্তু প্রথমে ক্ষারযুক্ত জমি ধানের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া থাকে। বীজ বপনের পূর্ব্বে জমিতে ফসফরাসযুক্ত সার ব্যবহার এই কারণেই সমীচীন। বৃদ্ধির বিভিন্ন সময়ে কিরূপ পৃথক সার ব্যবহার করা উচিত তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

	বীজ বপন সময় (Seed bed)	উদ্গম	ফুলধরা	ফলদেওয়ার সময়
নাইট্রোজেন	০˙৯৩	৭৪˙৯০	৪১.৫১	২২˙০০
ফস্ফরিক এসিড	১˙০১	৭৫˙৪০	৯৩˙১০	১০০
পটাশ	০˙৮১	৭৪˙৮৪	১০০˙০০	৪৮˙৬০
শুষ্কভার	৮৪˙২০	৭০˙৮০	৮৪˙০০	১০০.০

জাপানে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ম্যানগানীজ ব্যবহারে ফসল খুব ভাল হয়। মধ্য প্রদেশের বলাঘাট জিলার মাটিতেও প্রচুর পরিমাণে ম্যানগানীজ্ আছে বলিয়া ধানের অতি উত্তম ফলন পাওয়া যায়।

Coslell সাহেব এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে চারার পক্ষে নাইট্রোজেন অতি প্রয়োজনীয় আহার্য্য এবং ইহাতে গাছগুলি বেশ সতেজও হয়।

'King' এর অভিমতে চীন প্রদেশে সারের ব্যবহারের জোরেই এই চারি সহস্র বৎসর ধরিয়া ফসল পাওয়া যাইতেছে। সেখানে সহরের জঞ্জাল এবং বিষ্ঠা সাররূপে ব্যবহৃত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এই মুল্যবান সারের অপচয়ই হইয়া থাকে। জাপানের "Nagroka" দেখাইয়াছেন যে বায়ুর চলাচল অভাব ধানের জমিগুলিকে অম্লযুক্ত করিয়া তোলে। এই অম্লতার জন্য যেমন হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতির মধ্যে যে অতরল ফসফেট আছে তাহা বেশ কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

ইণ্ডোচায়নাতে ফসফরিক সার আবিষ্কৃত হইয়া অবধি সে দেশের প্রত্যেক চাষী এই সার ব্যবহার করিয়া থাকে এবং এই সারের দামও কমিয়া গিয়াছে ফলে জমিতে ব্যবহার করায় ফলনও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে হাড়ের গুড়ার ফসফেটু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভারতবর্ষ হইতে এই সার রপ্তানি হইয়া জাপান এবং জাভাতে সাররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য চালান হইয়া যায়। এই সার অতি সস্তায় এদেশে পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে ব্যবসায়ীর এবং কৃষকদিগেরও প্রচুর উপকার হয়। আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যে এই মূল্যবান সারের যেন সামান্য অংশও নষ্ট না হয়। ৪ নং ক্লাইভ রোর ইউইং কোম্পানি ব্যবসায়ী হইলেও এই সারের প্রচলন প্রচেষ্টা করিয়া এদেশের যথেষ্ট উপকার করিতেছেন এবং তাঁহাদের নিকট অনেক কম মূল্যে এই সার পাওয়া যায়। দেশের লোকেরা তাহাদের সহিত সহযোগীতা করিয়া এই হাড়ের সার যাহাতে ব্যবহৃত হয় তাহার চেষ্টা করিবেন।

ধানগাছের পক্ষে নাইট্রোজেনের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায় যে Nitric নাইট্রোজেন অপেক্ষা য়্যামোনিয়া যুক্ত নাইট্রোজেনই ধান গাছের পক্ষে অধিকতর উপকারী; অন্যান্য গাছ জমি হইতে যেভাবে নাইট্রোজেন আহরণ করিয়া থাকে ধানগাছ সেরূপভাবে করে না বলিয়াই ইহার বৃদ্ধির পক্ষে Nitric নাইট্রোজেন অপেক্ষা য়্যামোনিয়াযুক্ত নাইট্রোজেনের সমধিক প্রয়োজন হয়। বহুবার পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে যে ধানের চারার পরিপূর্ণতার পক্ষে নাইট্রোজেন এবং য়্যামোনিয়া এই উভয় পদার্থেরই প্রয়োজন হয়।

Espino অনেকগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে গাছের প্রথম অবস্থায় amide এবং amonia salt প্রয়োগে চারাগুলি বেশ সতেজ হইয়াছিল এবং ফসলও ভাল হইয়াছিল কিন্তু শেষ অবস্থায় নাইট্রেট প্রয়োগ করিলে গাছগুলি উত্তমরূপে বাড়িতে পারে এইরূপ দেখা গিয়াছে। "নাগাসোকা" দেখিয়াছেন যে উচ্চ ভূমিতে যে ধান জন্মে (আউস ধান) তাহাতে নিম্নভূমিজাত ধানগাছ অপেক্ষা অল্প পরিমাণে য়্যামোনিয়ার প্রয়োজন হয়। ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিলে ধানগাছের প্রয়োজনীয় পদার্থ সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যাইবে না বলিয়া Espino সাহেব অন্য উপায়ে (Solution Culture) পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে অতি ক্ষুদ্র ধানগাছও নাইট্রেট পদার্থ আহার্য্যরূপে না পাইলে কিছুতেই পূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। ইহা দেখা গিয়াছে যে ধানগাছ নাইট্রেট বিহীন কেবলমাত্র য়্যামোনিয়াযুক্ত জলে সেরূপ বৃদ্ধি পায় না যেরূপ উভয় পদার্থযুক্ত জলে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এমোনিয়া যুক্ত গাছের উপরিভাগ শুষ্ক হইয়া যায়। গাছের জীবনীশক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য সমস্ত সময়েই amonia প্রয়োজন হয় কি না ইহা তিনি পরীক্ষা করেন নাই।

Kelley সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে গাছে ফুল ধরিবার সময় হইতে তাহার শেষ সময় পর্য্যন্ত জমিতে নাইট্রেট্ প্রয়োগ করিয়া সবিশেষ উপকার হইয়াছে প্রথম অবস্থা হইতেই নাইট্রেট্ প্রয়োগের অনুপকারীতা প্রমাণ করিবার জন্য অনেক

মনস্তত্ত্বপূর্ণ কারণ দেখান হইয়াছে। অন্য দিকে ক্ষেত্রজ পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে যদি নাইট্রেট্ পরিমান মত ব্যবহৃত হয় তবে তাহাতে ভাল ফল দর্শে। বিভিন্ন পদার্থ ব্যবহারের পরিমান সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে প্রথমেই তাহাদের পরিমানের মধ্যে সমতা রাখিবার দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। কেবল পরিমাণদিকে লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা এই সমতার দিকে দৃষ্টি রাখা অতীব প্রয়োজন। এই জন্য বুঝিতে পারা যায় যে ধান গাছের জীবনী শক্তির জন্য ফসফেট্ এবং ম্যাগ্‌নেসিয়াম্ বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণ ক্ষেত্রে যে সব আউশ ধান জন্মান হয় তাহাতে নাইট্রেট্ অফ্ সোডা পদার্থ দিয়াই নাইট্রোজেনের প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। আমনের ক্ষেত্রে বীজ গর্ত্তেই (seed bed) নাইট্রেট অফ্ সোডা ব্যবহার করা উচিত। চারা রোপন করিবার পরে সালফেট্ অফ এমোনিয়, বা গোমূত্র সার দ্বারা নাইট্রোজেনের অভাব দূর করা বিধেয়। দ্বিতীয়বারে Sodium নাইট্রেট্ ব্যবহার করিলে ফল ভাল হইবে। চারাগুলি সপ্তাহকাল নাইট্রেট্ অফ্ সোডাযুক্ত জমিতে রাখিয়া ক্ষেত্র হইতে জল নির্গমের ব্যবস্থা করিবার পর নাইট্রেট্ অব্ সোডা ব্যবহার করা উচিত।

ষোল বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে প্রতি বিঘা জমিতে ৩৩ মণ গোবরের সার ব্যবহার করিলে যে ফল পাওয়া যায় তাহা মাত্র ১৬ মণ পাটকরা সার ব্যবহার করিলেও সেইরূপ ফলই পাওয়া গিয়া থাকে। স্থানান্তরে রোপন করিবার পূর্ব্বে ইহা লক্ষ্য করা উচিত যে চারাগুলি যথাসম্ভব সতেজ কি না কারণ চারা যত তেজীয়ান হইবে উহার সার সংগ্রহ শক্তি এবং ফলন শক্তিও ততই বৃদ্ধি পাইবে। আমন ধান যখন তিন চারি ইঞ্চি বড় হয় তখন স্থানান্তরে রোপনের পূর্ব্বে সেই জমিতে তিন চারিগুণ শুষ্ক মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া নাইট্রেট অব্ সোডা সার ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। বীজক্ষেত্রে (Seed bed) এ দিবার জন্য প্রতি বিঘাতে তিরিশ সের নাইট্রেট অব্ সোডার প্রয়োজন হইবে। পাট কাটিবার পর যে সকল জমিতে আবার ধান রোপন করা হইয়া থাকে সেই সকল জমিতে উক্ত প্রথা অনুসারে চারা উৎপাদন করিয়া রোপন করিলে সুফল ফলিবে।

ধান অনেক রকম পোকায় এবং রোগে নষ্ট হইয়া যায়। বঙ্গদেশে বোধ হয় উফ্রাতেই সমধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। স্যাঁতসেঁতে জমিতে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পোকা জন্মিয়া এই রোগ আমদানী করে। এই পোকাগুলি ধানগাছে অতি শীঘ্র শীঘ্র জন্মে এবং সত্বর সংখ্যায় বাড়িয়া উঠে। যে জমির ধানে এই রোগ জন্মে ফসল কাটিবার পর সেই খড়গুলি পুড়াইয়া ফেলিলে এই রোগ অনেকটা কমিয়া যাইবে।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের পরীক্ষা হইতে জানা যায় যে অধিক স্থলেই নাইট্রেট অব্ সোডা ব্যবহারে যথেষ্ট লাভ হইয়াছে। যদি প্রতি বিঘায় ১৬ মণ গোবরে যে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় তাহা গোবর সার রূপে ব্যবহার করিয়া এবং বাকী অংশ মিশ্রিত সাররূপে প্রয়োগ করা যায় তবে অনেক উত্তম ফসল পাওয়া যাইবে।

মান্দ্রাজে সবুজ সারের প্রচলন খুব বেশী দেখা যায়। জঙ্গল হইতে কৃষকেরা এই উদ্দেশ্যে সবুজ পত্র আহরণ করিয়া আনে। এবং অনেক সময় ইহার জন্য চাষীরা বহু দূর পর্য্যন্ত গিয়া থাকে। তাঞ্জর (Tangore) প্রভৃতি স্থানে এই সবুজ পাতা বাহির হইতে আহরণ করা বড়ই কঠিন। সেই জন্য আড়ুতুরাই সরকারী কৃষি শালায় সবুজ পাতার সহিত প্রতি একরে প্রায় ৪০০ শত পাইণ্ড নাইট্রেট্ অব সোডা ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। আড়ুতারাই কৃষিক্ষেত্রে ধানের জমিতে নাইট্রেট্ অফ্ সোডার ব্যবহার ও তাহার ফলাফল সম্বন্ধে মান্দ্রাসের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন :—"আড়ুতারাইতে যে সব পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে কেবল মাত্র সবুজপাতার ব্যবহারেই সুফল পাওয়া যায় নাই। নাইট্রেট্ ব্যবহারে কথঞ্চিৎ ফল হইয়াছিল। এই উভয় দ্রব্যের সম্মিলিত ব্যবহারে সুফল পাওয়া গিয়াছে। তাঞ্জোর প্রভৃতি যে সকল স্থানে সবুজ পত্র পাওয়া যায় না এবং যেখানে সবুজ সারের ব্যবহার এখন ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে সেই সব

জিলার জমিতে বিঘা প্রতি ১৫০ মন হিসাবে নাইট্রেট্ অফ্ সোডা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে প্রায় ৬০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন উদ্গত হয়।" লভ্যাংশ না কমাইয়া এত অধিক নাইট্রোজেনের ব্যবহার কমাইলে চলে কি না এবং তাহাতে লভ্যাংশ সমান রাখা যায় কি না এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে আমার মনে হয় অর্দ্ধেক পরিমাণেও নাইট্রেট্ অফ্ সোডা দিলে ফলের পরিমাণ প্রায় সমভাবেই থাকিবে।

দাক্ষিণাত্যের কৃষিবিভাগের ডিরেক্‌টর্ মহোদয় তাহার "Intensive Farming in India" নামক পুস্তকের ২৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"সুরাটে প্রতি একরে ১/৫ সের নাইট্রেট্ অফ্ সোডা ব্যবহার করিয়া তিন প্রকার (on three ports) ফল পাওয়া গিয়াছে :—

সার না দিয়া—১০০৯ পাউণ্ড—১৭১৪পাঃ—১৩২০পাঃ

সার ব্যবহারে ১৭৪১ „ ২৫৫৫ „ ১৫৮২ „

ইহাতেই নাইট্রেট্ অফ সোডার উপকারিতা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মাত্র চারি টাকা অধিক খরচে ১৭৲ লাভ হয়।

সমতল নিম্ন ভূমির ক্ষেত্রের পক্ষে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জৈবিক পদার্থের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। তবে যে সকল ক্ষেত্রে বানের জল আসে সেই ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে উক্ত পদার্থ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে জমির মাটি কনা জমাট বাঁধিয়া যায় ফলে রোপা বসাই বার কাদা করা কঠিন হইয়া পড়ে। এই প্রকার জমিতে চারা স্থানান্তরে রোপন করিলে তাহা শক্ত ও সোজা হইতে পারে না। বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা, নদীয়া প্রভৃতি জেলাতে বাংলার অন্যান্য জেলার তুলনায় বোধ হয় অধিক পরিমাণে জৈবিক সার (organic manure) ব্যবহৃত হয়। এই সকল জিলার চাষীরা অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাইবার জন্য সময় সময় জমিতে ক্ষারি নূন মিশ্রিত করিয়া ছিটাইয়া দেয়। ক্ষারি নূন এক প্রকার ক্ষার জাতীয় পদার্থ। ইহা সোডিয়াম কারবনেট্ এবং Sulphate এই দুইটি পদার্থ মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। জলজ আগাছা বিনষ্ট করিবার জন্য মাদ্রাজে এবং সাটলেজ নদীর তীরবর্ত্তী জমি সমূহে বাসুতী, তুণ এবং নীম গাছ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। জল যদি দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া উঠে তবে ধানের চারা রোপন করিবার পর সেই জল সরাইয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করা ভাল। Jecobin সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে তুলার ফল সারজাত নাইট্রোজেন, নাইট্রেট্ অফ্ সোডা অথবা amonium সালফেট্ হইতে তুলনায় সমধিক কার্য্যকরী, জীবাণুতত্ত্বের দিক হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে পরীক্ষার সময় অবস্থার তারতম্যের অনুসারে নাইট্রিক্ নাইট্রোজেনের পরিমানের অনুপাতে জমির নাইট্রোজেন ক্রমে কমিয়া যায় এবং য়্যামনিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যে সমস্ত জমিতে তুলার বীজ রূপে এবং য়্যামোনিয়ার সার দিয়া নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয় সেই সকল জমিতে নাইট্রেট্ অফ্ সোডা ব্যবহৃত জমি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন সঞ্জাত হয়।

সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ধান গাছের সার সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে মোটের উপর এই কথা বলা যাইতে পারে যে নাইট্রেট্ অফ্ সোডা এবং তুলাবীজ সার অথবা সলফেট্ অফ্ য়্যামোনিয়া মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ফল পাওয়া যাইতে পারে। ইহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে সকল ধানের জমিতে যবক্ষারজনিত সার পৃথক করিতে পারে এরূপ বীজাণু আছে সেইরূপ জমিতে যবক্ষারজনিত সার দিতে হইলে নাইট্রেট্ অফ্ সোডা ব্যবহার করা উচিত যদি স্বল্প দামে পাওয়া যায় তবে তুলার খৈলই সারই যবক্ষার পাইবার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। এই তুলাসার জমি হইতে সহজে ধৌত হইয়া যাইতে পারে না এবং আনবিক উপায়ে চারা গাছগুলি অতি সহজেই ইহা হইতে যবক্ষার আহরণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে পারে—উল্লিখিত বিষয় এবং ভারতে ও ভারতের বাহিরে অন্যান্য যে সমস্ত পরীক্ষা করা গিয়াছে তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে সর্ব্বগুণযুক্ত মিশ্রিত সার ব্যবহার করিলেই অত্যধিক ফসল পাওয়া যাইবে। অধিকন্তু এই কথাও স্বীকার্য্য যে ফসফরাস পদার্থ ধানের পক্ষে একটী অত্যাবশ্যকীয় উপা-

দান। এই জন্য আমি বিভিন্ন ধান্যের জন্য নিম্নলিখিত সারের ব্যবস্থা সমীচীন মনে করিতেছি:—

আমন ধানের জন্য।

গোবর	৫০/০ মন	প্রতি একর বা তিন বিঘার জন্য
হাড়ের গুড়া	৩/০ "	"
নাইট্রেট্ অফ্ সোডা	॥০	"
মলমূত্রযুক্ত (urine) মাটী অথবা	২/০ "	"
খইল	২/০ "	"
ম্যাগনিসিয়াম সালফেট্	॥০ "	"

জমি প্রস্তুত করিবার প্রথম অবস্থায় গোবর সার ব্যবহার করা উচিত। হাড়ের গুড়া, ম্যাগানসিয়াম এবং খইল জমি পাট করিবার শেষ ভাগেই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। চারাগাছের মস্তক নিড়ানের সময় (topdressing) গাছ জন্মিবার দিন দশেক পরে মূত্রাক্ত মাটীর সার (urine earth) ব্যবহার করা বিধেয়। ইহার দিন কুড়ি পরে নাইট্রেট অব্ সোডা প্রয়োগ করা উচিত। বুদ্ধিমান কৃষকেরা গোবর সার পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারে। যদি গোবর দুষ্প্রাপ্য হয় তবে তাহার পরিবর্ত্তে খইলও ব্যবহার করা চলে কারণ অনেক স্থানে সামান্য মূল্যে খইল পাওয়া যায়। যে ধান ছড়াইয়া বপন করিতে হয় তাহার জমিতে মূত্রাক্ত মাটী (urine earth) অথবা খইল ব্যবহারের পরিবর্ত্তে দ্বিগুণ পরিমাণে নাইট্রেট অফ্ সোডা মিশ্রিত করিয়া লইলে সেই সারও ফলদায়ী হইবে।

চাষার গান

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল)

(বাউল সুর)

ও ভাই আমরা করি চাষ
ও ভাই আমরা করি চাষ
এই হল নিয়ে আর গোধন নিয়ে
সুখেই করি বাস
মোরা সুখেই করি বাস।
সারা বেলা মাঠে মাঠে
রৌদ্রে জলে দিবস কাটে
অনেক দুখে ধরার বুকে
জাগাই অমল হাস
মোরা জাগাই অমল হাস॥

মোদের হলই পরম বল—
ওই হল আমাদের অন্ন যোগায়
পণ্য ও কম্বল।

সবুজ ধানে ক্ষেত্র ভরে
আনন্দেতে নেত্র ঝরে
সহজ সুখে দিবস কাটে
নই যে কারো দাস
মোরা নই যে কারো দাস॥

মুক্তি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

এইবার দ্বিতীয় অধ্যায়, এইখানে একজন ধনী লোকের কথা না বললে আমার জীবনেতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়, সেই কথাই সংক্ষেপে বলি—মেবারের কোন গ্রামে রাজপুত কুলে রাঠোর বংশে গনপত রাওয়ের জন্ম হয়; তিনি প্রথম জীবনে যেমন দুর্দান্ত ছিলেন তেমনি বলশালীও ছিলেন; অন্যান্য গুণ কিছু না থাকলেও শারীরিক শক্তিই তাঁকে জীবনে সুখ-সৌভাগ্যের পথে উন্নীত করেছিল। প্রথম যৌবনের ভোগ বিলাসকে তুচ্ছ ক'রে তিনি সরকার বাহাদুরের যুদ্ধ বিভাগে চাকরি নিয়ে দূর দেশে চলে যান; সেখানে বেশ সম্মানের সঙ্গে চাকরী করে, বহু ধন-সম্পত্তির অধীশ্বর হয়ে একশত টাকা পেন্‌শন নিয়ে এক রকম বৃদ্ধ বয়সে দেশে ফিরে আসেন। গ্রামে গিয়ে দেখলেন তাঁর বাপ মা অনেক দিন মারা গেছেন, অপনার বলতে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও কে কোথায় তার ঠিক ঠিকানা নেই; ছোট ছোট ছেলেরাই এখন মুরুব্বি হয়ে পড়েছে। এই সব দেখে শুনে, আর নানান সভ্য লোকের সঙ্গে মিশে, সহরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভেবে তিনি আর গ্রামে বাস করলেন না; আজমীরে এসে দেশী বিলাতী ধাঁজে একখানি বাড়ী করে বাস কর্ত্তে লাগলেন। যে বৎসর থেকে আজমীরে তাঁর বাস আরম্ভ হল সেইবার সরকার বাহাদুর তাঁকে রাও সাহেব উপাধি দিয়ে আপ্যায়িত করেন। বৃদ্ধের অগাধ ধন-সম্পত্তি, তার ওপর মাসিক ভাতা একশত টাকা; লোক-জন রেখেও খায় কে এমনি হয়ে গেল। পয়সা হলে যা হয় এ ক্ষেত্রে তাই দাঁড়িয়ে গেল; অনেক বন্ধু বান্ধব দেখা দিলেন, কত খোসামুদে যুটে গেলেন; আর তারা তাঁকে বলতে লাগলেন আপনার কি এমন বয়স, আপনি বিয়ে করুন; আমরা বয়স্থা সুন্দরী পাত্রীর অনুসন্ধান করে সব ঠিক করে দিচ্ছি। এই কথা নিয়ে আলোচনা হতে বুড়োর মন গেল টলে', তখন একটী আগতযৌবনা সুন্দরীর পানিগ্রহণ করে সংসারী হলেন, বেশ দু-পয়সা খরচ করে একটা ভোজ দিলেন; স্ত্রীর জন্যে দু-চারখানা গয়নাও গড়ান হল।

সংসারী হয়ে বুড়ো বেশ একটু সুখী হল। তার মনে হত সে যদি যৌবনের অতীত দিনগুলি নীরস যুদ্ধ ব্যবসায়ে না কাটিয়ে বিয়ে-থাওয়া করে সংসারি হতে পার্ত্ত, তা হলে এতদিনে সে ছেলে-মেয়ের বাবা হয়ে, স্ত্রীর ভালবাসা পেয়ে নিজেকে বেশ একটু ভোগ করে নিতে পার্ত্ত—তা দিন মজুরি করেই হোক, আর যে ভাবেই হোক। এত ধনদৌলতও তার কাছে কিছুই নয় যে; কিন্তু যা জীবনে হয় নি, তবু আজ এই জীবনের সন্ধ্যা বেলায় স্ত্রীর ভালবাসা পেয়ে আবার যৌবন আনন্দরসের বিকাশ হয়েছে। এও আমার পরম ভাগ্য যে এ বয়েসেও সে আমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। হবে না কেন? রাজপুতের মেয়ে সে, বীর আমি। তারা যে চিরদিনই সতীত্ব গরীমায় চিরোজ্জ্বল, মহিমায় গরীয়সী। এমনি কত কি সে সব ভাবত, আর নিজের সঙ্গে কত কার তুলনা করে করে দেখত। এমনি করে বছর খানেক কেটে যাওয়ার পর জর্ম্মাণ যুদ্ধ আরম্ভ হল', সব দেশে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। গ্রামে গ্রামে সরকার বাহাদুরের লোক এসে সৈন্য সংগ্রহ কর্ত্তে লাগলেন। এই সময় কথায় কথায় একদিন বুড়ো তার স্ত্রীকে বলেছিল যে এই যুদ্ধে হয়ত আমায় ডাকবে, আর না গেলে আমার পেন্‌শন বন্ধ করেও দেবে; এখন তাই ভাবছি, তোমাকে ছেড়ে কি করে যাব নিমকহারামি কর্ত্তে পার্ব্ব না। ডাকলে যেতেই হবে। সে বেশ ভাল ভাবেই জান্‌তো যে বুড়ো মানুষকে আর যুদ্ধের জন্যে কখনও ডাকবে না; তবু বলার কারণ স্ত্রীর কাছে তার বীরত্বের গরিমা প্রকাশ, আর তার বয়স যে খুব বেশী হয় নি এটাও কোন প্রকারে জানিয়ে দেওয়া। স্ত্রীটি তার একথা শুনে, পেন্‌শন বন্ধ হওয়ার

কথাই বেশী করে বলত যে তাহলে আমাদের বড় বিপদ ত। এই কথা নিয়ে দু-এক দিন আলোচনা হওয়ার পর এক দিন তার স্ত্রী বললে, "তুমি সরকার বাহাদুরকে আগে থেকেই একখানা চিঠি লিখে দাও যে আমি বুড়ো হয়েছি আর সে শক্তি নেই যে তোমাদের এই যুদ্ধে কোনরূপ সহায়তা করি; আমার এই অক্ষমতার দরুন বড় দুঃখের সঙ্গেই জানাচ্ছি, আমার শক্তি তোমাদের এ যুদ্ধে নিয়োজিত না হলেও ভগবানের ইচ্ছায় জয় হোক ইত্যাদি। এই প্রকারের লিখে দিলে তোমার পেন্‌শনও বন্ধ হবে না, যুদ্ধেও যেতে হবে না। স্ত্রীর এই কথায় বুড়ো খুব খুসী হল', আর বল্‌লে, "তোমার রূপের সঙ্গে যে এত বুদ্ধি, এ যদি আগে থেকে প্রকাশ হয়ে যেত তা'হলে তুমি কি আর আমার ঘর আলো কর্ত্তে? কোন্ রাজাধিরাজের হৃদয়েশ্বরী হয়ে শোভা পেতে। বেশ বলেছ আমি আজই কোন উকিল বাড়ী গিয়ে চিঠিখানা লিখিয়ে দিই।" বুড়ো সামান্যই লেখাপড়া জানত। স্ত্রী এই কথা শুনে বল্‌লো, "কেন মিছামিছি দশটা টাকা খরচ করে চিঠি লেখাবে। আমার গ্রাম সম্পর্কে এক ভাই সম্প্রতি এখানে চাক্‌রী কর্ত্তে এসেছে সে বেশ লেখাপড়া জানে। তাকে নেমন্তন্ন করে পাঠাও; এক-দিন খাওয়ান ত দরকার; সেই তোমায় লিখে দেবে, টাকা কটাও বেঁচে যাবে।" বুড়ো স্ত্রীর মতেই মত দিলে। তার পর দিন সেই লোকটিকে নিমন্ত্রণ করা হলো, সে এলে ঐ সমস্ত কথা বলে একখানা চিঠি লিখিয়ে নিলে কিন্তু সে লিখলে অন্যরূপ; লিখলে "আমি বুড়ো হলেও আমার এখনও যথেষ্ট শক্তি আছে; সরকারের এ যুদ্ধে আমি কোন প্রকারে সহায়তা কর্ত্তে পাল্লে নিজেকে ধন্য মনে কর্ব্ব। আবশ্যক হলে আমায় খবর দেবেন, আমি তখনই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হব" ইত্যাদি।

সরকার বাহাদুরের তখন খুবই লোকাভাব; যাকে তাকে ভর্ত্তি করে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিচ্ছেন তার আর বাচ-বিচার নেই। দেশে দেশে লোক নিযুক্ত করে মানুষকে ফুস্‌লে-ফাস্‌লে দলপুষ্টি কচ্ছেন। এই সময় এই চিঠি পেয়ে সরকার তার জবাবে লিখ্‌লেন, "তোমার এই সাহসিকতায় যথেষ্ট ধন্যবাদ। অমুক তারিখে যুদ্ধে যেতে হবে।" এই চিঠি পেয়ে বুড়ো ত চৌদ্দভুবন অন্ধকার দেখ্‌লে; মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌লো।

স্বামী স্ত্রীতে খুব খানিক প্রেমের কান্না কেঁদে নিলে, কি আর হবে! বুড়ো তার স্ত্রীকে বল্‌লে, "দেখ আমিত জন্মের মতই চললাম, আমার এই সমস্ত ধন সম্পদ রইল তোমার কোনই কষ্ট হবে না, বেশ ভাল ভাবেই কাটাতে পার্ব্বে। আমি সরকারের কাছে অনেক খেয়েছি এ বুড়ো বয়সে নিমকহারামি কর্ত্তে পার্ব্ব না। রাজপুতের ছেলে বুড়ো হলেও সে চিরদিনই বীর, মরণে কোন দিনই তার ভয় নেই; তবে তোমার জন্যেই মনটা এত কেঁদে কেঁদে উঠছে।" স্ত্রী অনেক করে বুড়োকে বল্‌লে "যে তুমি চলে গেলে আমি কি করে থাক্‌ব, আমার বুকে ছুরি মেরে তুমি চলে যাও; আমিও রাজপুতের মেয়ে মৃত্যুকে ফুলের মত আলিঙ্গন কর্ত্তে খুব পটু।" যাক নানান বাকবিতণ্ডার পর স্থির হল' স্ত্রী বাড়ীতেই ধন সম্পদ নিয়েই থাক্‌বেন, কর্ত্তা কোন প্রকারে শীঘ্রই ফিরে আসবেন।

বুড়ো ফ্রান্স চলে গেল, সেখানে ডাক্তাররা তাকে অক্ষম এই পরিচয় পত্র দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। বোম্বেতে ফিরে এসে সে স্ত্রীকে তার করে জানালে— "আমি এসেছি কোন ভাবনা নেই।" আর এইখানেই আমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়।

এইবার বুড়োর স্ত্রীর সম্বন্ধে একটু বলি,—সে কোন বনিয়াদি ঘরের খুব উচ্চ বংশের মেয়ে, অবস্থা বিপর্য্যয়ে তার বংশ মর্য্যাদায় তার বাপ মা যাকে তাকে ধরে দিতে পারেনি, এই কারণে অনেক বয়স পর্য্যন্ত সে অবিবাহিতই ছিল। বুড়োর অবস্থা ও বংশ মর্য্যাদা দুইই বেশ উঁচু দরের, এই জন্যই এখানে তার বিয়ে হয়; হলেও স্বামীকে সে একদিনও ভালবাস্‌তে পারেনি, যে টুকু সে ভালবাসা দেখিয়েছে সে কেবল সম্পূর্ণ অভিনয় করেছে; তার কারণ ছোট বয়েস থেকেই সে একজনকে বড় বেশী ভালবাসত, তাকে স্বামীরূপে লাভ করে জীবনে একটু সুখী হবে এই ছিল তার কামনা, কিন্তু বিধির বিধানে হয়েছিল অন্য প্রকার। এই বিয়ে হওয়ার পর সে তাকে একটুও ভুলতে পারেনি, বরং যৌবনের জ্বালা-

ময়ী শত লালসা নিয়ে তাকে আরও বেশী করেই জড়িয়ে ধরেছিল। সেও মেয়েটার জন্যে একেবারে পাগল; তারও ভালবাসা কম নয়, সর্ব্ব ত্যাগী হয়ে নিমিষের দেখার আশায় সেও এই আজমীরে এসে বাসা বেঁধেছিল সেই ছেলেটাই মেয়েটাকে চিঠি লেখবার পরামর্শ দেয়, পরে লেখকরূপে উল্টো লিখে বুড়োকে ফ্রান্স পাঠায়।

বুড়ো চলে যাওয়ার পর তাদের আর পায় কে! মেয়েটা তাকে নিজ বাড়ীতে কর্ম্মচারীরূপে রেখে দিয়ে বেশ আমোদেই দিন কাটাতে থাকে। এই সমস্ত ব্যাপার দেখে পাড়ার পাঁচজনে একটু কানাকানিও করে, কিন্তু বড় লোকের কথায় কে থাক্‌বে, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে একজন বিশিষ্ট লোকের স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিশেষতঃ চরিত্র সম্বন্ধে দু এক কথা বলে; সুতরাং তারা নির্ব্বিবাদেই দিন কাটাচ্ছিল। এমন সময় বুড়ো তার করে যে সে বোম্বে এসেছে। এই খবর পেয়েই তারা বিশেষ চঞ্চল হয়ে উঠল, তাদের সুখের সংসারে অকস্মাৎ আগুন লেগে এমন ভাবে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে এ তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তাদের আশা ছিল সে আর ফিরবে না, কিন্তু ভগবান তাকে অমর করে তাদের শাস্তি দেবার জন্যে মরণের পথ থেকে ফিরিয়ে আনলেন।

এখন নিরুপায় হয়ে এরা স্থির কল্লে যে সে এলে তাকে কোন প্রকারে জগৎ থেকে একেবারে সরিয়ে ফেলতে হবে। নানান পরামর্শ করেও কিছুই স্থির হয় না, অবশেষে স্থির হ'ল তাকে খুন করা ছাড়া আর উপায় নেই; আর এ কাজ তাদেরই কর্ত্তে হবে। তখন তারা প্রেমের উন্মাদনায় একেবারে মেতে উঠেছে কিনা; ছেলেটাই এ কাজের ভার নিলে।

এইবার বোম্বেতে একবার ফিরে আসা যাক, প্রথমে গুণ্ডার দলে মিশে নিজের ওপর একটা খুব ধিক্কার এসেছিল, কিন্তু এখানে এই কয়েক মাস থাকার পর সে ধারণা নষ্ট হয়ে গেল, মনে হত এদের কার্য্যে ব্যবহারে অন্যায় থাকলেও সেটা খুব অমানুষিক নয়; এরা গরীবের বুকে ছুরি মেরে তার যথা সর্ব্বস্ব লুটে নেয় না। যাদের অসদ্ ব্যয়ের হিসেব হয় না, যাদের সখের পয়সা, সখের জমাট নেশায় পয়সাগুলো ধুলোর মত উড়ে গিয়ে পৃথিবীর উজ্জ্বল আলোকে মলিন করে তোলে, যারা দীন দুঃখীর কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না; নিরন্ন ক্ষুধাতুরের কাতর ক্রন্দন যাদের বুকের ভেতরে মুহূর্ত্তেরও আন্দোলন তুলতে পারে না, তাদের বুকে ছুরি বসিয়ে টাকা কড়ি আত্মসাৎ করে। তারা মদ ভাং খেলেও সমস্ত পয়সাগুলো সেদিকে খরচ করা তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে। দরিদ্র নারায়ণের সেবা, ধর্ম্ম মন্দির নির্ম্মাণ কল্পে ব্যয়, গরীবের শিক্ষা, নিরাশ্রয় সকলহারার অন্ন বস্ত্রের সংস্থান, এ তাদের দৈনিক উপায়ের চার ভাগের তিন ভাগ। বাকি এক ভাগ নিজেদের ভরণ পোষণ। তখন মনে হত, যাদের পায়ে ধরে কেঁদে পুকুর করে দিলেও গরীবের দুঃখে একটা সহানুভূতির অনুভূতিও দেখতে পাওয়া যায় না, তাদের বুকের রক্তে হাতগুলো বেশ করে রঙিয়ে নেওয়া পাপ হলেও চরম পাপ নয়। এখন আবার সেই কথাই এই বার বছরের অভিজ্ঞতায় নূতন করে বুঝতে শিখেছি।

পূর্ব্বেই বলেছি বোম্বেতে গোয়েন্দা বিভাগেই আমার কাজ ছিল, নূতন আমদানী ধনী লোকের গতিবিধি লক্ষ্য রাখাই আমার ওপর ভার। এই কারণে করেন্সিতে আমার খুব যাতায়াত ছিল, একদিন ঐখানে আমরা দুজনে পরস্পর অপরিচিতভাবে আলাপ পরিচয় কচ্ছি, এমন সময় গণপত রাও এসে করেন্সি কোথায় এই কথাই জিজ্ঞাসা কর্‌লে; আমরা তাকে দেখিয়ে দিয়ে আত্মগোপন করে দেখতে লাগলাম যে কত টাকা নেয়; প্রায় হাজার দুয়েক টাকার চেক সে ভাঙ্গালে; এই সব দেখে আমাদের লোভ হয়ে গেল, আমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারি বললেন এখনি এর পিছু নাও, আবশ্যক হলে বুকে ছুরি মার্ত্তেও কুণ্ঠিত হবে না। সেও নেমে গাড়ী কল্লে আমিও গাড়ী নিয়ে তার পেছু পেছু যেতে লাগলাম। ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে এসে সে একখানা আজমীরের সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট কিনলে, আমিও ঐ টিকিট কিনে সামনের বার্থে বসে পড়লাম। সে বুড়ো হলেও তখনও তার দেহে দু-দুটো জোয়ানের শক্তি, হাতিয়ারও সঙ্গে; সুতরাং কোন প্রকার সুবিধা ভেবে পেলাম না, এখন ঘুমের অপেক্ষা ছাড়া আর উপায় কি! সমস্ত রাত সেও

ঘুমুলে না আমিও জেগে; যখন ভোর হয়ে এলো, আমিই তার সঙ্গে প্রথম কথা কয়ে অনেক খবর সংগ্রহ করে নিলাম, আর নিজেকে একজন আজমীর পর্য্যাটক বলে পরিচিত করে, আজমীরে আমরা নেমে পড়লাম। এখানে এসে একটা রাণ্ডির বাড়ী থাকি আর কখন সাধু সেজে কখন ফেরিওয়ালা হয়ে, কখনও বা চাকরভাবে চাকুরীর জন্যে বুড়োর বাড়ীর অলি-গলি দেখে আসি।

এই গুণ্ডাদের মধ্যে এমন একটা সুন্দর আত্মবিশ্বাস আছে যা আর কোথাও বড় একটা দেখতে পাইনি। আমিও এদের সহবাসে এসে সংক্রামণ গুণে সে গুণ একটু পেয়েছিলাম; এরা যা মনে করে তা কর্ব্বেই; তার বিরুদ্ধে অনেক অসুবিধার কথা উঠলেও সেটা যে সাধ্যাতীত এ তাদের ধারণার বাইরে। আমিও আজমীরে এসে বুড়োর টাকা আত্মসাৎ করার পক্ষে অনেক বিপদ আপদের কথা ভাবলেও সেটা যে পাব না এ কথা কোন দিন মনে হয়নি। এমনি এখানে এক সপ্তাহ কেটে গেল, একদিন অমাবশ্যার রাত্রে কাজ সিদ্ধি করে পালাব বলে মনস্থ কল্লাম; রাত্রি একটার পর নিজের যন্ত্রপাতী ছোরা ছুরি সব নিয়ে বুড়োর বাড়ীর খিরকির দরজায় এসে উপস্থিত; দেখি ভাগ্যক্রমে দরজা খোলা, বরাবর ওপরে উঠে গেলাম, এমনি সে দিন সিঁড়ির দরজাও খোলা, অবিশ্বাস করো না বন্ধু গুণ্ডাদের ভাগ্যটাই ঐরকমের। ওপরে উঠে বুড়োর ঘরের পাশে গিয়ে শুনি, দুজন লোক খুব আস্তে আস্তে কি পরামর্শ কচ্ছে; আমাকে আড়ালে থেকে সময়ের প্রতীক্ষা কর্ত্তে হ'ল। সে দুজন ঐ প্রেমিক প্রেমিকা; মেয়েটা বল্‌ছে বুড়ো এখন মরার মত ঘুমুচ্ছে, ওরই তলোয়ার দিয়ে শেষ করে চলে যাও, তারপর—আমি খুন খুন বলে চেঁচাব, আর যা কিছু কর্ব্বার সে আমিই করে নেব। এই বলে দুজনে ছোট খাট কথায় ঐ ভাবের অনেক্ষণ আদান প্রদান হ'ল; তারপর আলো বাড়ীয়ে তলোয়ার খানা নিলে, স্থানও ঠিক হয়ে গেল। নূতন খুনি হতে চলেছে কিনা, তখন তার হাত পা বেশ কাঁপছে; বুক তার ধড়াস্ ধড়াস কচ্ছে; এ আমি আড়াল থেকে সব দেখতে পাচ্ছি। যখন কোপ ওঁচালে, তখন আমার প্রাণের ওপর কোথা থেকে কি রকম একটা প্রেরণা এসে গেল, মুহূর্ত্তেরও কম সে সময়টুকু; তারই মাঝে আমি আর এক মানুষ হয়ে গেলাম; আমি ঠিক বলতে পাচ্ছিনে বন্ধু! আমায় যেন কে এসে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দিলে, ছুটে গিয়েই এক কোপ্। ধড় থেকে মাথাটা আর হাত থেকে তলোয়ারখানা পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই এক লাফ। অনেক দূরে গিয়ে শুনতে পেলাম খুন্ খুন্ বলে চীৎকার কচ্ছে।

বাসায় যখন এলুম তখন ভোর হয় হয়। খুন করে পয়সা টাকা না পেলেও আর একটা জিনিষ পেয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে জ্ঞানের ও মনের আমূল পরিবর্ত্তন। পরদিন আজমীরে একটা মহা হৈ চৈ পড়ে গেল, বুড়ো রাও সাহেবের বাড়ীতে খুন হয়েছে; চারি দিকে পুলিশ-দারোগা, একে ধরে তাকে ধরে। শেষে মেয়েটার জমানবন্দিতে বুড়োই খুনী বলে সাব্যস্ত হ'ল। ছুঁড়িটা ধারণা করেছিল বুড়োর কোন গুপ্ত দেহরক্ষীই তার প্রিয়তমকে মেরেছে; সে বল্‌লে, "ও ছিল আমার ভাই, কখন কখন আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌ত। আমার স্বামী তা একেবারেই পছন্দ কর্ত্ত না; তাই নিমন্ত্রণ করে নিজের ঘরে ডেকে এনে খুন করেছে;" বুড়ো রাও সাহেব এ কথার যথেষ্ট প্রতিবাদ কল্লে, কিন্তু কে শোনে। তারপর মোকদ্দমা কোর্টে উঠ্‌ল; আমি রোজ যাই লোকের মুখে শুনানি গুলো শুনি আর হাসি। শেষে ন্যায়ের বিচারে বুড়োর ফাঁসির হুকুম হ'ল; লাট সাহেবের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইলে তাতেও কিছুই ফল হল' না।

ফাঁসির আর সাত দিন দেরী। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছুরি ধ'রে অবধি, ন্যায়ের ওপর কেমন একটা ভালবাসা জন্মে গিয়েছিল; মনে হল আমারি জন্যে বুড়ো ফাঁসি কাঠে ঝুলবে, আর এ আমি দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব? না—তা আমি পার্ব্ব না, আমি নিজেকেই ধরা দেব। গুণ্ডাগিরি— সে আর কর্ব্ব না; বাড়ীর জন্য মনটা খুবই কাঁদে কিন্তু সেখানে কি করে ফিরে যাব, আমি যে তার কাছে বড় অবিশ্বাসী; তবে কোথায় যাব; মরাই আমার সব চেয়ে ভাল।

অনেক ভেবে চিন্তে জজ সাহেবকে একখানা চিঠি লিখে দিলাম যে, আমি এ খুনের সমস্ত ঘটনা জানি,

আমার ইচ্ছা নির্দ্দোষী মুক্তি পাক, দোষীর সাজা হোক। আশা করি গরীবের কথা ফাঁসির আগে একবার শুন্‌বেন। এই চিঠি পেয়েই জজ সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন, তাঁর প্রাইভেট কামরায় সমস্ত কথাই হ'ল; সঙ্গে সঙ্গে হাতেও হাতকড়ি। তার পর প্রকাশ্য কোর্টে পুনর্ব্বিচার। আমি যা দেখেছি যা শুনেছি ও যা করেছি সমস্তই ঠিক ঠিক বল্‌লাম। তখন বুড়ো আমায় ট্রেনের সহযাত্রী বলে চিন্‌তেও পাল্লে। অনেক পীড়ণের পর মেয়েটাও সমস্ত কথা স্বীকার করে সেদিন কোর্টের মাঝখানে অনেক কাঁদলে, আর আমার পানে এমন একটা অন্তর্দ্দাহ দৃষ্টিতে চাইলে তা আমি এখনও ভুলতে পারিনি। রাও সাহেব অনেক টাকা খরচ করে বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার আন্‌লেন, কিছুতেই কিছু হল' না, সেই ফাঁসির হুকুমই বজায় থেকে গেল। সব শেষে কিংস্ মারসিতে বার বছর কারাবাস।

বুড়ো জেলে এসে অনেক কেঁদেছে, সে কান্না—পাথর গলা কান্না; বড় কষ্ট হত; কিন্তু দূর কর্ব্বার শক্তি কোথায়! কেবল বল্‌ত "তুমি আমারি জন্যে এই কারাবরণ করেছ, নরঘাতকের ছাপ কপালে লাগিয়েছ; আমি তোমার কি কিছু কর্ত্তে পারিনে?" আমার সে কি কর্ব্বে?

আমি জেলে এসে আমার জীবনেতিহাসের অতীত পৃষ্ঠা গুলো একে একে সবই শুনিয়েছিলাম তার ফলে সে তার সমস্ত সম্পত্তি আমার খোকার নামে দানপত্র করে একদিন সন্ন্যাসীর বেশে আমার কাছে এসে দাঁড়াল; তার মুখে সেদিন কি একটা পরিতৃপ্তির ভাষা সে কি মধুর, সে যেন এখনও আমার কাণে বাজছে।—তার মূর্ত্তি কি জ্যোতির্ম্ময়! এখনও যেন আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। বলে গেল, "ভাবিসনে বাবা, আমি তাদের আমার বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করে এমন ধন-সম্পদ দিয়ে গেলাম যে, কুড়ি বছর ধ'রে বসে খেলেও ফুরিয়ে যাবে না। এমন ব্যবস্থা করেছি কোন কষ্ট তারা পাবে না; তবে তোর ঋণের কিছুই শোধ হল' না; ইচ্ছা রইল যদি ততদিন বেঁচে থাকি তাহলে হয়ত পূরণ হতে পারে; তোর মুক্তির দিন একবার আসব। এসে এই জ্বালাময় বুকের ওপরে, এই কলঙ্কিত হাত দুখানা দিয়ে তোকে একবার চেপে ধর্ব্ব, ধরে দেখব এ জ্বালার কতটা কমে।" এখনও তার কথাগুলো যেন চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আজ আমার সেই দিন, কত জ্বালা আজ আমার, কত আনন্দ আজ আমার আমি যে স্থির হতে পাচ্ছিনে বন্ধু? দিন শেষে ম্লান সূর্য্য ছুটি নিয়ে ছুটে চলেছে, পূরবী তার সুর ছড়িয়ে সমস্ত আকাশ বাতাস কি এক গুরুগম্ভীরে পরিণত করে ফেলেছে, আমি তাই দেখছি আর কেবল ভাবছি। হয়ত তারা এতক্ষণ সবাই ঐ গেটের কাছে অপেক্ষা কচ্ছে; কত জল তাদের চোখে বেধে আছে, কত ব্যাকুলতা তাদের বুকের ভেতর উদ্দাম ঢেউ তুলে ছুটোছুটি কচ্ছে; কত আনন্দ-বিষাদ তাদের প্রাণকে আজ আকুল করে তুলেছে। ঐ দেখ বন্ধু! আমার মুক্তিপত্র নিয়ে জেলার সাহেব এই দিকেই আস্‌ছেন; আজ এই বিদায়ের দিন তোমায় কি দিয়ে অভিনন্দন কর্ব্ব বন্ধু! আমার যে কিছুই নেই। বুকের আগুন আর তপ্ত নিশ্বাস, তোমার শান্ত স্নিগ্ধ বুকের ওপরে রেখে একটু শীতল করে নি; চোখের জলের মালা দিয়ে তোমায় আজ বরণ করি; নমস্কার বন্ধু! ঐ বুঝি এলো।

অভিনব বৈদ্যুতিক সার।

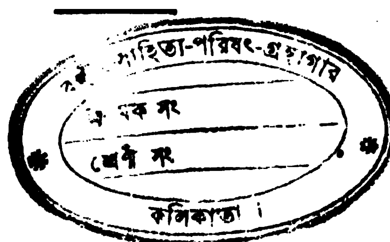
এমেরিকায় গৌটামালা জেলায় মিঃ যোস্ গ্যালীগম্ বায়ু হইতে তড়িত শক্তি আহরণ করিয়া চারা গাছের পুষ্টিসাধন করা যায় কি না সেই পরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি "Scientific American" পত্রিকায় নিম্নলিখিত কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

গাছের পাতার সরু অগ্রভাগ বায়ুস্থিত তড়িতের সংস্পর্শে আসে বলিয়া গাছগুলি প্রকৃতিগতই বিদ্যুৎবাহী। বিদ্যুৎযুক্ত ঝড়ের পর গাছগুলি সাধারণতঃ সতেজ হইয়া উঠে ইহা দেখা গিয়াছে কাজেই বুঝা যাইতেছে যে যদি মূল গাছে ও শাখায় দুই তিন স্থানে তামার তার জড়াইয়া তারের একটা মুখ উর্দ্ধ দিকে রাখা যায় তবে উহা সহজেই বায়ুস্থিত বিদ্যুৎবাহী হইতে পারে এবং ফলে সেই গাছ এইরূপ সতেজ হইয়া উঠিতে পারে যে তাহাতে সাধারণ গাছ অপেক্ষা প্রচুর নূতন বৃহৎ ফুল ও ফলে সুশোভিত হইয়া উঠিবে।

লেখক বলেন যে তিনি প্রথমে একটী ছোট পেয়ারা গাছ লইয়া পরীক্ষা করেন। মার্চ্চ হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত একখণ্ড শুঁয়া সেই গাছটীতে লাগাইয়া রাখিয়া দেখা গেল যে তাহাতে অনেকগুলি নব প্রশাখা জন্মাইয়াছে। এবং ইহা দুইবার ফল দিয়াছিল; ফলগুলিও আকারে সাধারণ পেয়ারা অপেক্ষা দ্বিগুণ বড় হইয়াছিল। এই কয়মাসের মধ্যে অনেকবার তাড়িৎসহ ঝড় হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ই জুলাই তারিখে তিনি একটী পুরাতন পাতি লেবুর বৃক্ষ লইয়া পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার পূর্ব্বে এই বৃক্ষের ফলগুলি সুপক ও পুষ্ট হইবার পুর্ব্বেই শুষ্ক হইয়া যাইত। ভাল ফল উৎপন্ন করাইবার আশায় তিনি এই গাছটীতে তিনখণ্ড তামার তার নির্ম্মিত শুঁয়া এবং একখণ্ড খোলা তার সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মাটীর ঠিক উপর হইতে গাছটীকে প্রধানশাখা পর্য্যন্ত ৫০ 'শুঁয়া' পাকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এইরূপে চারিটী শুঁয়া ব্যবহার করায় দেখা গেল যে ১৫ দিনের মধ্যেই একবার ঝড়ের পর গাছটী যেন নবজীবন লাভ করিল। অক্টোবর মাসে দেখা গিয়াছিল যে ইহাতে অনেক নূতন প্রশাখা জন্মিয়াছে। ফলের স্বাদ ও মিষ্ট এবং রসাল হইয়া উঠিয়াছে। এখন সেই গাছটীতে নানা আকারের ফল এবং ভবিষ্যতে ফলের জন্য ফুল ফুটিয়াছে। বৃক্ষটী পরিপূর্ণভাবে নবযৌবন লাভ করিয়াছে।

"ফরওয়ার্ড"



কৃষি কমিশন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিগত জানুয়ারী মাসে সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে অচিরেই ভারতবর্ষের জন্য একটী রাজকীয় কৃষিকমিশন সংগঠিত করা হইবে।

এই সরকারী রাজকীয় কমিশনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া এক ইস্তাহার জারি করা হইয়াছে। তাহাতে কমিশনের যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—"সাধারণতঃ কৃষি এবং পল্লীবাসীদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান এবং কিরূপে তাহাদের উন্নতি সাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিবরণ প্রকাশ"। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুসন্ধান করা কমিশনের কর্ত্তব্য হইবে:—

১। চাষবাস, পশুচিকিৎসা সংক্রান্ত হিসাব রক্ষণের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান বা আদর্শ প্রচার। নূতন শস্য আবাদের প্রচলন বা পুরাতন শস্য আবাদের আধুনিক পন্থা প্রয়োগ; দুধ ঘি মাখন প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানা এবং পশ্বাদি পালনের বর্ত্তমান প্রণালী শিক্ষা দান।

২। উৎপন্ন দ্রব্যাদি এবং পশুপক্ষীর চলাচল এবং ক্রয় বিক্রয়ের রীতিনীতি।

৩। চাষীদের অর্থ সাহায্য দান এবং টাকা দাদন দেওয়ার রীতি।

৪। গ্রামবাসীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং চাষীদের উন্নতি বিধানের অন্তরায় নির্দ্ধারণ।

বর্ত্তমানে জমির মালিকানা স্বত্ব বা জমিদার ও প্রজার খাজনা আদান প্রদান বা জল নিকাশের ব্যবস্থাদির আলোচনা এই কমিশন করিবেন না।

ভারত সরকার অথবা প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে অর্থ ব্যয়ের যে বিভাগ নির্দ্ধারিত আছে এই কমিশন তাহারও কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। তবে তাঁহারা এদেশে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজ কিরূপে পরস্পর সম্মিলিত ভাবে সাধিত হইতে পারে বা ভারত সরকার কি উপায়েই বা প্রাদেশিক সরকারকে বিভিন্ন কর্ম্ম প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে পারেন সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন।

আমরা বুঝিতে পারি না যে জলপথ এবং প্রজাসত্ত্ব বিষয়ে খুটীনাটী অসুবিধা ও দোষগুণ সম্বন্ধে সম্যক পর্য্যালোচনা না করিয়া কৃষিকার্য্য ব্যাপারে কোন খসড়া কিরূপ ভাবে প্রস্তুত হইতে পারে।

জমি বন্দকী লইবার আশায়ই ধনিকেরা টাকা ধার দিয়া থাকে। ভূম্যধিকারীরাও জমির স্থায়ীত্বের আশায়ই ক্ষেত্রের স্থায়ী উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হয়, জমিতে নানাপ্রকার সার ব্যবহার করিয়া শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করে এবং জল সরবরাহের সুবন্দোবস্তে তৎপর হয়।

ভারতের কৃষক অত্যন্ত দরিদ্র। সেই জন্যই এই ব্যয়সাধ্য কমিশন নিয়োগকে আমরা বাহাড়ম্বর বলিয়া মনে করি। এই কমিশনে প্রজার যে অর্থব্যয় হইবে তাহা বহন করিতে ভারতবাসী অসমর্থ। অবশ্য আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড রেডিং মহোদয় ভবিষ্যতের আশাদীপ্ত অতি উজ্জ্বল ছবি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তথাপি দরিদ্র ভারতবাসী ভবিষ্যতের আশার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারে না এবং এই আড়ম্বরের পশ্চাতে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে এরূপ সন্দেহ করা তাহাদের পক্ষে বিচিত্র নহে।

সম্প্রতি পার্লামেণ্টে বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এ, এম, স্যামুয়েল মহোদয় নিউক্যাসল ও গেটশেড্ বাণিজ্য সভায় একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের সহিত রপ্তানি বাণিজ্য উন্নতির সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে ভারতে প্রায় তিরিশ লক্ষ লৌহ লাঙ্গল, ৫০ লক্ষ জলোত্তলনকারী পাম্প এঞ্জিন এবং দেড়লক্ষ আন্দাজ ধানকলের ইঞ্জিন বিক্রয় হইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে যাট হাজার কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি

সহ রাইয়তগণকে টাকা ধার দিবার জন্য একটী সমিতি খুলিয়া যদি অগ্রসর হওয়া যায় তবে স্বল্পায়াসে ও সুবিধা জনক ভাবে উক্ত দ্রব্যাদির ব্যবসায় পরিচালন করা যাইবে।

সম্প্রতি উক্ত কমিটীর সভ্যগণের নাম প্রকাশিত হইয়াছে।

চেয়ারম্যান :—মারকুইস অব লিন্ লিথগো।

সভ্যগণ :—মিঃ নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি।

ডাঃ লোধি করিম হাইদার।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়।

মিঃ বালকৃষ্ণ সীতারাম কামাত।

সার হেন্‌রী লরেন্স।

সার জেম্‌স্ ম্যাকেন্না।

সার টমাস মিডল্টন্।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গজপতি নারায়ণ দেওগারু পারলা কিমেদীর রাজা

রায় বাহাদুর সার গঙ্গারাম।

মিঃ হিউবার্ট কালভার্ট।

নিম্নে উল্লিখিত কৃষি কমিশনের কর্ম্মীগণের কর্ম্মকুশলতার একটা মোটামুটি পরিচয় "ইংলিশম্যান" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

১। জন ভিক্টর আলেকসন্দর হোপ্—লিন লিথ্‌গোর দ্বিতীয় মারকুইস। তিনি ঈটন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ১৯১৪-১৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত য়ুরোপ সমরে কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি ইউনিয়নিষ্ট দলের সিভিল লর্ড নেভি লীগের সভাপতি, এডিনবার্গ ও ঈষ্ট স্কটল্যাণ্ডে কৃষি কলেজের সভাপতি, এডিনবার্গ রয়েল সোসাইটীর ফেলো ছিলেন।

২। মিঃ হিউবার্ট ক্যালভার্ট সি, আই, ই, আই, সি, এস্ পাঞ্জাব সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রার—১৮৯৮ খৃঃ অঃ ভারতবর্ষে আসেন। বর্ত্তমান কার্য্যে ১৯১৬ খৃঃ অঃ নিযুক্ত হয়েন; ১৯২৩-২৪ খ্রীঃ অঃ পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং বর্ত্তমানে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। তিনি গত বৎসর পুনায় যে গো ও কৃষি সম্বন্ধে অধিবেশন হয় সেই সভার একজন প্রধান উদ্যোক্তা এবং কৃষি ও সমবায় সম্বন্ধে অনেক পুস্তকের গ্রন্থকার।

৩। মিঃ নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী—ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জামাতা। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ও গ্রাম্য অর্থনীতির অধ্যাপক। আমেরিকায় কৃষি কার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়া নগেনবাবু ভারতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক প্রায় পাঁচ বৎসর ধরিয়া রবিবাবুর শান্তি নিকেতন বিদ্যালয় সংলগ্ন সুরুল কৃষি বিদ্যালয়ে কৃষিসম্বন্ধে বহু কার্য্য করিয়াছেন। বছর দুই পূর্ব্বে বিলাতের কৃষিসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তথায় গিয়াছিলেন। সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বিলাতের ও স্বদেশের অনেক বিখ্যাত পত্রিকায় ইঁহার ভারতীয় কৃষি বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

৪। ডাঃ লোধি করিম হাইদার, বি, এ, পি, এইচ্, ডি—আলিগড় মুসলিম কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক। ইনি বর্ত্তমান ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাকর্ত্তৃক কমিশনের সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন।

৫। মিঃ বালকৃষ্ণ সীতারাম কমট্ বি, এ, ব্যবসায়ী ও কণ্ট্রাক্টার। ইনি ১৯১৩ খৃঃ অঃ হইতে দুইবারে প্রায় বিশবৎসর বম্বে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং রিফর্ম্ম য়্যাক্ট এর পর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ইংলণ্ডে কেনিয়া ডেপুটেশনের একজন সদস্য ছিলেন। মিঃ কমট বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং কৃষি ও সামাজিক আন্দোলনের একজন উদ্যোগী কর্ম্মী।

৬। হিজ্ এক্সেলেন্সী সার হেনরী ষ্ট্যাভলী লরেন্স—সার লেস্‌লি উইলসনের ছুটীর সময় তাহার অনুপস্থিতিতে বোম্বায়ের অস্থায়ী শাসনকর্ত্তা। তিনি ১৮৯০ খৃঃ অঃ ভারত সরকারে চাকুরী স্বীকার করেন।

৭। সার জেম্‌স্ ম্যাকফেন্নুয়া, সি, আই, ই, আই, সি, এস—ব্রহ্ম প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। ইনি ভারত সরকারের কৃষিবিভাগের পরামর্শদাতা, পুনা কৃষি বিদ্যালয়ের ডিরেক্টর ছিলেন। সার জেম্‌স্ 'ভারতে বৈজ্ঞানিক কৃষি কার্য্য' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া ১৯১৬ খৃঃ অঃ রয়েল সোসাইটী অব আর্টের নিকট হইতে একখানি রৌপ্য পদকলাভ করেন। ১৯১৭-১৮ খৃঃ অঃ ভারতীয়

তুলা অনুসন্ধান সমিতির ও ১৯১৯-২০ খৃঃ অঃ সুগার কমিটীর সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে বহু পুস্তকও ইনি লিখিয়াছেন।

৮। সার টমাস মিডল্‌টন, বরোদা কলেজের ভূতপূর্ব্ব কৃষিবিদ্যা অধ্যাপক। ইনি অতঃপর ক্যামব্রিজ ও অন্যান্য অনেক বিলাতী কলেজের কৃষিবিদ্যার অধ্যাপনা করিয়াছেন। ১৯০৬ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত তিনি ভারতীয় কৃষি বোর্ডের সহঃ সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছেন।

৯। লেঃ অনরেবল্ রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গজপতি নারায়ণ দেও পারালাকিমেডি ষ্টেট। ইনি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে প্রাপ্তবয়স্ক হন এবং নিউটন কলেজে শিক্ষালাভ করেন—১৯১৩ খৃঃ অঃ ইনি আপন জমিদারী শাসনের অধিকার লাভ করেন। ইঁহার রাজ্যে কৃষিবিদ্যার একটী উচ্চ বিদ্যালয় এবং কৃষিশালা আছে। কৃষিবিদ্যায় ইহার যথেষ্ট অনুরাগ।

১০। রায় বাহাদুর সার গঙ্গারাম, সি, আই, ই, এম, ভি, ও পাঞ্জাবের বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার এবং উক্ত প্রদেশের কৃষিউন্নতি আন্দোলনের উদ্যোক্তা। ইনি ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে P. W. Dep বিভাগে প্রবেশ করিয়া ১৮৮৩ খৃঃ অঃ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার পদে উন্নীত হয়েন। এতদ্ব্যতীত তিনি ১৯০৩ সালের দিল্লী দরবারের পরিদর্শক, ১৯০৫ হইতে ১৯১১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত পাতিয়ালা রাজ্যের পরিদর্শক ইঞ্জিনীয়ার এবং ১৯১১ খৃঃ অব্দের দিল্লী দরবারের কন্সাল্‌টিং ইঞ্জিনীয়ারের কার্য্য করিয়াছিলেন।

সভ্যগণের উক্ত পরিচয় হইতে ইহা বোধগম্য হইতে পারে যে প্রকৃত কৃষিশিল্প অপেক্ষা কৃষকদিগকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সাহায্যের দিকেই অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

মিঃ ক্যালভার্ট, মিঃ গাঙ্গুলী এবং মিঃ হাইদার ইঁহারা প্রত্যেকেই অর্থনীতিবিদ। মিঃ কামাট একজন ব্যবসায়ী অবশ্য কৃষিশিল্পের প্রতিও তাহার যথেষ্ট অনুরাগ আছে তবে আমাদের মনে হয় যে এই কৃষিকার্য্যের মধ্যেও তাঁহার দৃষ্টি লাঙলাদি কৃষি সরঞ্জামের ব্যবসায়ের দিকে স্বভাবতই প্রধাবিত হইতে পারে।

রায় বাহাদুর সার গঙ্গারাম মাত্র অল্পদিন ধরিয়া কৃষির প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি কৃষিপ্রবন্ধ লেখকগণকে পুরস্কার বিতরণের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি ইঞ্জিনীয়ার। তাঁহার ইঞ্জিনীয়ারিং অভিজ্ঞতার দ্বারা জলপথের উন্নতিবিধানে যথেষ্ট কাজ করিতে পারিতেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে—কৃষি কমিশনের জলপথের সম্বন্ধে কোনই হাত থাকিবে না ফলে এই কমিটীতে রায়বাহাদুরের উপস্থিতি প্রকৃতপক্ষে কোন কাজ হইবে না বলিয়াই সম্ভব।

পারলাকিমেডির রাজার নিকট হইতেও আমরা বিশেষ কিছু আশা করিতে পারি না।

বোম্বাইএর গভর্ণর বাহাদুর সরকারপক্ষের লোক তিনিও সরকারের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই চলিবেন বলিয়া মনে করা আশ্চর্য্য নহে।

মিঃ গাঙ্গুলীর মত সার মিডল্‌টনও কৃষিদক্ষ। তবে তাঁহার অভিজ্ঞতা যতই থাকুক আমাদের মনে হয় উহা অতিশয় পুরাতনপন্থী। কাজে লাগাইতে হইলে তাঁহার অভিজ্ঞতা নূতন আধুনিক ভাবে গঠিত হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সভাপতির কথা ছাড়িয়া দিলাম—কারণ তাহার কর্ত্তব্য সভার পরিচালন মাত্র।

বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে কৃষিশিল্পের পুনরভ্যুত্থান এবং উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টা চলিয়াছে মাত্র। আমাদের মনে হয় যে যদি এই রয়েল কমিশনে জার্ম্মান, আমেরিকা এবং ডেনমার্ক প্রভৃতি কৃষিকার্য্যে উন্নত দেশের কৃষি অভিজ্ঞগণকে সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইত তবে এইরূপ কমিশন কার্য্যকরী হইতে পারিত। এই সকল দেশের অভিজ্ঞতা লইয়া কোন কমিশন আমাদের দেশের কৃষি এবং কৃষকের সাহায্য করিতে পারিলেই কমিটী নিয়োগ সার্থক হইয়া উঠিবে। রয়েল কমিশনের উদ্যোক্তাগণ যে একথা বুঝেন না তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। তাহারা বুঝিয়া শুনিয়াও যে বর্ত্তমান কমিটীকে নিয়োগ করিয়াছেন ইহাতে ভারতে কৃষিকার্য্যের ভবিষ্যত উন্নতির সম্বন্ধে নৈরাশ্যেরই সৃষ্টি করে।

চাষার বৈঠক।

সমবায় সমিতির মারফৎ আদা বিক্রয়ে লাভ।

মাদ্রাজ প্রদেশে দক্ষিণ কানাড়াতে দালালেরা অত্যন্ত নিম্নহারে কৃষকদিগকে আদার মূল্য দেওয়ার দরুণ গত কিছুদিন হইতে আদার চাষের অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছিল দেখিয়া মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট এই আদা বিক্রয় সমিতি স্থাপন করেন। এবং রায়তগণকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত আদা রপ্তানির সমবায় পন্থা অবলম্বন করিয়া বোম্বাই প্রদেশে এজেণ্টদিগের দ্বারা আদা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এইরূপে অনেকটা সুফলও ফলিয়াছে; এইরূপ সমবায়সমিতি সকল ফসলের এবং সকল দেশেই সঞ্চালনের চেষ্টা করা করা উচিৎ। পূর্ব্বে স্থানীয় দালালেরা প্রতি candy আদার জন্য যেখানে মাত্র ১৫৲ হিঃ মূল্য দিত আজ তাহার পরিবর্ত্তে চাষারা সেই আদার মূল্য ৩৫৲ হিঃ পাইতেছে।

এই সমবায় সমিতির মারফৎ ৩২ "গণ্ডি" আদার লেন দেন হওয়ায় কৃষকের প্রায় ছয় শত টাকা অধিক মুনাফা হইয়াছিল।

বোম্বাই প্রদেশে গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ প্রথা।

ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা।

বোম্বায়ে পঞ্চায়েৎ প্রথা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ৪১ জন সভ্য গঠিত একটী কমিটী নিযুক্ত করা হয়। সম্প্রতি তাহারা অনুসন্ধানের রিপোর্টও প্রকাশ করিয়াছেন। এই রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায় যে উক্ত পঞ্চায়েৎই প্রথা আদৌ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। অধিকতর সরকারী সহায়তা, অধিক পরিমাণে দায়ীত্ব এবং কতকগুলি বিষয়ে অধিকতর দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগীয় ক্ষমতা না দিলে উক্ত প্রথা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই প্রথাকে যদি পুনর্জ্জীবিত করিতে হয় তবে উক্ত ক্ষমতাগুলি গ্রাম্য পঞ্চায়েতের হস্তে প্রদান করিতে হইবে।

কমিটীর সভ্যগণ অতঃপর তাহাদের উক্ত প্রাথমিক সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে স্থানীয় লোকের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রথমে পঞ্চায়েতের যে সভ্য সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা কমাইয়া দিতে হইবে; তবে সভ্য সংখ্যা পাঁচজনের কম হইলে চলিবে না।

স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়জাতিকেই ভোটাধিকার দিতে হইবে।

বাজার হাট, কসাইখানা এবং গাড়ীর আড্ডা বিষয়ে যাবতীয় ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হাতে প্রদান করা প্রয়োজন। গ্রামের জলপথের কার্য্যাবলী এবং জলপথের কর নির্দ্ধারণ ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হস্তে ন্যস্ত করা দরকার এবং তাঁহারা যে কোন সম্পত্তির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন—এই ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

সরকার ও জিলালোকালবোর্ড পঞ্চায়েতের হস্তে আয় করের সমান আয় প্রদান করিবেন এবং বিশ্বস্ত পঞ্চায়েতকে ছোটখাট ফৌজদারী ও দেওয়ানি (civil) মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা দিবেন। পঞ্চায়েতের মধ্যে অস্পৃশ্য জাতি হইতে সভ্য গৃহীত হইবে কি না এ বিষয়ে কমিটি অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে সভ্য গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। পাঁচজন মাত্র সভ্য এই মতের বিপক্ষে রায় দিয়াছেন।

দেশের কথা।

যুক্ত প্রদেশের জমিদার সভা—

শিলিবেটে এই সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় প্রস্তাবিত প্রজাসত্ত্ব আইন ও বন্দোবস্ত আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হয়। যুক্তি দেখান হইয়াছে

যে দ্রব্যমূল্য সহসা চড়িয়া যাওয়ার দরুণ চাষের জমি ও করের হারের পরিমাণ সচরাচরনিয়ম বিরুদ্ধ হইয়াছে।

মধ্য প্রদেশের কৃষি-শিল্প-প্রভৃতি হস্তান্তরিত বিভাগের ভার প্রদান—

উক্ত হস্তান্তরিত বিভাগের ভার বর্ত্তমান শাসন-পরিষদের নিম্নলিখিত সভ্যগণের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। অনরেবল মিঃ মার্টিনের হস্তে আবগারী, শিল্প ও পাব্‌লিক ওয়ার্কস বিভাগের কার্য্য এবং অনারেবল মিঃ ট্যাম্বের হস্তে শিক্ষা এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বিভাগের কার্য্যের ভার প্রদান করা হইয়াছে।

পাটনা জিলাবোর্ড—

গ্রাম্য পথ ঘাট উন্নতির জন্য ঋণ গ্রহণ—উক্ত জিলা-বোর্ডে গ্রামের রাস্তা ঘাট উন্নতির উদ্দেশ্যে যে শতকরা বার্ষিক ৪৲টাকা সুদে চারি লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। ত্রিশ বৎসরের অনধিক কালে এই ঋণ শোধ করা হইবে।

অর্থ নৈতিক সভা—

কমিটী নির্ব্বাচন কার্য্য :—রোমের সর্ব্বজাতীয় অর্থ নৈতিক সভার কমিটী নির্ব্বাচন কার্য্য তিনটী সাবকমিটীর হস্তে প্রদান করা হইয়াছে। সার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম সাবকমিটীর সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কৃষি ও অর্থ সম্বন্ধীয় এবং বিশিষ্ট প্রশ্নের আলোচনা করাই উক্ত কমিটীর কার্য্য। দ্বিতীয় সাবকমিটী কারখানাজাত দ্রব্যাদির কথা লইয়া আলোচনা করিবেন এবং ব্যবসায় ও ব্যবসায়কেন্দ্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্নাদির পর্য্যালোচনা করা তৃতীয় সবকমিটীর কার্য্য হইবে।

উক্ত সবকমিটীর একটী বিশেষ বৈঠকে সার অতুলচন্দ্র মত প্রকাশ করেন যে প্রাচ্যের এবং অন্যান্য দূরবর্ত্তী দেশের প্রতিভূগণকে সভার আলোচ্য কার্য্যাবলী সম্বন্ধে চিন্তা করিবার ও তৎসম্বন্ধে তাহাদের নিজ নিজ দেশের অভিমত জানিয়া লইবার জন্য উপযুক্ত সময় দেওয়া উচিত। তিনি বলিয়াছেন যে বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বজেট বার বার ঘাটতি হইয়াছে এবং এক্‌সচেঞ্জের অনবরত অধিক পরিমাণে নামা-উঠার জন্য ভারতের বহির্বাণিজ্যও ক্ষুন্ন হইয়াছে; তিনি আরও বলিয়াছেন যে বাজেট ঠিক করিবার জন্য ভারত সরকারকে লোক কমাইবার এবং অত্যধিক কর স্থাপনের ব্যবস্থার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। তাহার মতে যুদ্ধের পর হইতে কৃষিজাত পদার্থ ও কারখানাজাত দ্রব্যের দামের মধ্যে অধিক তফাৎ নাই বটে তবে যতটুকু তফাৎ আছে তাহাতেও কৃষককুলের অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। তিনি এ বিষয়ে ভারতবর্ষকে সাহায্য করিবার জন্য উক্ত সভাকে অনুরোধ করিয়াছেন। দেখা যাউক তাঁহার পরামর্শে ভারতবর্ষের কতদূর কৃষি ও বাণিজ্য বিস্তারকার্য্য উন্নত হয়।

সাররূপে কচুরী-পানার ব্যবহার।

ছোট দক্ষিণ প্রবাহী স্রোতস্বিনীর পক্ষে কচুরী-পানা অতিশয় ক্ষতিজনক। নদী এবং বিল হইতে এইগুলি সরাইয়া কাজে লাগান একটী বিশেষ দরকারী প্রশ্ন। লণ্ডনের Fertiliser and Feeding Stuffs Journal নামক পত্রিকাতেই প্রথমে উক্ত ক্ষতিকর কচুরীপানাকে কাজে লাগাইবার কথা উল্লেখ করা হয়।

কচুরীপানা বাঙ্গলা দেশের অতিশয় ক্ষতি করিতেছে এবং বঙ্গীয় জলপথের উন্নতির পথে রীতিমত বিঘ্নস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে চীনদেশে যেরূপ শস্যাবশেষ গুলিকে শস্যক্ষেত্রের সাররূপে ব্যবহার করা হয় তদ্রূপ উপায়ে উক্ত কচুরী পানাকে পাট এবং ধান্যক্ষেত্রের সাররূপে ব্যবহার করিলেই ইহার ক্ষতিকর গ্রাস হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। শস্যের অপ্রয়োজনীয় অংশকে উত্তমরূপে প্রস্তুত জৈবিক সারে পরিণত করিয়া তাহাকে শস্যক্ষেত্রের সাররূপে ব্যবহার করিবার জন্য যে কয়টী পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে এই কচুরী পানাকে জমির সারে পরিবর্ত্তন করিবার মতলব কার্য্যে পরিণত করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

পরীক্ষা করিবার জন্য টাটকা কচুরীপানা গোবর ও ছাইয়ের সহিত মিশ্রিত করা হয়। প্রথমে পাঁচ গাড়ী আন্দাজ উক্ত পানা লইয়া তাহা ১৮ ফিট লম্বা ১২ ফিট চওড়া ও ৯ ইঞ্চি খাড়াই করিয়া মাটির উপর ঢালিয়া রাখা হয়। ইহার উপর আধ গাড়ী গোবর মাটি ও দুই ঝুড়ি ছাই বেশ চৌরস করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর তাহাতে জল ছিটাইয়া দিয়া মাটি গোবর এবং ছাইয়ের সহিত ভালরূপ মিশ্রিত করা হইয়া থাকে।

বারম্বার এই প্রথা অবলম্বন করিয়া প্রায় ৩০।৪০ গাড়ী কচুরীপানা উহাতে মিশ্রিত করিয়া লইয়া উপরে অল্প মাটি চাপা দিয়া মাসখানেক রাখিয়া দেওয়া হইল। অল্প পরিমাণে মাটি চাপা না দিলে পানাগুলি বেশী রকম শুষ্ক হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। এইরূপ প্রথায় প্রথম হইতেই আগাছাগুলিতে পচন ধরে এবং অতি শীঘ্রই উক্ত জলজ গাছগুলি পচিয়া স্যাঁতসেতে পদার্থে পরিণত হয়। একমাস পরেই বাতাস লাগিবার জন্য পচা পানার গাদা উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় মাসের শেষে পচন কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া আগাছাগুলি উত্তম জৈবিক সারে পরিণত হইল। তখন ইহা অনেকটা পচা পাতার আকার ধারণ করে।

তাহার পরে সেই পদার্থ জমিতে ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহা গাছের বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল হইয়াছে ফলে সেগুলি মহার্ঘ কার্য্যকরী সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। অনেকের ধারণা যে কচুরীপানার গাদা হইতে জল চুয়াইয়া যাইবার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন কারণ জল সরিয়া গেলে উহার মধ্য হইতে অনেকটা প্রয়োজনীয় অংশও জলের সহিত চলিয়া যায়।

কচুরী পানা পচাইয়া সারে পরিণত করিবার জন্য বর্ষার পর অক্টোবর মাস হইতে মার্চ্চ মাসই প্রশস্ত সময় কারণ এই সময়ে খোলা জায়গায় এই কাজ অনায়াসে করা যাইতে পারে।

উক্ত প্রণালীতে রবিশস্য, পাট ও ধানের জমির এবং ফল ও সব্জী চাষের জন্য প্রচুর পরিমাণে সার পাওয়া যাইতে পারে।

"American Fertiliser."

'আবাদের' প্রশ্নোত্তর বিভাগ।

এই মাসে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল মহাশয় নিম্নলিখিত তিনটী প্রশ্ন পাঠাইয়াছেন কিন্তু উহা বিলম্বে আমাদের হস্তগত হওয়ায় উহার উত্তর এ সংখ্যায় দেওয়া হইলনা— আগামী সংখ্যায় উত্তর প্রকাশিত হইবে।

প্রশ্ন :—

১। পশ্চিম বঙ্গে গমের চাষ করা চলে কি না এবং করিলে কিরূপ বিঘা প্রতি ফলে এবং কি কি সার দেওয়া আবশ্যক? Pusa দেশের গমই কি বীজের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? গমচাষে কি জল সেচন আবশ্যক?

২। অশ্বগন্ধার বীজ কোথায় পাওয়া যাইতে পারে এবং কি ভাবে চাষ করা যায়?

৩। আলু ও বাঁধাকপির জমিতে এখন হাড়গুঁড়া (Bone-meal) দেওয়া উচিত—না পরে Double Snperphosphate দিলে বেশী উপকার হবে?

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

বঙ্গদেশে বেগুণের চাষ।

শ্রীচাষা।

ভারতবর্ষে যে সব তরিতরকারী সচরাচর উৎপন্ন এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে তন্মধ্যে বেগুন সর্ব্বপ্রধান। বেগুনের দাম সাধারণতঃ খুব কম অথচ চাহিদা খুব বেশী—এই জন্য বেগুনের চাষ যাহাতে উন্নত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন।

বেগুণ নানাপ্রকার জমিতে ফলিতে দেখা যায়—কি আচট জমি এবং কি পুরাতন ভিটামাটি জমি, সাধারণত সুজলপ্রণালীযুক্ত বেলে মাটির জমি অথবা যে সমস্ত বাগানে অত্যধিক জৈবিক পদার্থ নাই· তদ্রূপ বাগান বেগুনের চাষের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র। কর্দ্দমাক্ত ক্ষেত্রে বেগুন খুব সুস্বাদু হয় বটে তবে ইহার আকার ছোট হইয়া থাকে। জমিতে জৈবিক পদার্থ অধিক থাকিলে ফুল এবং ফল অপেক্ষা পাতাগুলিই অধিকতর সতেজ হয়।

এই সকল জমিতে রবিস্স ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া বেগুনের আবাদ করিলে ভাল ফসলের আশা করা যায়।

বেগুনে অতি সহজেই নানাপ্রকার রোগ ও পোকা জন্মিয়া থাকে অতএব একই জমিতে তিন চার বৎসরের মধ্যে একাধিকবার ইহার চাষ করা উচিত নহে।

বেগুনের বীজবপন এবং চারা রোপণের সময় ক্ষেত্রে চুণ এবং ছাই ব্যবহার করিলে পোকা নষ্ট হয় এবং ফসলও ভাল হইয়া থাকে।

বেগুন বারো মাসই উৎপন্ন হইতে দেখা যায় কিন্তু একই গাছে বার মাস অবশ্য ফল পাওয়া যায় না।

শীতের বেগুনের বীজ জ্যৈষ্ঠ মাসে, গ্রীষ্মের বেগুন বা কুলি বেগুনের বীজ অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে এবং আউসে বীজ ফাল্গুণ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলে। এই ঋতু ভেদে উৎপন্ন হয় বলিয়াই ইহাদের জাতিভেদ।

জাতি—সচরাচর মোটামুটী ইহাদের দুই জাতিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। মুক্তকেশী, মাক্‌রা, ছাতারা ও এলোকেশী।

২। কুলী বেগুন। এই জাতীয় বেগুন অনেক দিন ধরিয়া একসঙ্গে অনেকগুলি ফলিয়া থাকে।

আবাদ—

বীজবপনের ভাঁটি বা হাপোর যে জাতির বীজ বপন করিতে হইবে·সেই সময়ের অনুসারে প্রস্তুত করা দরকার। ছায়াময় স্থানে এই ভাঁটি সযত্নে প্রস্তুত করিতে পারিলে ভাল হয়। মাটি কোদলাইয়া বেশ ভাল করিয়া গুড়াইয়া বীজবপনের অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। অতঃপর সেই স্থানগুলিতে চুণ, ছাই এবং গোবরের সার দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহার মাসখানেক পরে বীজবপন করিতে হইবে। ব্যবহার্য্য বীজের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ নব্বইটী বীজ হইতে যাহাতে গাছ হয় এবং সেগুলি যাহাতে সম্পূর্ণ অমিশ্রিত অর্থাৎ এক জাতীয় হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অবশ্য বীজের মূল্যও এই গুণের অনুপাতে স্থির করিয়া লওয়া প্রয়োজন। বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীর নিকট হইতে নিজের পছন্দমত নীরোগ বীজ কিনিলে ফল ভাল হইবে সন্দেহ নাই।

বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে হাপোরের মাটীতে জল দিয়া ভিজাইয়া লওয়া প্রয়োজন পরে বীজ রোপণ করা বিধেয়। অঙ্কুরোদ্গম কালে এবং চারা বাড়িবার সময় প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা গাছে অল্প জলসেচন প্রয়োজন। চারা উঠাইয়া অন্যত্র রোপণ করিবার উপযুক্ত হইতে প্রায় দেড় মাস কাল সময় লাগিবে। অনেকে ২।৩বার এক ভাঁটি হইতে অন্য ভাঁটিতে স্থানান্তরিত করিতে বলেন।

গাছে গুটীচারেক পাতা দেখা দিলে কেরাসিনের টীনের এক টীন জলে এক আউন্স নাইট্রেট অব সোডা গলাইয়া সেই জল উক্ত চারায় সিঞ্চন করা উচিত। গাছ রোপণ করিবার পূর্ব্বেও উক্তপ্রকার জল ব্যবহার করা প্রয়োজন। অপরাহ্নই চারা বসাইবার প্রশস্ত সময়।

গাছে পোকা দেখা গেলে ছাই এবং চুণ ছড়াইয়া

দেওয়া দরকার। যে জমিতে চারা রোপণ করা প্রয়োজন মনে হইবে সেই জমি অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্ব হইতে প্রস্তত করিয়া রাখা উচিত। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেই যাহাতে উক্ত জমি প্রস্তত হইয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এই জমি কোদালি অথবা Turnnerest লাঙ্গল দিয়া চষিয়া সমতল করিতে হয়।

দুই হাত অন্তর জুলি করিয়া প্রত্যেক জুলিতে হাত দুই অন্তর এক একটী চারা বসাইতে হয় নতুবা সার প্রয়োগের ফলে গাছগুলি স্থানাভাবে জঙ্গলে পরিণত হইয়া যায় ও ফলন আশানুরূপ হয় না। চারা বসাইবার দিন পনের পরে কোদালি দিয়া মাটি উস্‌কাইয়া, জুলিগুলি সমান করিয়া এবং শূন্যস্থান গুলিতে নূতন চারা বসাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। ইহারও এক পক্ষকাল পরে জুলি গুলিকে আইলে পরিণত করিয়া দেওয়া উচিত—যাহাতে গাছ সকল আইলের মধ্যে থাকে। বেগুনের গোড়ায় অনেক সময় লোণা লাগিয়া থাকে এইরূপে আইল করিয়া দিলে আর লোণা লাগিবার ভয় কমিয়া যায়। তেঁতুলের বা খইলের জলেও লোণা লাগা কমিয়া যায়। সার—লাঙ্গল দিবার সময়ই উত্তমরূপে পচা গোবর সার জমিতে প্রায়াগ করা কর্ত্তব্য। অনেকে বলেন যে প্রতি বিঘাতে ২ মন খইল এবং ১৩ সের হিঃ চুণ ব্যবহার করা ভাল। কিন্তু খইল ব্যবহার করিলে এই ক্ষতি হয় যে ইহা হইতে চারাগুলিও বড় হইলেও খইল হইতে নাইট্রোজেন আহরণ করিয়া থাকে এবং পরিণামে ফল অপেক্ষা পাতাই অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

তাহার নিম্নলিখিত সার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিলে দামেও সস্তা পড়িবে এবং ফলও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারিবে :—

প্রতি তিন বিঘার জন্য :—

মিউরেট্ অব্ পটাশ	১৬৫ সের
সুপার ফস্‌ফেট	ঐ
নাইট্রেট অব সোডা	৮০ সের।

উক্ত সার ভালরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে এবং অধিক পরিমাণে নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

জলসেচের ব্য স্থা :—

কোন কোন ঋতুতে জলসেচনের ব্যবস্থার প্রয়োজন হইতে পারে। ঋতু বিশেষের অবস্থা এবং আবাদের সময় বুঝিয়া জলের বন্দোবস্ত করিতে হয়।

চারাগুলি জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি বৃষ্টির পর রোপণ করা হইলে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত জল না দিলে চলে; ইহার পরও মাঝে মাঝে জল সেচনের ব্যবস্থা করিলেই চলে। ভাদ্র আশ্বিন মাসে বৃষ্টি হইয়া গেলে জমি নরম এবং সিক্ত রাখিবার জন্য পচা খড় দিয়া মাটি ঢাকিয়া রাখিতে পারিলে জলসেচের আর বিশেষ প্রয়োজন থাকিবে না। আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি বপন করিয়া মাসখানেক পরে চারা রোপণ করিতে হয়। এই চারায় মাঘ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বেগুন পাওয়া যাইবে।

কুলি-বেগুন ৫ ইঞ্চ হইতে প্রায় ১॥ ফুট বা এক হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। এই জাতির ফল খুব বেশী ফলে বলিয়াই বিশেষ আদর।

ফসল—সাধারণ গাছগুলিতে শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝিতে ফল পাওয়া যায়। প্রতি তিন বিঘায় ৮০৲ টাকা খরচে ১০০ হইতে ২০০ মন ফসল পাওয়া যাইবে। এবং ন্যূনকল্পে ১০০৲ আয় হইয়া থাকে। ভাল করিয়া আবাদ করিলে প্রতি বিঘায় ৩০০৲।৪০০৲ পর্য্যন্তও আয় হইতে পারে। ফলিতে আরম্ভ করিলে গাছের বড় পুরাতন পাতাগুলি ছাটিয়া দেওয়া উচিত, ইহাতে ফলের সংখ্যা অধিক এবং আকারও বড় হয়।

রোগ—বেগুন গাছে "ধসালাগা" এবং "তুলসী মারা"ই সাধারণ রোগ। কৃষকেরা বলে যে চারা রোপণ কালে ডগা নিড়াইয়া না দিলে এবং গোড়া কোদলাইয়া দিবার সময় শিকড়ে ঘা লাগিলেই এই রোগ জন্মে। শিকড়ে আঘাত লাগিলে অথবা জল জমিয়া গোড়ায় পচন ধরিলে গাছের ভিতরে পোকা জন্মাইবার সুবিধা হয় সত্য কিন্তু রোগের বীজাণু প্রধানতঃ ব্যবহার্য্য বীজের মধ্যেই থাকে—অন্যান্য কারণগুলিতে রোগ বৃদ্ধি পায় মাত্র।

ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে নুনের জলে ধুইয়া লইলে

(pickled) এই সকল রোগ এবং অন্যান্য পোকার হাত হইতে বীজগুলিকে অনেকটা রক্ষা করা যাইতে পারে।

কলি (shoot ?) এবং ফলের পোকা—একজাতীয় পোকা লাগিয়া বেগুনের কুঁড়িগুলি শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায়। সচরাচর আর একপ্রকার পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বেগুনে ছোট ছোট কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র করিয়া দেয়। অপর একজাতীয় পোকা আছে (sucking bug) সেগুলি গাছের পাতা নষ্ট করিয়া ফেলে। মাটির তৈলের এমলশন (Kerosine Emulsion) ছিটাইয়া দিলে এই রোগের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে বেগুনের সর্ব্বপ্রকার রোগ হইতে উহাকে রক্ষা করিতে হইলে উহার চাষআবাদ অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে করা প্রয়োজন। রোগযুক্ত চারা অথবা ফলগুলি উৎপাটিত করিয়া অসাবধান হইয়া ইতস্তত নিক্ষেপ না করিয়া ঐ গুলিকে একেবারে পোড়াইয়া ফেলাই একান্ত কর্ত্তব্য।

বেশীর ভাগ অবিক্রীত বেগুনগুলি চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া সযত্নে রাখিতে পারিলে বহুদিন পর্য্যন্ত উহা অবিকৃত অবস্থায় সুস্বাদু থাকে। অবশ্য কেবলমাত্র সম্পূর্ণ নীরোগ বেগুনগুলিই উক্ত প্রথায় রক্ষিত হইতে পারে।

এইরূপ প্রণালীতে সংরক্ষণ করিলে বেগুনের মূল্য যখন বাজারে কম এবং বিক্রয় করিলে লাভের পরিমাণ কম হইবার সম্ভাবনা তখন বিক্রয় না করিয়া পরে বেশী মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে।

মাসপঞ্জী।

ধর্ম্মকর্ম্ম :—এই মাসের ৪ঠা জাহ্নবী পূজা, ৭ই সীতা নবমী, ১০ই পিপীতকী দ্বাদশী, ১১ই নৃসিংহ চতুর্দ্দশী-ব্রত, ১৩ই শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল ও গন্ধেশ্বরী পূজা, ২৫শে সাবিত্রী ব্রত, ২৬শে ফলহারিণী কালিকা পূজা, ৩০শে রম্ভা তৃতীয়া, ৩১শে উমাচতুর্থী ব্রত হইবে

জল বায়ু ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব :-এই মাসে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে পার্থিব রস মাত্রেই শোষিত হয়, মানবের শারিরীক শুষ্কতা তৃষ্ণা ও উত্তাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য সুশীতল ভোজ্য পেয়াদি ব্যবহার, চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্য ও চন্দ্রকিরণ উপভোগ ও সুশীতল বায়ু সেবন হিতকর ও তৃপ্তিদায়ক। রাত্রি জাগরণ, মাদক দ্রব্য সেবন তীব্র ও কটুরসযুক্ত খাদ্য সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

দ্রব্য মূল্য :—এই মাসে ধানের মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইবে। পাটের মূল্য প্রায় সমানই থাকিবে।

কৃষিতত্ত্ব :—পাট—এই মাসে পূর্ব্ববঙ্গে পাট নিড়ান কার্য্য চলিবে। পাটের চারায় সার দিতে ইচ্ছা করিলে এই মাসে নিড়ানির পর নাইট্রেট্ অব সোডা ব্যবহার করা চলে। জমি বুঝিয়া ১০ সের কি ১৫ সের প্রয়োজন হইবে। শুষ্ক মাটির সহিত নাইট্রেট অব সোডা মিশাইয়া জমিতে ছড়াইয়া দেওয়াই প্রথা।

ধান :—আমন ধানের বীজ এই মাসে অনতি-বিলম্বে বপন করিতে হইবে কারণ আষাঢ় মাসেই রোয়া করা প্রয়োজন।

আমন ধানের জমিতে সার দেওয়া উচিত। প্রতি বিঘাতে ১৩ সের নাইট্রেট অব সোডা গোবরের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করাই বিধেয়। এই সার ব্যবহারে যে চারা হইবে তাহা জমির খাদ্যাংশ সংগ্রহ করিয়া বিশেষ পুষ্ট হইয়া ভাল ফসলদিতে সমর্থ হইবে।

আউশ ধানের নিড়ানর দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

অড়হর ঃ—অড়হর আউশ ধানের সহিত অথবা পৃথক ভাবে বপন করা হয়। অড়হর চারা বায়ু হইতে নাইট্রোজেন আহরণ করিয়া জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। এই জন্য আউশ ধানের সঙ্গে অড়হর বীজ বপন করিবার প্রথা উত্তম। অড়হর ডাল খুব পুষ্টিকর।

আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বপন করা চলে। শাঁক-আলুর বীজ আষাঢ় মাসে রোপন করা হয়। দুই হাত অন্তর গর্ত্ত করিয়া গাদায় ২টী করিয়া বীজ দিতে হয়। চারা জন্মাইলে সতেজ চারাগুলি রাখিয়া দেওয়া উচিত।

নিচু বা রসা জমীতে কন্দ তত মিষ্ট হয় না।

সব্জীবাগান :—কুমড়া, ঢেড়স, পালা ঝিঙ্গা, পালাসশার বীজ এই মাসেও বপন করা চলে। আউশ মূলা ও নানা জাতীয় শাকের বীজের বপন এই মাসের মধ্যেই শেষ করিতে হইবে।

ভুট্টার বীজ এই মাসে বপন করা চলে। পশ্চিমাঞ্চলে ভুট্টার চলন খুব বেশী। ভুট্টার বীজ এক হাত অন্তর বসাইয়া পার্শ্বস্থিত মাটী চাপা দেওয়া উচিত। বর্ষার অভাব হইলে ১০-১৫ দিন পরে ছেঁচ দিতে হয়। এবং মধ্যে মধ্যে নিড়ান প্রয়োজন হইবে।

নটে শাকের বীজ এঁটেল মাটীতে ভাল হয়। জমি রসাল হইলে গাছগুলি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে ও শাক কোমল এবং সুস্বাদু হয়। চাঁপা নটে, কন্‌কা-নটে ও পদ্ম-নটেই প্রধান। প্রত্যেক গাছের মধ্যে ৪।৫ ইঞ্চি ব্যবধান থাকা উচিত। বীজ গজাইবার ৫।৬ সপ্তাহের মধ্যেই শাক কাটিতে পারা যায়। গাছ একেবারে না কাটিয়া গোড়া হইতে ৩.৪ আঙ্গুল রাখিয়া কাটিলে এবং নাইট্রেট অফ সোডা সার জলে মিশ্রিত করিয়া ছেঁচ দিলে আবার নূতন ফেঁকড়ি বাহির হইবে।

ডেঙ্গো শাক আমাদের পশ্চিম বঙ্গের প্রধান বর্ষার তরকারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার গাছ যত বড় হইতে থাকে ততই মিষ্ট হয় কিন্তু পাতা আর তত কোমল থাকে না। ডাঁটা শক্ত ও ছিবড়া বিশিষ্ট হইয়া যায়।

বরিশালে ইহার খুব বড় বড় গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বীজ হাপেরে প্রস্তুত করিয়া রোপন করিতে হয়।

কাটোয়া অঞ্চলের ডেঙ্গো বিখ্যাত। ইহার গাছ খুব ঝাড়াল এবং ডাঁটা খুব মিষ্ট ও শাঁসাল হয়। গাছ ১।১॥ হাত ব্যবধানে রোপণ করা উচিত। জল সেচের সহিত ইহার জন্যও নাইট্রেট অফ সোডার ব্যবহারে ফল ভাল পাওয়া যাইবে।

লাল শাকের বীজও আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত রোপন করা চলে।

ফুল বাগিচা—গাঁদা দোপাটী জিনিয়া প্রভৃতি ফুল গাছের বীজ এই সময় বপন করিতে হইবে।

ফল বাগানে এই মাসে ফলের আহরণ ও বিক্রয় ছাড়া অন্য বিশেষ কাজ নাই।

বাজার দর

সার

রেড়ি খইল	প্রতি মণ	৫৸০
সরিষা ,,	,,	২॥৵০—২৸০
মউয়া ,,	,,	১॥০
হাড়ের গুঁড়া	,,	১০০৲—১৮৫৲
সালফেট্ অব য়্যামোনিয়া	,,	১৯১৲
নাইট্রেট্ অব সোডা	,,	২১০৲
সুপার ফসফেট্	,,	১৮০৲—১৮৫৲
মিউরেট্ অব পটাশ	,,	১৩৫৲
সালফেট্	,,	১৮০৲
নাইট্রেট্ অব পটাশ	,,	২৩৫৲

সেয়ার বাজার।

কোম্পানীর কাগজ—

৩॥০ হারে সুদ—	৭৬—৭৭
ওয়ার বণ্ড—	
৫৲ হারে (১৯৪৫-৫৫)	১০৭॥০-৭
৫৲ হারে (১৯২৭)	১০১-২।০
৬৲ হারে (১৯৩০)	১০৬

[গত সপ্তাহে দাঙ্গাহাঙ্গামার দরুণ অন্যান্য কাজ হয় নাই]

ডাল ঃ—

মাষকলাই ডাল	৬৲	হইতে	৮৲	মণ
অড়হর দেশী ,,	৬৲	,,	৬॥০	,,
ঐ কাণপুরী ,,	৭৲	,,	৮৲	,,
মুগের ডাল ভাজা ও কাঁচা	৯৲	,,	১৪৲	,,
ছোলার ডাল	৬৲	,,	৬॥০	,,
মশুর দেশী	৫৸০	,,	৭৲	,,
ঐ পাটনাই ,,	৭৲	,,	৭৸০	,,
ঐ ,, খাড়ী ,,	৯৲	,,	১০৲	,,
মটর ,, ,,	৫।০	,,	৬।০	,,
খেসারী ,,	৪॥৵০	,,	৫।০	,,
ছোলা (আস্ত) দেশী	৩৸০	,,	৪৸০	,,
ঐ সহুরে	৪॥০	,,	৫৲	,,
ঐ পাটন	৪৸০	,,	৫॥০	,,
মটর	৩॥০	,,	৪৲	,,
ঐ সাদা	৪॥০	,,	৫॥০	,,
মশুর দেশী	৫৲	,,	৬৲	,,
ঐ পাটনাই	৬৸০	,,	৬॥৵০	,,
অড়হর	৪॥৵০	,,	৫।০	,,
,, কানপুর	৭৲	,,	৭৸০	,,
ঐ খেসারী	৩॥০	,,	৪॥০	,,
দেশী কলাই	৫॥০	,,	৫৸৵০	,,
পাটনাই ,,	৬৸০	,,	৬৸৵০	,,
কালি কলাই	৬৲	,,	৩.০	,,
সোণা মুগ	১১৲	,,	১২৸০	,,
হারি মুগ	৬॥০	,,	৭৲	,,
কৃষ্ণ মুগ	৬।০	,,	৬৸৵০	,,
গম	৫॥০	,,	৭৲	,,
যব	৩৸০	,,	৪৸০	,,

চাল :—

বালাম	৭।০	হইতে	৭৸৵০	মণ
শিটা	৮।০	,,	৮৸০	,,
পাটনাই আতপ	৮৸০	,,	৮৸৵০	,,
চিনি শক্কর	১০৲	,,	১৩৲	,,
দাউদখানি	৮।০	,,	৯৲	,,
বাঁকতুলসী	৮৲	,,	৮।০	,,
কাজলা	৫।৵০	,,	৫৸০	,,
নাগরা	৬।০	,,	৭.০	,,
রাঢ়ী	৬৷৵০	,,	৭।০	,,
দুধ কমলা	৫৸৵০	,,	৬৷৵০	,,
পটনাই সিদ্ধ	৭।৵০	,,	৭৸০	,,

আটা ময়দা :—

অত্যুৎকৃষ্ট ময়দা	৯৵০	হইতে	৯।০	মণ
গৃহস্থ্যে ব্যবহার্য্য ,,	৮৸০	,,	৮৸৵০	,,
সাধারণ ,,	৮।৵০	,,	৮।০	,,
বি আটা	৯৲	,,	৯৵০	,,
১নং ,,	৮৷৵০	,,	৮৸০	,,
২নং ,,	৮।০	,,	৮৷৵০	,,
৩নং ,,	৬৸০	,,	৬৸৵০	,,
সুজি ,,	৯৵০	,,	৯.০	,,

মশলা :—

তিসি /৫ সের খাদ	৭৵০	হইতে	৭.০	মণ
ধনে	৬৸০	,,	৭৷০	,,
হরিদ্রা মসলিপত্তন	৭।০	,,	৭৸/০	,,
ঐ মাদ্রাজ ও গোপালপুর	৭৷০	,,	৭৸৵০	,,
ঐ পাবনা কুষ্টিয়া	৭/০	,,	১০/০	,,
ঐ দেশী	৬৷০	,,	৯৲	,,
লঙ্কা লাল	১১৷০	,,	১৩৷০	,,
সরিষা কাজলী	৯৲	,,	১০৲	,,
ঐ শ্বেতী	৯৸০	,,	১০৸০	,,
পোস্ত	৯৲	,,	১১৲	,,

সোণারূপার বাজার :—

ইংলিশ	বার	প্রতি	ভরি	২১৵৴১০
ট্যাকশালের	,,	,,	,,	২১৷৶০
বড়ালের	,,	,,	,,	২১।৵০
ঐ খুচরা	,,	,,	,,	২১৵/০
চীনের পাম্না	,,	,,	,,	২১৷০
গিনি প্রতি খানা		,,	,,	১৩৷/০
চাঁদি প্রতি ১০০ ভরি		,,	,,	৬৭৷০
ঐ খুচরা			,,	৬৭৸৵০

চা—প্রতিপাউণ্ড—

লাল কভার	
ব্রুকবণ্ড	১৸১০
লিপটন	১।৵০

চিনি মিছরি—

দোবরা	২৫৲
একবরা	২০৲
সাদা জাভা	১২৲
লাল জাভা	১০৷৵০
হিন্দুস্থান	২২৷০
মিছরী	১৩৲

লবণ—(১০০ মণ)

এডেন	৬৫৲
করকচ	৬০৲

তৈল—প্রতিমণ।

সরিষার কলের	২২৲—২৪৲
ঐ ঘানির	২৫৲—২৬৲
নারিকেল কোচিন	২৫৲—২৫৷৹
রেড়ীর তৈল	১৬৲—

কেরোসিন।

হাসমার্কা	৩৵৹
বানর মার্কা	৪৲
হাতিমার্কা	৩৷৵১৹
সূর্য্যমার্কা	৩৷৵১৹
সাপমার্কা	৩৷৵১৹
পেঁচাকার্কা	৩৷৵৹

ঘৃত—(প্রতিমণ)।

ভাদুয়া	৮৫৲
শ্রীমার্কা	৮৩৲
খুর্জ্জা	৮০৲
অন্যান্য	৭১-৭২৷৹



আবাদ

কৃষি শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক

একমাত্র মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক—শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল।

নিয়মাবলী।

১। আবাদের অগ্রিম দেয় বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, ভিঃ পিঃ তে ৩৵০ তিন টাকা তিন আনা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য চারি আনা। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয় না। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়;

২। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বমাসের মধ্যে পত্রদ্বারা কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে, নতুবা ঠিকানার গোলমালে পত্র না পাইলে আমরা দায়ী হইব না। অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য পরবর্ত্তী মাসের মধ্যে ডাকঘরে সন্ধান লইয়া কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্রদ্বারা জানাইবেন, তাহার পর আমরা আর অপ্রাপ্তির জন্য দায়ীত্ব লইব না।

৩। উত্তর পাইবার জন্য ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন, নতুবা সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। গ্রাহকগণের গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ থাকা আবশ্যক, গ্রাহক সংখ্যা প্রতি মোড়কে গ্রাহকগণের নামের উপর লিখিত থাকে।

প্রবন্ধাদি।

৪। স্থানীয় অভিজ্ঞতা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সুলিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রবন্ধসকল লেখকের নাম ও ঠিকানা সহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না, ফেরত পাইতে হইলে ডাক খরচা পাঠাইতে হয়।

বিজ্ঞাপন।

৫। অশ্লীল বিজ্ঞাপন আবাদে প্রকাশিত হয় না। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন অথবা বন্ধ করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়। ব্লক ভাঙ্গিয়া যাওয়ার জন্য আমরা দায়ী নহি, এবং বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার সঙ্গে ব্লক ফেরৎ না লইলে, হারাইয়া যাওয়ার জন্যও আমরা দায়িত্ব লইব না। বিজ্ঞাপনদাতা বিনামূল্যে পত্রিকা পাইবেন।

৬। বিজ্ঞাপনের মূল্যের হারের জন্য পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—আবাদ

২৭ নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

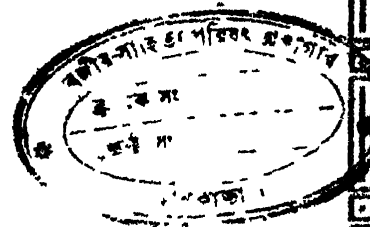
সূচীপত্র।

[[illegible] বর্ষ] আষাঢ় ১৩৩২ [৩য় সংখ্যা]

আবাদ

সম্পাদক—শ্রীচারুচন্দ্র সান্ন্যাল।





সডাক বার্ষিক মূল্য [illegible] টাকা। প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

"যাহারা কৃষিকার্য্য করে, তাহারাই এদেশের প্রকৃত-লোক, জাতি বলিতে তাহাদিগকেই বুঝায়। যদি কখনও এদেশের উন্নতি ঘটে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়ই ঘটিবে,—বিশ্ববাসীর সম্মুখে ইহারাই জাতীয়ত্বের দাবী লইয়া দাঁড়াইবে; তবে তৎপূর্ব্বে এদেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতি হওয়া চাই।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—

ইক্ষু ও পাটের ফসল বৃদ্ধি করিতে

নাইট্রেট্ অফ সোডা

শ্রেষ্ঠ সার বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।



ইক্ষুর আদি স্থান ভারতবর্ষ একণে ভারতবর্ষে জমির উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস হওয়ায় ইক্ষুর ফলন কম ও চিনির অভাব হইতেছে। সেইজন্য ইক্ষুক্ষেত্রে গোবর, খইল ছাড়া বিঘা প্রতি ১/০ মণ নাইট্রেট অফ সোডা দ্বিগুণ পরিমাণ শুষ্ক ঝুরা মাটির সহিত তিনমাস অন্তর দুইবার হইতে তিনবার প্রয়োগ করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যাইবে। পাট চাষ করিয়া যদি লাভ বাড়াইতে চানত জ্যৈষ্ঠ মাসে পাটের ক্ষেতে ঝুরা মাটীর সহিত চৌদ্দসের নাইট্রেট্ অফ সোডা মিশাইয়া প্রতি বিঘায় ছড়াইয়া দিবেন, নাইট্রেট অফ সোডার দর রেলে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত /১ সের৷ টিন প্রতি ডজন (১২টী) ৪৷৷০ টাকা, /৫ সেরা প্রতি থলি ১৷/০, ১/০ মণ প্রতি থলি ৮৷৷০ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। অর্ডার পাঠাইবার কালে ইহা লিখিয়া দিবেন যে মাল প্যাসেঞ্জার বা মালগাড়ীতে পাঠান হইবে ও মালের দাম ভিঃ পিঃ দ্বারা আদায় করা হইবে। বিবিধ ফসলের উপর প্রয়োগ বিধি জানিবার জন্য

নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন :—



চিলিয়ান নাইট্রেট্ কমিটী।

পোষ্ট বক্স নং ৪৬৯ কলিকাতা।

জে, এন, ঘোষ—ডিভিসনাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ, বেঙ্গল।

চিলিয়ান নাইট্রেট্ কমিটী :—বর্দ্ধমান।

আবাদ

কৃষি শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক—শ্রী চারুচন্দ্র সান্ন্যাল।

নিয়মাবলী

১। আবাদের অগ্রিম দেয় বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, ভিঃ পিঃ তে ৩৶০ তিন টাকা তিন আনা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য চারি আনা। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয় না। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়;

২। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বমাসের মধ্যে পত্রদ্বারা কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে, নতুবা ঠিকানার গোলমালে পত্র না পাইলে আমরা দায়ী হইব না। অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য পরবর্ত্তী মাসের মধ্যে ডাকঘরে সন্ধান লইয়া কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্রদ্বারা জানাইবেন, তাহার পর আমরা আর অপ্রাপ্তির জন্য দায়ীত্ব লইব না।

৩। উত্তর পাইবার জন্য ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন, নতুবা সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। গ্রাহকগণের গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ থাকা আবশ্যক, গ্রাহক সংখ্যা প্রতি মোড়কে গ্রাহকগণের নামের উপর লিখিত থাকে।

প্রবন্ধাদি।

৪। স্থানীয় অভিজ্ঞতা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সুলিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রবন্ধসকল লেখকের নাম ও ঠিকানা সহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না, ফেরত পাইতে হইলে ডাক খরচা পাঠাইতে হয়।

বিজ্ঞাপন।

৫। অশ্লীল বিজ্ঞাপন আবাদে প্রকাশিত হয় না। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন অথবা বন্ধ করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়। ব্লক ভাঙ্গিয়া যাওয়ার জন্য আমরা দায়ী নহি, এবং বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার সঙ্গে ব্লক ফেরৎ না লইলে, হারাইয়া যাওয়ার জন্যও আমরা দায়ীত্ব লইব না। বিজ্ঞাপনদাতা বিনামূল্যে পত্রিকা পাইবেন।

৬। বিজ্ঞাপনের মূল্যের হারের জন্য পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—**আবাদ**

২৭ নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা না বদ্‌লাইলে সামাজিক সমস্যার মীমাংসা হইবে না। কি করিয়া তাহা সম্ভব হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই **"শান্তিপুর কর্ম্ম-মন্দিরের"** প্রতিষ্ঠা। আর সেই উদ্দেশ্যেই **"কর্ম্মমন্দির সিরিজ"** প্রকাশ হইতেছে। এই সিরিজের প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য **ছয় আনা**। বিভিন্ন মাসে ভিন্ন ভিন্ন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতার ভিতর দিয়া সমাজের প্রত্যেক স্তরের দোষগুলি ফুটিয়া উঠিবে – সেই সঙ্গে সেগুলি সংশোধনের উপায়ও প্রকাশিত হইবে।

"কর্ম্মমন্দির সিরিজের" প্রথম গল্প পুস্তক —**'সপ্তক'** তরুণসাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত বিশ্বমোহন সান্যালের লেখা। সামাজিক চিত্র—দরদী লেখনী !! নগ্ন সত্য ভাষার মাধুর্য্যে ও কলার কৌশলে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে !

প্রাপ্তিস্থান ঃ—বরদা এজেন্সী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

অথবা

"কর্ম্মমন্দির" শান্তিপুর, (নদীয়া)।

টেলিগ্রাম—টাব্‌হোটেল। ফোন—৯১৫ বড়বাজার।

টাওয়ার হোটেল।

শিয়ালদহ নর্থ ষ্টেসনের ঠিক সম্মুখে

নিউ শিয়ালদহ স্যানিটোরিয়মের সহিত মিলিত

২৭নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

নিউ শিয়ালদহ স্যানিটোরিয়াম বা শিয়ালদহ স্বাস্থ্য নিবাসের নাম জন সাধারণের সুপরিচিত। গত চার বৎসর হইতে আমাদের যে সকল পৃষ্ঠপোষক সাময়িক ভাবে একাকী বা সপরিবারে এই স্বাস্থ্য নিবাসে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের সেবা ও যত্নে এবং সময়মত সুচারু আহার্য্য পাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, এ কথা আমরা স্পর্দ্ধা সহকারে বলিতে পারি। কিন্তু ইহাতে স্থানাভাব বশতঃ আমরা বৃহদা‌য়তন বাড়ীর চেষ্টা বহুদিন হইতে করিতেছিলাম। ভগবৎ-প্রসাদে এতদিনে আমাদের সেই চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। তাই আমরা উপরিলিখিত ঠিকানায় স্বাস্থ্য নিবাসের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া টাওয়ার হোটেল নাম দিয়া একটী আদর্শ বোর্ডিং স্থাপন করিলাম। ইহা নব-নির্ম্মিত পাঁচতলা বাড়ী। প্রত্যেক দুইখানা ঘরের জন্য একটী স্বতন্ত্র বাথরুম সহিত কল ও পাইখানার বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেক ঘরেই বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা আছে। একাকী ও সপরিবারে থাকিবার বিশেষ সুবিধা। আহারের বন্দোবস্ত ও উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। কলিকাতা ও মফস্বলবাসীগণ বোর্ডার না হইয়াও দৈনিক আহার করিতে পারেন তাহারও সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। রুগ্ন ব্যক্তিদিগের জন্য আমাদের ১নং হ্যারিসন রোডস্থ স্বাস্থ্য-নিবাসে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

সীট রেণ্ট সমেত দৈনিক খরচ—৫৲ ৪৲ ২॥০ ও ১॥০.

সীট রেণ্ট সমেত মাসিক খরচ—৯০৲ ৬০৲ ৪৫৲ ও ৩৫৲।

আবাদ

"এমন মানব-জমিন্ রইল পতিত
আবাদ কর্‌লে ফল্‌ত সোণা।"
—রামপ্রসাদ।

১ম বর্ষ { আষাঢ়, ১৩৩৩ } ৩য় সংখ্যা

গান।

(মাঘী বর্ষণ)

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্‌)

বাদল পাঠালে
    প্রভু তোমার করুণা।
ধরণী বাঁচালে
    প্রভু তোমার করুণা।
সিক্ত ধরণীতল
ধরিবে ফুল ও ফল
মুছাবে নয়নজল
    প্রভু তোমার করুণা।

বাদল ধারায়
নামিলে ধরায়
অমৃত ঝরায়
    প্রভু তোমার করুণা।
আনন্দাশ্রু ঝরে
চোখ্ দুটি জলে ভরে
মন প্রেমভরে স্মরে
    প্রভু তোমার করুণা॥

নানা কথা

এমন একদিন ছিল যখন সত্যই বাঙ্গলা দেশ ভারতের সকল প্রদেশের শীর্ষে বিরাজ করিত, বাঙ্গালী যে পথ দেখাইত অন্য সকলে তাহারই অনুসরণ করিত; কিন্তু সে দিন আর নাই। আমরা সেদিন ও কৃষ্ণনগরে বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় সম্মেলন দেখিতে গিয়াছিলাম, অনেক আশা বুকে বাঁধিয়া গিয়াছিলাম যে তরুণ বাঙ্গলার রূপ দেখিয়া, তাহার বাণী শুনিয়া, হৃদয়ে আশা ও শক্তি সংগ্রহ করিব। কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহাতে হতাশ হইয়া ফিরিয়াছি। তরুণ বাঙ্গালার যে বীভৎস মূর্ত্তি দেখিলাম তাহাতে সত্যই মর্ম্মাহত হইয়াছি। তরুণ বাঙ্গলার কি উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডব নৃত্য। ইহারাই আবার স্বরাজ আনিবে! একথা শুনিলেও হাসি পায়। বাঙ্গলার নবীনের দল আজ মস্তিষ্কের ব্যবহার ছাড়িয়া দিয়াছে—সে পরের কথায় উঠে বসে; দলাদলির মধ্যে সে আজ আপনাকে নিঃশেষে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

কৃষ্ণনগরে এই দক্ষ যজ্ঞের পর সত্যই আজ বাঙ্গালীর ভাবিবার সময় আসিয়াছে—আজ সে কোন পথে চলিয়াছে। আজ যদি এই অধোগামি শক্তিকে আমরা রোধ করিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। প্রথম পরিবর্ত্তন চাই আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর। এখন শিক্ষা চাই, যাহা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে সহায়তা করিবে। বর্ত্তমানে যে শিক্ষা প্রচলিত তাহা আমাদের জীবনে বড় বেশী উপকার দেয় না। তাই আমাদের জীবন এমন উদ্দেশ্যহীন। আমরা যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি তখনও যেমন অসহায়, যখন পাঠ সাঙ্গ করিয়া বিদ্যালয়ের বাহিরে আসি তখনও তেমনি অসহায়। যে বিদ্যা আমাদের শক্তি দান করিতে অসমর্থ সে শিক্ষার প্রয়োজন কি?

তারপর আজ সঙ্ঘ জীবনের বড়ই অভাব আমাদের দেশে দেখা দিয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কার্য্য করিতে আমরা একেবারে অপারগ হইয়াছি। তাই দলভাঙ্গাই হইয়াছে আমাদের জীবনের লক্ষ্য এই সংকীর্ণতা যত দিন না যাইবে ততদিন বাঙ্গালীর স্থান সকলের নিম্নে তাই আজ সঙ্ঘ জীবনের সাধনা আমাদের করিতে হইবে। ইউরোপে শিশুকাল হইতেই তারা সঙ্ঘবদ্ধ জীবন যাপন করিতে শিক্ষা করে। বিদ্যালয়ই তাহাকে এই জীবন সাধনায় উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলে। কি শিক্ষা গৃহে—কি ক্রীড়াক্ষেত্রে কি ছাত্রাবাসে সকল স্থানেই সে সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের-উপকারিতা উপলব্ধি করে। এই শিক্ষাই পরে তাহাকে নাগরিক জীবনের উৎকর্ষ লাভে সহায়তা করে।

তারপর চরিত্রের কথা—আমরা সত্যকে জীবন হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছি। সেই যে বাল্যকাল হইতে পাঠশালায় আমরা ফাঁকি দিতে শিখি, সে ফাঁকিই আমরা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সকল বিষয়ে দিতে ছাড়ি না। ইহার ফল যে কি বিষময় হইয়াছে—তাহা যাঁহারা বাঙ্গালী চরিত্রের খবর রাখেন তাঁহারাই জানেন। আমরা মুখে বলি এক, মনে ভাবি আর এক;—ইহার ফল হইয়াছে আমাদের আর কেহ বিশ্বাস করিতে চাহে না, সকলের কাছে আজ হেয় হইতে বসিয়াছি।

আজ ভাবপ্রবণতা এতই আমাদের পাইয়া বসিয়াছে, যে কর্মশক্তি ও চিন্তাশক্তি আমাদের একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, তাই কৃষ্ণনগরে স্বদেশিকতার এই ব্যঙ্গ অভিনয় সম্ভবপর হইয়াছে। এত অর্থ ব্যয় যে হইল তাহার কি ফল হইল? এই যে চারিদিকে এত সভা সমিতি হয় ইহাতে দেশ আজ অগ্রসর হইতেছে না কেন? তাহার কারণ সভায় আমরা যাই এক মূর্ত্তি লইয়া—সেখানে কথার তোড়ে এক কাজের ফর্দ্দ তৈয়ারি করি;—কিন্তু সভার বাহিরে আসিয়া সে ফর্দ্দ বাতিল করিয়া দিই, সভা আমাদের অভিনয়মঞ্চ সেখানে আমরা কর্ম্মিনেতা, অথবা সে ফর্দ্দের ছদ্মবেশে অভিনয় করিয়া দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়া হাততালির অধিকারী হই। তাহা না হইলে যতগুলি সভাসমিতি হইয়াছে. সেখানে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার শতাংশের একাংশও যদি কার্য্যে পরিণত হইত তাহা হইলে বাংলার শ্রী অন্যপ্রকার হইত। এই যে পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে কত না প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার কয়টী আমরা কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইয়াছি? অথচ আমরা যদি আমাদের কার্য্যের ভিত্তি এই পল্লীতে প্রথম না গড়ি তাহা হইলে আমাদের কোন কার্য্যই স্থায়ী হইবে না। এই পল্লীসংস্কারের জন্য আজ চাই এক নূতন দল। শুধু যাহাদের মধ্যে ভাব প্রবণতার সঙ্গে কর্ম্ম প্রেরণার মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে। ভাব প্রবণতার দ্বারা একার্য্য সম্ভব নয়—কারণ উহা অনেক সময় সজীব কর্ম্মসাধনার পরিপন্থী। এই পল্লী সংস্কারের কার্য্যপদ্ধতি এই পল্লীতে বসিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং সারাজীবন ধরিয়া তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। পল্লী সংস্কার দুই একদিন বা দুই এক বৎসরের কার্য্য নয়.। এখানে অন্ততঃ একটীজীবন (Generation) ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে। আজ পল্লীর প্রধান প্রয়োজন দুইটী; অর্থ ও কর্ম্মী। পল্লী আজ অর্থ হীন. দারিদ্র্য পল্লীর সব মনুষ্যত্ব গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে সেখানে আজ মানুষ নাই। তাই পল্লীর চাই আজ টাকা। এই টাকা আমাদের মধ্যে যাঁহারা পল্লী সংস্কার করিতে চান তাঁহাদেরই সংগ্রহ করিতে হইবে। এই অর্থ দিয়া একটী সমবায় সমিতি প্রত্যেক পল্লীতে স্থাপন করিতে হইবে।

এই সমবায় সমিতির কার্য্য হইবে দুইটী; প্রথম, পল্লীর উৎপাদিত দ্রব্য বাহিরে সমবেতভাবে চালান দেওয়া ও পল্লীবাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা। পল্লীতে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা বোধ হয় জানেন যে এখানে কত জিনিষ খরিদ্দারের অভাবে নষ্ট হয়, এটী বন্ধ হইলেই গ্রামে অর্থাগম অনেক সহজ হইবে। অর্থ গ্রামে আসিলেই গ্রামের উন্নতি হইবে। এবং আরও উন্নতি করিবার প্রবৃত্তিও গ্রামবাসীর মনে জাগিবে। এই যে এত চীৎকার সত্ত্বেও কৃষির উন্নতি হইতেছে না তাহার কারণ কি? আমাদের কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের বন্দোবস্ত এত খারাপ যে উন্নত কৃষি কার্য্যে যে খরচ হয়, তাহাতে বিশেষ কিছু লাভ থাকে না, কিন্তু আজ যদি বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত হয়. যদি লাভের অংশ বেশী পাওয়া যায় তবে নিশ্চয়ই লোকে উন্নত কৃষিপ্রণালী অবলম্বন করিবে। এই সমবায় সমিতিগুলি শুধু তাহাদের সভ্যদের উপকার সাধন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না, সমিতি গুলির তহবিলেও যথেষ্ট অর্থ আসিবে এবং সেই অর্থ দিয়া পল্লী সংস্কার কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। আজ কাল লোকের যেরূপ আর্থিক অবস্থা তাহাতে তাহারা বার বার কোন কার্য্যে সাহায্য করিতে অক্ষম, তাই একবার কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া এইরূপ সমিতি গড়িতে পারিলে পরে আর কাহারও নিকট হাত পাতিতে হইবে না, আর এই সমিতি চালানের ফলে আমাদের কর্ম্মশক্তিও যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইবে গ্রামবাসী ও যথার্থ উপকার পাইয়া আমাদের উপদেশে কর্ণপাত করিবে। তখন সত্যই তাহাদের লইয়া গ্রামের উন্নতি করিতে সক্ষম হইব। গ্রামে Raw materials আছে যথেষ্ট সেই সুদূর মারওয়ার হইতে ব্যপারী আসিয়া তাহা বিদেশে চালান দিয়া নিজের জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। আর আমরা কলিকাতায় চাকুরির উমেদারি করিতেছি। তাই বলিতেছি যে সমবায় সমিতি এই সকল কার্য্যে আমাদের বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। সমবায় তন্ত্র আজ আমাদের জীবনে নূতন করিয়া তুলিতে হইবে।

গোজাতির উন্নতি ঃ—এককালে যে বাংলা দেশের 'গোয়াল্' গাভীপূর্ণ ছিল, আজ সেই দেশের শিশু দুগ্ধ অভাবে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে জগৎ সভায় আজ আমাদের স্থান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিশু বয়স হইতে পুষ্টির অভাবে বাঙালী আজ এত হীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে কেরাণীগিরি ছাড়া অন্য কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যই সে ভাল করিয়া উঠিতে পারে না।

আমদানির তালিকা হইতে জানিতে পারা যায় যে ভারতবর্ষে ৬২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৪৭ টাকা মূল্যের টিনের দুধ ও ২২ লক্ষ ৫ হাজার ৭১৭ টাকা মূল্যের দুগ্ধজাত খাদ্য আমদানি হয়। ইহার ফলে আমাদের দরিদ্র দেশের প্রচুর অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে এবং পরোক্ষভাবে গোজাতির উন্নতি বিষয়ে আমাদিগকে উদাসীন করিয়া তুলিতেছে। কেবল ইহাই নহে—'ভেজিটেব্‌ল্ ঘিতে' বাজার ছাইয়া গিয়াছে, আমেরিকার বিখ্যাত ধনী "হেনরী ফোর্ড" রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত দুগ্ধ সরবরাহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। "মোটর লাঙ্গল্" দিয়া জমি চাষ করিবার কত আয়োজনই না আজ চারিদিকে দেখা যাইতেছে। ইহাতে স্বতঃই গোরু ও বলদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহ জাগিতেছে—আমরা সারা মন দিয়া গোজাতির উন্নতি করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিতেছি না!

আমাদের এখন একযোগে এই সকল বৈজ্ঞানিক উপায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া গোজাতির উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য—গরুর প্রতি যাহাতে অবজ্ঞা আসিতে পারে এরূপ কোন বিষয়ের প্রশ্রয় দিয়া জাতির অবনতি ঘটিতে দিবার সময় আর নাই। বর্ত্তমানে দুগ্ধ সমস্যা যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে কেবল গোমাতার পূজা করিলেই চলিবে না।

আমরা আজ বড় আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে সমবায় বিভাগের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত নিরেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় আজ কয়েক বৎসর চেষ্টার ফলে কলিকাতার সন্নিকটস্থ গ্রাম গুলিতে সমবায় শক্তির সাহায্যে এই সমস্যার সমাধানের এক নূতন পথ দেখাইয়াছেন। আমরা সমবায় শক্তির এই নূতন তথ্যে বিশেষ উল্লাসিত। প্রত্যেক গোপালক একযোগে কার্য্য না করিলে, ইহাতে অর্থাগমের সুবিধা হয় না, কারণ একই মানুষকে যদি- গোপালন, দুগ্ধ, বিক্রয় প্রভৃতি কার্য্য চালাইতে হয়, তাহা হইলে উভয় কার্য্যই সুচারুরূপে করা সম্ভব হয় না।

বসু মহাশয় যে সমিতি স্থাপন করিয়াছেন তাহার নাম Calcutta Corporation Milk Suplly Union এই সমিতি শুধু যে গ্রামবাসী গোপালকদিগের অর্থাগমের সুবিধা করিয়া দিয়াছে তাহা নয়—কলিকাতা নগরীতে খাঁটী স্বাস্থ্যকর দুগ্ধের সরবরাহ করিয়া তাঁহার সমিতির সাহায্যে এই অনিষ্ট বন্ধ করিয়া গ্রামবাসীরও সাধারণ কলিকাতাবাসীর অশেষ উপকার সাধিত করিয়াছেন—আজ সমিতির সাহায্যে তাহারা উত্তম ষাঁড় পায়—। সমিতির সভ্যদিগকে তহোদের পালিত পশুদের জন্য, আহার্য্য উৎপাদন করিতে, অর্থ সাহায্য দিয়া উৎসাহিত করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত এই সব কার্য্যের উপকারিতা তাহারা কোন দিন উপলব্ধি করে নাই। কিন্তু আজ তাহারা দেখিতেছে গরুকে ভাল, খাবার দিলে যত্ন করিলে, তাহার দুধ বাড়ে দুধ বাড়িলে গোপালকের অবস্থার উন্নতি হয়। কিন্তু আগে দুধ বেচা টাকা সে বড় হাতে "মাখিতে" পারিত না—তাই তাহার পক্ষে গরুকে যত্ন করা সম্ভব হইত না—আর গরুর দুধও কমিয়া যাইত। তখন তাহাকে বিদায় করা ছাড়া তাহার অন্য কোন উপায় থাকিত না। সমিতির সাহায্যে তাহাদের সে অবস্থার অবসান হইয়াছে। এই সমিতির কর্ম্মীদের ভিতর আর একজন কৃতবিদ্যের নাম উল্লেখ করা যায়—ইঁহার নাম ডাক্তার কালী কুমার বন্দোপাধ্যায়—পশু চিকিৎসক; ইনিও এ সমিতিকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে, ষাঁড় নির্ব্বাচন—গো চিকিৎসা, প্রভৃতি কার্য্য পরিচালিত হয়। এই কার্য্যগুলি গোপালকদিগের বিশেষ উপকারে আইসে। এই সমিতির কার্য্যে কলিকাতা কর্পোরেশন প্রীত হইয়া সমিতির

কার্য্য প্রসারের জন্য লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন।

সমবায় বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয়েরও সকল সময় নানা জ্ঞান উপদেশ দিয়া সমিতিকে উন্নতি পথে চলিতে সাহায্য করিয়াছেন। এই সমিতির আদর্শে যদি বাঙ্গলায় চতুর্দ্দিকে গোপালন সমিতি গড়িয়া উঠে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই সমস্যার সহজ মীমাংসা হইয়া যাইবে। তখন জাতির ভবিষ্যৎ শিশুর দলের অকাল মৃত্যুতে বাংলার আকাশ বাতাস ব্যথিত হইয়া থাকিবে না—দেশের অর্থ বিদেশে চলিয়া গিয়া দেশবাসীকে দরিদ্রতর করিয়া তুলিবে না।

*　　*　　*　　*

লঙ্কার আবাদ

লঙ্কা সচরাচর বাগানে ও মাঠে চাষ করা হইয়া থাকে। উঠানে একটুখানি জায়গা থাকিলেই লোক নিজের ব্যবহার্য্য কাঁচা লঙ্কা জন্মাইবার জন্য লঙ্কাচারা লাগায়।

ইহার আর্থিক মূল্যও বড় কম নয় তবে ইহার ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর অর্থাগম করিতে হইলে আরও অনেক উন্নতি সাধন করিতে হইবে। আমেরিকা এবং ইটালিতে এই জিনিষ যথেষ্ট বিক্রীত হইতে পারে।

"C. Annucma" জাতীয় অনেক লঙ্কা আছে যাহাদের ঝাল (Pungency) তেমন বেশী নহে কিন্তু স্বাদ ভাল এই জন্যই ভারতবর্ষে অতি অল্প পরিমাণ জমিতে ইহার চাষ করা হয়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে ফল রক্ষা করিবার ব্যবসায় বিশেষ প্রচলিত ছিল না কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতে ফল ও সব্জীর প্রচুরতা দেখিয়া তাহা রক্ষা করিবার ব্যবসায় অধিক পরিমাণে প্রচলিত হওয়ার দরুণ লঙ্কার আদরও বাড়িয়াছে। আমাদের মনে হয় এই ব্যবসায়ের বৃদ্ধির দরুণ এবং লঙ্কার স্থানীয় ব্যবহারের জন্য ইহার চাষ ও ব্যবসায় শীঘ্রই আদরণীয় হইয়া উঠিবে।

লঙ্কায় সচরাচর—(fungoid) রোগ জন্মিয়া থাকে তবে ইহাতে পোকা ধরে না। সুতরাং যাহারা ব্যবসা করিবার জন্য লঙ্কার চাষ করিবেন তাহাদের বীজ যাহাতে ভাল হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বাসী দোকান হইতে বীজ ক্রয় করা উচিত।

জাতি :—

সাধারণতঃ নানাজাতীয় লঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি 'বারমেসে' এবং কতকগুলি বার্ষিক একবার মাত্র ফল দিয়া থাকে। 'বারমেসে' (perennial) গাছ সাধারণত লোক পছন্দ করে না কারণ লঙ্কা গাছ যতই অধিকদিনের পুরাতন হয় ততই তাহাতে—fungoid রোগ হইবার সম্ভাবনা অধিকতর হইয়া উঠে। C. Fructescens জাতীয় লঙ্কা বারমাসই ফল দিয়া থাকে। C. annucma জাতীয় লঙ্কা বৎসরে একবার মাত্র ফল দিয়া থাকে। আর এক প্রকার লঙ্কা আছে তাহার অগ্রভাগ লম্বা—ইহা C. acumnata জাতীয়। এই লঙ্কাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। স্পেনীয় C. Grossium জাতির লঙ্কাগুলি খুব বড় লম্বা এবং গোল হয় তবে ইহা ঝাল হয় না। বর্ত্তমানে এই প্রকার লঙ্কা ইহার আকার, রং এবং ঝালের অল্পতার জন্য অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

C. Longnum—ইহা পাটকিলে রঙের—C.

Minimum—এই জাতীয় লঙ্কা আকারে খুবই ছোট তবে ইহা অত্যন্ত ঝাল।

জমি ঃ—

লঙ্কা সচরাচর বৃহৎ পরিসর স্থানে চাষ করা হইয়া থাকে তবে বেলে মাটি (Loam) জমিতেই ইহার চাষ করা ভাল। নদীতীরস্থ পালিমাটির জমি অথবা চুণযুক্ত পাথুরে জমিতে রীতিমত সার দিয়া চাষ করিলে সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। মাটি বেশ ঝুরা হওয়া প্রয়োজন। বাংলা, বিহার এবং গুজরাট প্রদেশেই ইহার সমধিক চাষ হইয়া থাকে।

চাষ ঃ—

লঙ্কার চাষ করিতে হইলে জমিতে তিনবার আড়াআড়ি ভাবে লাঙ্গল দেওয়া উচিত। অতঃপর মই দেওয়া প্রয়োজন।

বর্ষাকালে অথবা অন্য সময় বৃষ্টির পর মাটি যখন নরম হয় তখন চাষ আরম্ভ করিলে চাষের খরচ অনেক কম লাগিবে। পূর্ব্ববর্ত্তী ফসলের উপর লঙ্কার চাষের অনেকটা নির্ভর করে। সাধারণতঃ লঙ্কার জমিতে আলু অথবা তৈলবীজ ফসলের চাষ করা হয়। যদি জমিতে লঙ্কার পূর্ব্বে আলু চাষ করা হইয়া গিয়া থাকে তবে লঙ্কার চাষের সময় অল্প কর্ষণেই কাজ চলিবে। ইহার বীজ বিশেষভাবে রোপন করিয়া প্রথমে চারা প্রস্তুত করা হয়। চারাগুলি ৪" ইঞ্চি অথবা ৬" ইঞ্চি লম্বা হইলেই অন্যত্র সরাইয়া রোপন করা হয়। জুলাই এবং আগষ্ট মাসে রীতিমত বৃষ্টি হইবার পরে চারা রোয়া করা উচিত।

চারাগুলি সওয়া দুই হাত আন্দাজ দূরে দূরে রোপন করা কর্ত্তব্য। দুইটী সারির মধ্যে হাত দুই প্রভেদ থাকা প্রয়োজন। একটু উচ্চ মাটির সারির উপরই চারা রোপন করিতে হয়—ইহার নিম্নে জুলি রাখা দরকার কারণ তাহাতে বৃষ্টির সময় জল নির্গমনের ব্যবস্থা ভাল হয়। আগাছা পরিষ্কার রাখা নিতান্ত প্রয়োজন এবং মাটি কোদলাইয়া দিতে পারিলে ফসলও ভাল হইবে নিঃসন্দেহ।

সার—

আজকাল যে প্রথায় লঙ্কার আবাদ করা হয় তাহাতে লঙ্কাচারার প্রয়োজনীয় সারের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয় না। ইহাতে ফলন মোটেই বৃদ্ধি পায় না।

অনেকে অবশ্য লঙ্কার জমিতে খইলের সার ব্যবহার করেন তবে নানা কারণে এই প্রথাও উঠিয়া যাইতেছে। কৃষকেরা ভ্রমবশতই হৌক অথবা বিরক্তি বশতঃই হউক কেবলমাত্র গোবরসার ব্যবহার করিয়াই নিষ্কৃতি পাইতে চাহেন। উড্রো সাহেবের মতে নিম্নলিখিত সার জমি পাট করিবার সময় ব্যবহার করা চলে। শতকরা ৭.৬৫ভাগ নাইট্রেট্ অব্ সোডা ; ১১.০২ ভাগ সালফেট্ অব পটাস এবং ১১.২০ ভাগ সুপার ফসফেট্। নিম্নলিখিত সার প্রয়োগ করিয়া বম্বে কৃষিশালায় লঙ্কার চাষে বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে :—

সালফেট্ অব্ পটাস	২১০ সের	প্রতি তিন বিঘা জমিতে।
সুপার ফস্ফেট্	১১৬ ,,	,, ,,
নাইট্রেট্ অব সোডা	৮০ ,,	,,

কিন্তু আমাদের মনে হয় উক্ত সার ও তৎসহ প্রতি তিন বিঘা জমিতে আট গাড়ী কিংবা দশ গাড়ী গোশালা জাত সার ব্যবহার করিলে আরও অধিক সুফল পাওয়া যাইবে।

ফসল সংগ্রহ ঃ—

স্থানীয় ব্যবহারের জন্য কাঁচা লঙ্কা সংগ্রহ করিতে হইলে চারা রোপনের মাস তিনেকের মধ্যেই তাহা উপযুক্ত হইয়া উঠিবে। মাসে একবার হিসাবে চারি পাঁচবার লঙ্কা সংগ্রহ করা হয়। চালান দিতে হইলে ডিসেম্বর অথবা ফেব্রুয়ারী মাসে লঙ্কা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। এই সময়কার লঙ্কাই শুষ্ক করিয়া বিদেশে চালান দেওয়া হয়। ভালরূপ পাকা লঙ্কাগুলি গাছ হইতে তুলিয়া লইয়া দিন পনের রৌদ্রে শুকাইতে হয়। রাত্রিবেলা বাহিরে রাখিলে শিশিরে কোন ক্ষতি হয় না তবে বৃষ্টির সময় উহা ঘরে রাখা কর্ত্তব্য কারণ বৃষ্টি লাগিলে লঙ্কার ক্ষতি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

ফলন ঃ—

সচরাচর প্রতি তিন বিঘা জমিতে মোটামুটি ৮৲০ মন লঙ্কা পাওয়া যায়। ভালরূপে সার ব্যবহার করিলে এই ফলন যে কেবলমাত্র ১০৲০ হইতে ১৫৲০ মনে দাঁড়ায় তাহা নহে লঙ্কার আকারও বেশ বড় হয়। বড় আকারের লঙ্কার দামও অধিক। লঙ্কা শুকাইলে সাধারণতঃ কাঁচা লঙ্কার ওজনের চারি ভাগের একভাগে দাঁড়ায়। বাংলা, মাদ্রাজ, ব্রহ্ম এবং বম্বে প্রদেশেই মাঠে লঙ্কার চাষ করার প্রথা প্রচলিত।

ব্যবহার—

লঙ্কা প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইতে পারে। অত্যধিক ঝালযুক্ত লঙ্কা শুকাইয়া গুড়া করিয়া রীতিমত ব্যবসা চালান যাইতে পারে। য়ুরোপেও ইহার যথেষ্ট প্রচলন।

চীনে বাদাম তুলিবার উপায়।

১৯২৬ খৃঃ অব্দের মহীশূর এগ্রিকাল্‌চারাল্ ক্যালেণ্ডার পাঠে জানা যায় যে সেখানে চীনেবাদাম চাষে ফসল তুলিবার খরচ অত্যন্ত বেশী হওয়ায় উহার চাষ তত লাভজনক হইয়া উঠে না। মহীশূরে জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মাসে চীনেবাদাম বীজ রোপন করা হয় এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে ফসল তোলা হইয়া থাকে। কাজেই সে সময় জমিও শক্ত হইয়া যায়; এই কারণে চীনেবাদামের ফসল তোলা কাজটী শক্তও হইয়া পড়ে এবং খরচও অধিক প্রয়োজন হয়। অবশ্য কোন কোন বৎসর বৃষ্টি হওয়ায় কৃষকগণের পক্ষে ফসল তোলা সহজ হয়। এই কার্য্য সহজে করিবার জন্য আজকাল দাভানগির, নানজানগু প্রভৃতি তালুকে জাপানী ও স্পেন্‌জাতীয় বাদামের চাষ অত্যধিক বেশী হইতেছে কারণ এই জাতীয় বাদামের ফসলোত্তলন কার্য্য খুব শক্ত ও ব্যয়সাধ্য নহে। এই প্রকার বাদামের চাষ যদিও ধীরে ধীরে প্রচলিত হইতেছে তথাপি যতটা স্থানে ইহার চাষ করা হয় তাহার মধ্যে অতি অল্পপরিসর জমিই ইহার জন্ত নির্দ্দিষ্ট। তুলনায় এখনও ইহার চাষ বেশী জমিতে করা হয় না।

কাজেই বুঝা যাইতেছে যে বাদাম সংগ্রহ করিবার খরচ এবং ব্যয়ের প্রশ্ন প্রকৃত পক্ষে এখনও জটিলই রহিয়াছে। উৎপন্ন ফসলের ষষ্ঠাংশ হইতে তৃতীয়াংশ অর্থ কেবল মাত্র উহা সংগ্রহ করিবার জন্যই ব্যয় হয়—এই ব্যয় বড় অল্প নহে। যে বৎসর চীনা বাদামের দাম একটু চড়া থাকে সেই বৎসর ফসল তুলিবার খরচে অনেক টাকা পড়ে। বাদাম তুলিবার সময় মহীশূরের প্রধান খাদ্য শস্য—(Ragi) ও পাকিয়া উঠে—কাজেই উহাও এই সময়েই কাটা প্রয়োজন।—(Ragi) কাটিবার জন্যই এই সময়ে অধিকংশ লোক নিয়োজিত থাকে সুতরাং—Ragi সংগ্রহ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত চীনা বাদাম তোলা হয় না—এই প্রকারে বিলম্ব হওয়ার দরুণ জমি অধিকতর শক্ত হইয়া যাওয়ায় বাদাম উত্তোলন ও কঠিনতর হইয়া পড়ে। এই রূপে উক্ত কার্য্যের খরচ সময় সময় এত বেশী হইয়া পড়ে যে শস্যের প্রায় অর্দ্ধেক মূল্যই ব্যয় হইয়া যায়। জন মজুরের অভাবে অনেক সময় এমন হয় যে পরবর্ত্তী আবাদ আরম্ভ হইবার সময় পর্য্যন্ত বাদামগুলি মাটির তলায়ই থাকিয়া যায়। বাঙলা দেশেও চিনা

বাদাম তুলিবার সময় ধান কাটিবার জন্য লোকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বীরভূম, বাঁকুড়া, নদীয়া মুরসিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় অনেক পতিত জমি আছে সেখানে ইহার আবাদ অতি সহজেই চলিতে পারে।

ফসলোত্তলনকারী বিশেষ যন্ত্র।

বোম্বাই প্রদেশে অথবা দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কুন্টি (kunti) নামে চীনাবাদাম তুলিবার জন্য একপ্রকার বিশেষ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। মহীশূরে এই যন্ত্র অথবা লাঙ্গল ব্যবহার করা কিছুতেই চলে না কারণ উহা নরম জমিতেই ব্যবহার্য্য। জন মজুরের পরিবর্ত্তে আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও বাদাম তুলিবার জন্য এক প্রকার লাঙ্গল ব্যবহার করা হয় কিন্তু তাহাও এই স্থানে ব্যবহার করা সম্ভবপর নহে। কাজেই বুঝা যায় যে সাধারণ ভাবে খুঁড়িয়া না তুলিয়া অন্য কোন উপায়ই অবলম্বন করা যায় না। যাহা হউক চীনা বাদামের মাটির তলা হইতে তুলিবার জন্য (Stone Threshing roller) নামক যন্ত্র অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এই যন্ত্র ব্যবহারে পরিশ্রমের অনেক লাঘব হয়। যে সব কৃষক এই যন্ত্র বিষয়ে বিশেষ কিছু জানেন না তাহারা এই দিকে লক্ষ্য করিলে ভাল হয়।

প্রথম প্রয়োজনীয়তা।

চীনা বাদাম উত্তোলনের কার্য্য সহজ করিবার জন্য প্রথমেই উহার জমির মাটি নরম এবং ঝুরা করিবার প্রয়োজন হইবে। মাটি নরম এবং ঝুরা করিতে পারিলে হাতে করিয়াই হউক অথবা বলদ দ্বারাই হউক—ফসল তুলিবার কাজ অনেকটা সহজ হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। 'পাথর ভাঙ্গা কল (Stone Threshing roller) শক্ত মাটির উপর দিয়া টানিয়া লইয়া গেলে উক্ত জমির মাটি অত্যন্ত নরম এবং ঝুরা হইয়া যায়। ইহাতে যথেষ্ট সাহায্য হয়। এই যন্ত্রের দ্বারা মাটি নরম করিয়া লইলে অতঃপর কোদালের সাহায্যে হাতে করিয়াই অল্প শ্রমে বাদাম তুলিতে পারা যায়। ইহাতে সময়ও খুব অল্পই লাগিবে। অনেক কৃষকই এই প্রস্তর নিষ্পেশক যন্ত্র ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন যে যেখানে চীনাবাদাম সাধারণ ভাবে হাত ও কোদালি দিয়া তুলিতে গেলে অনেক খরচের দরকার হয় সেখানে উক্ত যন্ত্র ব্যবহার করায় সময়ও খরচ অনেক কম লাগিয়াছে।

মহীশূরের বহু স্থানে এই যন্ত্রের ব্যবহার কৃষকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা এখন উক্ত যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সুফল পাইতে পারেন।

বর্ত্তমানে চীনাবাদামের চাষ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমানে মহিশূর প্রদেশে প্রায় তিনলক্ষ বিঘা জমিতে ইহার চাষ হয়। জমির পরিমাণ শীঘ্রই বোধ হয় আরও বাড়িয়া যাইবে কারণ চীনাবাদাম বিক্রয়ে চাষীর নগদ যথেষ্ট অর্থাগম হয়। বাদামের দামও নেহাৎ মন্দ নহে। সুতরাং এই চাষের যে কোন সহজতর উপায়ই লক্ষ্য করা উচিত। উল্লিখিত যন্ত্রের ব্যবহার দ্বারা ফসল তুলিবার প্রথা লক্ষ্য করিলে বাদাম চাষের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে সন্দেহ নাই।

মুক্তার মালা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

সে অনেক দিনের কথা, সেই আমার প্রথম চাকরী কর্ত্তে কল্‌কাতায় আসা। যে মেসে থাক্‌তাম, সেখানে একটু গোলমাল হওয়াতে বকুলতলার একটা মেসে উঠে আসি, সেখানে চারু থাক্‌ত সেই আমায় আনে।

প্রথমে একটু 'বাধ বাধ' ঠেক্‌তে লাগ্‌ল। কারণ চারু ছাড়া সেখানে একজনও আমাদের দেশের বল্‌তে ছিল না; আগে যেখানে ছিলাম সেখানে সবাই আমাদের গাঁয়ের ও আশেপাশের লোক। ঠ্যালায় প'লে বাধ্য হয়েই অভ্যস্ত হতে হয়; কাজেই দুএক মাসের মধ্যে সকলের সঙ্গে বেশ চেনা পরিচয় হয়ে গেল। আমরা ছিলাম একেবারে সবাই নবীন; কেউ বিয়ে করেছেন, কেউ করেন নি, কেউ প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন, কেউ বা খাব-খাব কচ্ছেন এই প্রকার। সমস্ত দিন খেটেখুটে এসে চারুর ঘরে সন্ধ্যার পর আমাদের আড্ডাটি বেশ পুরোদস্তরই জম্‌ত; খেলাধুলোও হ'ত; এইরূপ গল্পগুজবও হ'ত। কার প্রণয়িনী কাকে কি লিখেছেন, যার প্রণয়িনী এখনও হয়নি, তিনি ভবিষ্যতে কি লিখবেন, এইসব নিয়ে খুব একটা আলোচনা চল্‌ত।

মাঝে মাঝে ভাবাবেশে দু একখানা রবিবাবুর গানও হ'ত; তবে আমরা ছিলাম একেবারে গানে-অ-জ্ঞান, সজ্ঞানে ত ওপাঠ কখনও করিনি; ওর বিজ্ঞানও কোন কালে পড়িনি; হলেও আমরা কিন্তু নাছোড়বান্দা; কেউ বা গর্দ্দভ কণ্ঠে করুণ রাগিনী, কেউ বা উষ্ট্র কণ্ঠে মধুর রাগিনী গেয়ে উঠ্‌তাম; এমনি ক'রেই দিনের পর দিনগুলো এক রকম কেটে যেত মন্দ নয়।

চারুর ঘরে একজন ভদ্রলোক থাক্‌তেন, তাঁর নাম ছিল সুরেশ বাবু; তিনি আমাদের বয়সী হলেও অতিরিক্ত গম্ভীর, বেশী রকমের নির্ব্বাক; আফিস থেকে ঘুরে এসে খেয়ে-দেয়ে একখানা বই নিয়ে শুয়ে পর্ত্তেন; কথার মধ্যে বেশী পীড়াপীড়ি ক'ল্লে একটা হাঁ কি না দিয়েই সেরে দিতেন। তাঁর এই রকম ব্যবহারে আর আর সকলের মনের সঙ্গে গোপনে গোপনে একটা বিয়োগের রেখা পাত হয়ে আস্‌ছিল।

একদিন রবিবারের দুপুরবেলা, বর্ষাকাল বাইরে ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে বৃষ্টি পচ্ছে; আমরা সবাই চারুর ঘরে তাসের আড্ডা বেশ জমিয়ে নিয়েছি; এমন সময় সুরেশ বাবু কোথা থেকে ভিজে গোবর হয়ে এসে উপস্থিত। আমি একটু বিদ্রূপ করেই বল্‌লাম্ রবিবারেও আপনার আফিস কামাই নেই দেখ্‌ছি; সুরেশ বাবু না রাম না গঙ্গা— কাপড় ছেড়েই বিছানেতে লম্বা হলেন। আমাদের ঘাড়ে সেদিন ভূত চেপেছিল, আমি আর চারু মনস্থ করলাম, আজ সুরেশ বাবুকে একটু বেশ ভাল করেই জ্বালাতন কর্ত্তে হবে। আমার রুম্ মেট্ ছিলেন রসময় রায়, বিষ্ণুপুরের লোক; তিনি ছিলেন একেবারে গো-বেচারী গোছের, প্রথমে কিছুতেই আমাদের দলে আস্‌তে চান্ না, পরে আমাদের ভোট বেশী হওয়াতেই বাধ্য হয়ে তাঁকে রাজি হতে হ'ল। আমাদের দলের সকলেরই মত হ'ল, ও যেমন ঘুমুচ্ছে, এই বাদলার দিনে আরাম করে ঘুমুচ্ছে, প্রথমে ওর ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দাও,—কি করা যায় সবাই মিলে ডি, এল, রায়ের "যখন সঘন গগণ গরজে বরিষে করকা ধার," এই গান আরম্ভ করা গেল; সে কি চিৎকার আকাশের মেঘ গর্জ্জনকেও আমরা স্তম্ভিত করে দিলাম, অন্ততঃ আমাদের তাই বোধ হতে লাগল; কেউ কেউ বা বাক্স পেঁটরা বাজাতে লাগ্‌লেন, সঙ্গে সঙ্গে আবার হাত তালি, ঠিক যেন গোদের উপর বিষফোঁড়া। তারপর রবিবাবু ও ডি, এল, রায়ের গান নিয়ে একটা বেশ তর্কও বসে গেল। এই সমস্ত চেঁচামেচিতে সুরেশ বাবু আমাদের পানে চেয়ে পাশ ফিরে শুলেন। তাতে বোঝা গেল, তিনি ঘুমিয়ে পরেননি ঘুমের ভান করে শুয়ে পড়ে আছেন আমি চারুকে ইঙ্গিত করে বল্‌লাম, "সুরেশবাবু ঘুমোননি

দেখ্‌ছি, উঠুন না মশাই, এমন রবিবারের দিনটা কি বৃথাই কাটাবেন ?" চারু বল্‌লে, "নে নে তোরা থাম, আজ বাদলার দিন সুরেশ বাবুর একখানা গান হোক।' সবাই অমনি ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগার মত হাঁ হাঁ করে উঠ্‌ল,"তাই হোক—তাই হোক।" সুরেশ বাবু বেশী কথা কইবার লোক ছিল না এ কথা আগেই বলেছি সে সেদিন বিনা ওজর আপত্তিতে একখানা গান ধর্লে, রবিবাবুর গান,—"আমার পরাণ যাহা চায়" ; কী তার কণ্ঠ, আর কি সে করুণ !! most charming. গানের সুরে এমন একটা ভাব ঢেলে দিলে, যেন সিনেমায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ধোরে ধোরে একটা প্রেমের করুণ কাহিনী দেখলাম।

আমরা ত সবাই একেবারে অবাক ; এমন গাইতে জানে, এত মিষ্টতা এর গলায়, এত ওস্তাদি এর গানে, অথচ আমরা কোন দিনই তার একটু খোজ পাইনি, এইটেই খুব আশ্চর্য্যের কথা। আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম, কারুর মুখে কথা নেই, একেবারে সব চুপ্! খানিক পরে সে বল্লে—

"তোমাদের কথা শুনে আমার হাসি পায়। অথচ আমি হাসতে পারিনে, তা হলে তোমরা আমাকে পাগল ছাড়া আর কিছুই মনে কর্ব্বে না ; তার কারণ তোমরা এক একটি আস্ত পাগল ছাড়া আর কিছুই নও। তোমাদের আজকের আলোচনার বিষয় খুবই আলোচ্য হলেও তাকে এমনি করে আলস্যভরে আলোচনা কচ্ছ যে সেখানে একটুও প্রাণের স্পর্শ খুঁজে পাওয়া যায় না। তোমরা উপভোগ্য বস্তুর, লোচনদৃষ্ট দ্রব্যেরই অনুশীলন কর্ত্তে পার না, আবার অদৃষ্ট অনির্দ্দিষ্ট চিজের আলোচনা কর্ত্তে যাও ? আগে যা পেয়েছ তারই সুন্দরতায় নিজেকে ভরিয়ে নাও, বর্ত্তমানে যা পাচ্ছ তারই মধুরতা উপভোগ কর্ব্বার শক্তি দেখাও তারপর বাইরের বড় বড় জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামিও।"

চারু বল্লে "এ যে রবিবাবুর একটা Philosophical lecture হয়ে গেল, যাক, ও আমরা ঢের শুনেছি, শুনে শুনে কান পচে গেছে বাবা, ও আর শুন্‌তে চাইনে ; বলি আপনি যে আমাদের কারও সঙ্গে মিশতে চান না এর কারণটা কি আজ বলতেই হবে।

সুরেশ একটা ঢোক গিলে বল্‌লে, সে অনেক কথা, সে আর শুনে কাজ নেই ; এইটুকু জেনে রাখ আমার মেশবার কোনই উপায় নেই বলে মিল্‌তে পারি নে ; যাক আমায় ক্ষমা ক'রো ভাই।"

সুরেশের প্রবীণত্বের বড় বড় কথা শুনে চারু খুবই রেগেছে তার পর পাগল-টাগলও বলেছে, সে নাছোড়বান্দা, বল্‌লে, "ও সব ক্ষমা টমা হবে না, বলতেই হবে।"

মাথা চুলকোতে চুলকোতে সুরেশ বললে, "সে কথা বলতে গেলে আমাকে আমার জীবনেতিহাসের অতীত পৃষ্ঠাগুলোর দু একখানা পাতা তোমাদের শোনাতে হয় ; আর তাতে অনেক অবান্তর কথাও বলতে হবে ; সে একেবারেই ভাল লাগবে না ; তার চেয়ে না হয় আর একখানা গান গাই।" সে এমনি ধারা সব সাধুভাষাতেই কথা বলত। আমাদের মনে হচ্ছিল যাকগে আর শুনে কাজ নেই গানই হোক ; কিন্তু চারু বললে, না গান পরে হবে আগে সব শুনি।" তখন সুরেশ আমতা আমতা করে আরম্ভ করলে। সে যা যা বলেছিল তাই সংক্ষেপে বলি।

—"ছোট বয়েসের ঘটনা থেকে না বললে ঠিক বোঝান যাবে না, সেইজন্য গোড়া থেকেই বলি ;—নেহাৎ একটুখানি থেকেই আমি এই রকম কম কথা কই, হলেও দুঃখটা কোনকালে কম করে পাইনি ; আট বছর বয়সে বাপ হারিয়ে সাপুরে ভগ্নিপতির আশ্রয় নিই ; তাঁর অনুগ্রহে স্নেহে যত্নে শৈশব জীবনটা এক রকম কেটেছিল মন্দ নয় ; এখনও যে তিনি স্নেহ করেন না তা নয়। তবে আমার অনুভব কর্ব্বার শক্তিটা এখন অন্যরূপ হয়ে গিয়েছে, এইটেই বোধ হয় জীবনের একটা সমস্যা।

সাপুরস্কুলে matric পাশ করি, তারপর তাঁদের অবস্থায় কুলিয়ে উঠল না যে আরও কিছু লেখাপড়া শেখান মা সরস্বতীর পায়ে নমস্কার করে ঐখানেই বিদ্যের শেষ কল্‌লাম। চুপ্‌চাপ্ বসে থেকে চলে না, আর পারাও যায় না।

কাজেই চাকরীর চেষ্টা আরম্ভ হল ; কিছুতেই কিছু হয় না, শেষে ভগ্নিপতি বললেন যে হরিহরপুরের জমিদার

বাড়ীর ছেলে দুটোকে পড়াবি, খাবিদাবি থাক্‌বি মাইনেও টাকা পনের দেবে,উপস্থিত এই কর, পরে দেখা যাবে। কি করি,মন্দের ভাল যা হয় একটা হল বলে একটু আনন্দও হ'ল আশাও হল; বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি হরিহরপুরে জমিদার বাড়ী প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত হলাম।

জমিদারের মস্ত বাড়ী, তোষাখানা, বৈঠকখানা, কাচারী, পূজোবাড়ী, গোলাবাড়ী, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর দুয়োরের ত আর অভাব নেই, তাঁরা আমাকে একটা ঘরই ছেড়ে দিলেন; সেইখানেই আমার আস্তানা হল। জমিদার বাড়ীর পূর্ব্বপুরুষ—নাম হরিহর রায়—এই গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে নাম দেন হরিহরপুর; আর তাঁর ছেলে নাতীর নাম রাখেন হরি দিয়ে, সেই থেকে এই বংশে সমস্ত নামই ঐ হরি লাগান হয়ে আস্‌ছে; এখন এমনি হয়ে পড়েছে যে হরির অভাবে হ'তেই কাজ চল্‌ছে; হলেও বর্ত্তমান জমিদারের নাম হরিশঙ্কর রায়, বয়স এমন বেশী নয়। হরিহর রায় প্রথম জীবনে কোন জমিদার বাড়ী গোমস্তার কাজ কর্ত্তেন, পরে কিছু জমিজমা নিয়ে কৃষি ব্যবসায়ে জীবনে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। পরে নিজেই জমিদার হয়েছিলেন।

হরিশঙ্কর বাবুর দুটি ছেলে একটি মেয়ে, মেয়েটিই বড়, ছেলে দুটি ছোট; আর এই দুটিরই আমি শিক্ষক ছিলাম।

বাবুর মাতাঠাকুরাণী মেয়েটীকে গৌরীদান করেছিলেন অর্থাৎ নবছর বয়সে বিয়ে দেন, হতভাগিনী সে বিয়ের পর ছমাস যেতে না যেতেই বিধবা হয়। আমি যখন শিক্ষক-রূপে এই বাড়ীতে আসি, তখনও সেখানকার নিরানন্দতা একেবারে ঘোচেনি, সবেমাত্র এক বছর এই বিপদ চলে গিয়েছে।

হরিশঙ্করবাবু খুব সৌখিন লোক, সব চেয়ে তার ফুলের সখই বেশী ছিল, বৈঠকখানার বাড়ীর সামনেই মস্ত বাগান, মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি, বেশ কেতাসই সাজান। বাবুটি নেহাৎ সেকালের মতও নয়, আবার একালের ন্যায় সব দিকে খুব মাডরনও নয়। লোক খুব ভাল, একেবারে সদাশিব; গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টাও তাঁর মাঝে বিশেষ ভাবেই দেখতে পাওয়া যেত; বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপও দুতিনখানা তাঁর ছিল। ছাত্র দুটির মধ্যে একটীর বয়েস আট আর একটীর ছয়, যেমনি সুবোধ তেমনি শান্ত; বড়লোকের ছেলের মত আদুরে গোপাল মোটেই নয়। আমার ধারণাই ছিল পয়সাওয়ালা লোকের সন্তান মাত্রেই খুব দুর্দ্দান্ত হয়; কিন্তু এখানে এসে সে ভ্রম আমার ভেঙ্গে যায়। তবে তাঁর মেয়েটি ছিল যেমনি আদুরে তেমনি দুষ্টুর ধাড়ি, কিন্তু তার পোড়াকপাল বলে শাসনের বাইরেই সে ছিল। জমিদার বাবু সকলকে বলেই রেখেছিলেন "ও যাই করুক কেউ কিছু ওকে ব'লো না, আমার অনুরোধে আর ওর অদৃষ্টের পানে চেয়ে ক্ষমাই করে যেও।"

মেয়েটিকে বেশ সুন্দরী বললে ঠিক বলা হয় না, তার দেহের সৌন্দর্য্যে এমন একটা বৈচিত্র্য, চলাবলা মেলা-মেশায় এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যা সচরাচর চোখে পড়ে না; কৈশোরের প্রথম পাদবিক্ষেপের সৌকুমার্য্য নিয়ে আমার চোখে সে পড়ে। তার গতি ছিল অবাধ, দুষ্টুমিটাও অনেকের সঙ্গেই কর্ত্ত, যাকে যেমন পেত। বসন্তের দম্‌কা হাওয়ার মত একরাশ ফোটা ফুলের গন্ধ মেখে একটা পুলক শিহরণ সঙ্গে নিয়ে সে আস্‌ত, আবার নিমিষেই সব ওলটপালট করে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেত; সেটা সবারি কাছে যেমন ছিল একটা ভীতির, তেমনি বাঞ্ছনীয় ও প্রীতির। তার চোখদুটোতে দুষ্টুমির চাঞ্চল্য সদাসর্ব্বদার জন্যে লেগে থাকলেও সে কেবল মাধুর্য্যবৃষ্টিই কর্ত্ত; সাবধান হবার আবশ্যকতা বুঝেও এক পা কারুর এগুতে ইচ্ছে হত না, এমনি ছিল সে।

পূর্ব্বেই বলেছি আমি একটী ঘর পেয়েছিলাম, সেইখানে ছেলেরা পর্ত্তে আস্‌ত; মেয়েটী, সব কাজই তার ইচ্ছাধীন, কোন কোন দিন বই বগলে সে দেখা দিত। লেখাপড়ায় তার তেমন চাড় ছিল না, আর আমার ওপর তেমন হুকুমও ছিল না, সুতরাং তার জন্যে মাথা ঘামাবার কোনই আবশ্যক হত না। তবে বোধ হত আমার কাছে পড়তে আসা সে শুধু তার দস্যিগিরি দেখাবার জন্যেই।

ক্রমশঃ।

আমনের চাষ।

আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতীয় আমন দেখা যায়, ইহাদের নাম করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রায় অসাধ্য। প্রত্যেক জেলারই উপযোগী এক এক বিশেষ জাতির চাষ হয়। এক জেলার ধান অপর জেলার সকল সময়েই বড় সুবিধাজনক হয় না। কতকগুলি ধান সুগন্ধযুক্ত হয় যেমন গোবিন্দ ভোগ, দাদখানি, বাঁসমতী বেনাফুলি, কামিনী, বাদসাভোগ। কতকগুলি ধান শুধু খৈ প্রস্তুত কার্য্যে লাগে যেমন, বাঁকচর, হরিণখুড়ী ইত্যাদি—

কৃষি-বিভাগ ইন্দ্রশালজাতীয় ধানেরই চাষের পক্ষপাতী। আমন ধানের ভিতর সরু, মোটা, দুই প্রকারই ধান দেখিতে পাওয়া যায়।

আমন ধানের আবাদ সাধারণতঃ অল্পনিম্ন জমীতে হয়। জলা বা অতি নিম্ন জমীর ধান মোটা হয়। সরকারী কৃষি ক্ষেত্রে দিনাজপুরের সরু কাটারীভোগ ধান অতি নিম্ন ভূমিতে বপন করিবার ফলে দেখা গিয়াছে যে ধানের গুণ নষ্ট হইয়াছে ও ধান মোটা হইয়া গিয়াছে। সরু ধান সাধারণতঃ ফলে কম। তবে দাদখানির ফলন বেশী। বর্দ্ধমানে ইহার চাষ বেশী, হুগলীতেও কিছু কিছু হয় কিন্তু এই জেলাগুলির বাহিরে ইহার ফল কিরূপ হইবে এখনও বলা যায় না। কর্পূর সাল কেলেজীরা, সমুদ্রবাটী, সমুদ্র ভোগ ধান বানের জল সহ্য করিতে পারে সহজে নষ্ট হয় না।

মোটা ধানের ফলন খুব বেশী এবং জলে তাহাদের ক্ষতি কম হওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গে মোটা ধানের চাষই বেশী হয় তাই সেখানে ধানের ফলনও হয় বেশী—এক বরিশালের বালাম চাল সারা কলিকাতার বাজার রাখে।

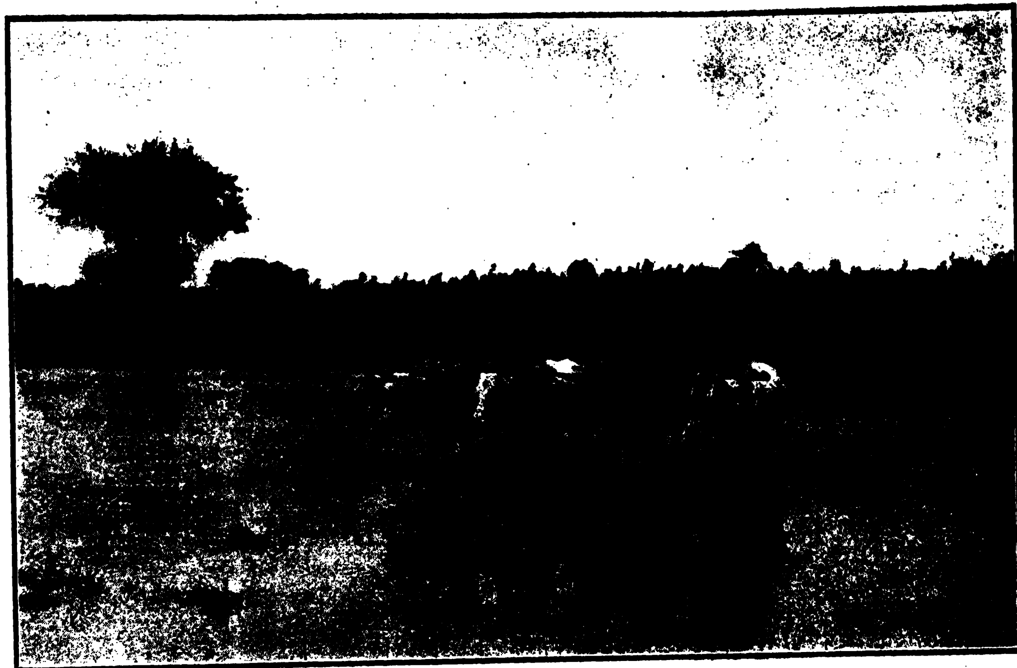
মাটী। আমনের চাষের পক্ষে অতি নিম্ন ভূমিই সুবিধাজনক; মাটী এঁটেল হওয়া চাই। ভূমি যদি উচ্চ হয় এবং তাহাতে জল না জমে সে জমি আমনের চাষের একেবারে অনুপযোগী। রুইবার সময় হইতে ধানের শীস দেখা দেওয়া পর্য্যন্ত অন্ততঃ তিন হইতে নয় ইঞ্চি জল গাছের গোড়ায় থাকা চাই। পরীক্ষার স্থলে দেখা গিয়াছে যে অন্ততঃ একবার এই জল বাহির করিয়া দিলে গাছের অনেক উপকার হয়।

চাষ। রুইবার আগেই জমি বেশ তৈয়ারী করা প্রয়োজন; অনেকে ধান কাটিবার পরেই জমি চাষ করিয়া, রৌদ্র,বাতাস খাওয়ায়, এতে জমির অনেক উন্নতি হয়, কিন্তু চাষীরা এদেশে বড় সে প্রথা অবলম্বন করে না, তাহারা জমিতে জৈষ্ঠের আগে চষা দেয় না। তাহাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে জমিতে এ সময় যে আগাছা জন্মায় তাহা পরে সারের কাজ করে। কৃষিবিভাগ মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল দিয়া বৈশাখের প্রারম্ভে চাষ দিয়া, অনেক উপকার পাইয়াছেন তাহারা ইহাতে ফলনও বেশী দেখিয়াছেন।

বীজতলা। বৈশাখ মাসে চাষ দিয়া রাখা উচিত, সেই জমিতে, গোবর,হাড়ের গুড়া প্রভৃতি সার চাষের সময় ছড়াইলে জমির খুব তেজ হয়—এই রূপ জমিতে চারা শীঘ্র বাড়ে। বীজতলায় জলসেচনের বন্দোবস্ত থাকিলে, আর বৃষ্টির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। চারা বড় করিয়া রাখিলে বর্ষার প্রারম্ভেই সেগুলিকে ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা যায়; যে বৎসর "নাবী" বর্ষা হয় সে বৎসর চারা তৈয়ারী করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া যায়—সে সময় নাইট্রেট অব সোডা বীজতলাতে ব্যবহার করিলে চারা শীঘ্র বাড়িয়া উঠে এবং এই চারা ক্ষেত্রে সময়মতন রোপণ করা যায়।

মধ্যপ্রদেশে চাষীরা ক্ষেত্রে রোপণ না করিয়া লাইন করিয়া বীজ বপন করে।

বীজতলার জন্য যে বীজ ব্যবহার করা যায় সে বীজ গুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়া চাই—বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের চাষীরা এদিকে বিশেষ কোন দৃষ্টি দেন না; বীজের উপর গাছের ফলন নির্ভর করে। সেইজন্য বীজ



আবাদ (১)



আবাদ (২)

নির্ব্বাচন বিশেষ প্রয়োজন। বিহার সরকার এই নির্ব্বচনের জন্য অনেকগুলি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

একটী খুব সরু চালুনিতে বীজগুলি রাখিয়া সেগুলি ঘষিতে আরম্ভ করা হয়, সরু দানাগুলি নীচে পড়িয়া যায়, এবং বড় দানাগুলি বপন কার্য্যের জন্য ব্যবহার করা হয়। আর একটী উপায় সাধারণতঃ অবলম্বন করা হয়—একটী লবণাক্ত জলের পাত্রে বীজগুলি নিক্ষেপ করিলে যে বীজ ভাসিয়া উঠে তাহা কাজের বাহির বলিয়া বাতিল করা হয় এবং যেগুলি ডুবিয়া যায় সেইগুলিই বীজস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

শেষোক্ত উপায়ে নির্ব্বাচিত বীজের, গাছে ফল শতকরা ১১ভাগ বেশী পাওয়া গিয়াছিল। একাজ শ্রমসাধ্য বটে, কিন্তু ফসলের পরিমাণ বেশী পাওয়া যায় বলিয়া মজুরী পোষায়।

আমন সাধারণতঃ "রুইবার" নিয়ম, কিন্তু কোন কোন জেলায় বীজ "বুনিয়া" দেয়। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় যেখানে উচ্চভূমির পরিমাণ অধিক সেখানেই এই প্রথা দেখা যায়—এই প্রথায় অনেক বীজের প্রয়োজন এবং নীড়ানীর খরচও অধিক—আর ফলনও কম হয় কিন্তু জলের অভাবের জন্যই এই প্রথা অবলম্বন করিতে চাষারা বাধ্য হয়।

বীজতলা করিলে ১০ হইতে ১১ সের বীজের প্রয়োজন হয় কিন্তু বুনিতে বিশ হইতে ত্রিশ সেরের প্রয়োজন।

একবিঘা জমির চারা - ১০ বিঘা জমিতে রুইবার পক্ষে যথেষ্ট।

চারা যত শীঘ্র রুইতে পারা যায় ততই ভাল। চারা তুলিবার সময় অতি সাবধানে আস্তে টানিয়া তুলিতে হয়। জমিতে একবার সেচ দিয়া তুলিলে চারা অনেক কম নষ্ট হয়।

যদি সমস্ত তোলা চারা সেদিন রোয়া না যায় তাহা হইলে সেগুলিকে মাটী দিয়া একটী আর্দ্র স্থানে রাখিলে ভাল থাকে।

রুইবার জমি, উত্তমরূপে প্রস্তুত করার দরকার – পরে সেই জমিতে বেশ করিয়া কাদা করা উচিত—এই কার্য্য আমাদের দেশে একরকম ছোট লাঙ্গলে হয় তাহাকে কাদার লাঙ্গল বলে। জমিতে সেই সময় জল কিছু থাকা দরকার। বৃষ্টি যেদিন খুব পড়ে, সেইদিন রোয়া উচিত, তাহা হইলে গাছগুলি শীঘ্র 'ধরিয়া' যায় এবং সতেজ হয়। চারাগুলি অন্ততঃ একমাসের হওয়া দরকার। যত শীঘ্র ধান রোপণ করা যায় ফলন ততই বেশী হয়—কারণ বৃষ্টি যদি শীঘ্র ধরিয়া যায় এবং সেই সময়ের মধ্যে যদি গাছগুলি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে ফলন সুবিধাজনক হয় না, কথায় বলে—

"আষাঢ়ে পঞ্চদিনে রোপে যদি ধান।
সুখে থাকে কৃষিকার্য্য বাড়ে সম্মান॥"

এই প্রবাদ বাক্য যে সত্য তাহা সরকারী কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষিত ফলে বেশ বোঝা যায়।

এই রোপন কার্য্য আমাদের দেশে মেয়ে কৃষানেই ক'রে থাকে, ১০টী স্ত্রীলোকে তিন বিঘা জমি একদিনে রুইতে পারে।

সাধারণ চাষীরা রুইবার সময় অনেকগুলি ঝাড় এক সঙ্গে পুতিয়া যায়, ইহাতে কাজ শীঘ্র শেষ হয় বটে কিন্তু গাছের ফলন অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং অনেক বেশী চারার প্রয়োজন হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে পৃথকভাবে জমিতে এক একটি করিয়া চারা পুতিলে তাহার ফল অত্যন্ত সন্তোষজনক হয়, কিন্তু এজন্য জমিতে সার প্রয়োগ দরকার। তবে সাধারণ জমিতে এক এক ঝাড়ে তিন চারিটী করিয়া চারা থাকিলে ফলনের কোনই ক্ষতি হয় না—ঝাড়ের মধ্যে ছয় হইতে নয় ইঞ্চি ব্যবধান থাকা দরকার।

আমনের চাষে রোপনের পর প্রয়োজনমত একবার বা দুইবার নিড়েনি নজর ভিন্ন দিতে হয় না।

বিহার প্রদেশে "নিগার" প্রথায় চাষ হয়। এই প্রথায় রুইবার কিছুদিন পরে মাঠের জল বাহির করিয়া দেয়। পরে আবার আশ্বিন মাসে ধানের শীষ যখন বাহির হয় তখন আবার খাল হইতে জল তুলিয়া মাঠে ঢোকায়। এ প্রথা যে দেশে জল সেচের ব্যবস্থা আছে সে দেশেই সম্ভব। আমন ধান কাটিবার পরেই আউশের মত ঝাড়িবার প্রয়োজন হয় না –সমস্ত শীতকাল ধরিয়া চাষীরা সুবিধামত ধান ঝাড়িয়া গোলাজাত করে।

আমনের খড় মোটা, পরিমাণেও যথেষ্ট পাওয়া যায় বিঘা প্রতি ১ হইতে দেড় কাহন খড় পাওয়া যায়—বিঘায় ধানের পরিমাণ ভাল জমিতে ১০,।১২ মণ পাওয়া যায়। সারের ব্যবহারে ১৫।১৮ মণ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

দার্জ্জিলিং এবং ডুয়াসে' চা'র আবাদ

ভারতে চা চাষ করিবার জন্য ভারতবর্ষে যে সকল লিমিটেড কোম্পানী কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের মূলধন প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। তাহার মধ্যে ৩৬ কোটি টাকা খাস বিলাতের লোকের অর্থাৎ তাহার সহিত ভারতের লোকদিগের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। বাকি ৯ কোটি টাকার কতকাংশ ভারতবাসীর। ভারতবর্ষে মোট ৭ লক্ষ ৬ হাজার ২ শত একর (প্রায় ২১॥০ লক্ষ বিঘা) জমীতে চায়ের আবাদ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে আসামে ৪ লক্ষ ১২ হাজার ৯শত একর, বাঙ্গালায় ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬ শত একর, দক্ষিণ ভারতে ৯৭ হাজার ৮ শত একর, উত্তর ভারতে ১৫ হাজার ৮ শত একর এবং বিহার উড়িষ্যায় ২১ শত একর, জমীতে চায়ের চাষ হয়। এই চা'র চাষে যে লাভ হয়, তাহার শতকরা ৮০ টাকারও অধিক বিদেশে চলিয়া যায়, অথচ চা চাষের সকল কাজই এদেশে হইয়া থাকে। আমাদের প্রত্যেক ভারতবাসীকে সেই দিকে নজর দিতে হবে।

সম্প্রতি দার্জ্জিলিং এবং ডুয়ার্স এই উভয় জিলার সমস্ত চা বাগান পরিদর্শন করিয়া মিঃ উইলকিন্সের একখানি সুন্দর রিপোর্ট প্লাণ্টার্স গেজেটেও এগ্রিক্যাল চরিষ্ট পত্রিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নিম্নে তাহাই বিবৃত করা হইল। তিনি যে সমস্ত বাগানগুলি পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিয়াছেন সে গুলি উক্ত জিলাদ্বয়ের মধ্যে আদর্শ চা বাগান বলিলেই চলে।

এই সমস্ত স্থান পরিদর্শন করিতে গিয়া প্রথমেই নজর পরে এক স্থান হইতে অন্যস্থানের অত্যধিক দূরত্ব। টোক্‌লাই নামক স্থানে উপস্থিত হইতে প্রায় চারিদিন সময় লাগে। ডুয়ার্সেও এইরূপ একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে বহুসময় প্রয়োজন হয়। দার্জ্জিলিং পৌছিবার পূর্ব্বে প্রাকৃতিক দৃশ্যও নিতান্ত একঘেয়ে—কেবল বড় বড় ধান ক্ষেত। কিন্তু দার্জ্জিলিংএ পৌছিয়া যে সুন্দর দৃশ্য, পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় উচ্চ পর্ব্বত কাঞ্চনজঙ্ঘা ও সুশ্রী মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা সহজে ভুলিবার নহে। টোক্‌লিতে গিয়া প্রথমেই চা বাগানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার গুহ্য তত্ত্ব আয়ত্ত্ব করা বড় সহজ পরিশ্রমের কার্য্য নহে। পরীক্ষা আরম্ভ করিতে হইলে সমতল ভূমি সমতল আকাশ ও সমপরিমাণ শস্যদায়ী বাগানের প্রয়োজন।

ভারতীয় জমির উৎপাদক শক্তি।

বর্ত্তমান ভারতীয় কৃষকগণের সৌভাগ্য যে নূতন চিন্তা ও নব নব পরীক্ষার জন্য তাহারা প্রথম হইতেই কার্য্যারম্ভ করিতে অনেক উপদেশ পাইয়া থাকে।

সিলোনের চা বাগানের উৎপাদক শক্তির তুলনায় ভালরূপ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এই সকল জিলার উৎকর্ষতা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অনেকে কতগুলি জমি সম্বন্ধে বলেন যে তাহাতে নাকি চা উৎপন্নকারী প্রধান উপকরণের অভাব কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল যে সেই সব জমিতে অত্যন্ত অধিক ঝাড় ঝোপ জন্মিয়াছে। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে এই গুলি সুপরিচিত সিলোন আগাছা।

চা আবাদকারীর জীবনের কাঠোরতা।

সাধারণতঃ আবাদকারীদের জীবন এই সমস্ত জেলায় বাস্তবিকই কঠোর। সিলোনে যাহারা থাকেন তাহাদিগকে ভারতের উত্তরাঞ্চলের এই সমস্ত জিলায় বদলী করিলে তাহাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়িবে—সন্দেহ নাই। এই সকল স্থানের আবহাওয়া বড়ই অসহ্য এবং অস্বাস্থ্যকর। সকলকেই প্রায় প্রত্যহ কুই নাইন ব্যবহার করিতে হয়। ভয়াবহ শঙ্কাজনক ম্যালেরিয়া জ্বরের এইখানে যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব।

অনেকগুলি বাগান অত্যন্ত নির্জ্জন এবং ব্যবসায়কেন্দ্র কলিকাতা নগরী হইতে বহুদূরে অবস্থিত। কলিকাত

যাতায়াতের এত খরচ ও উহ. এত বিরক্তি জনক যে সহজে গমনাগমন করা এক প্রকার অসম্ভব। ট্রেনের সুবিধা নাই, রাস্তাঘাট ও ভাল নহে এবং টেলিফোনের ও বন্দোবস্ত নাই। সামনে বাজার হাট নাই - ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি কলিকাতা হইতে সরবরাহ করিতে হয়—কাজেই টাটকা খাদ্য দ্রব্যাদি পাওয়াই যায় না। সাহেবদের বাস ভবন বর্ত্তমান কালোপযোগী নহে। কুলিদের ত কথাই নাই। পোলো এবং টেনিস্ প্রভৃতি খেলিবার এবং সাধারণের সহিত মেলা মেশা করিবার জন্য ক্লাব গৃহ আছে কিন্তু অধিকাংশ সভ্যের পক্ষেই রীতিমত ক্লাবে গমনাগমন সুবিধাজনক ও সম্ভব হইয়া উঠে না—বিশেষতঃ বর্ষাকালে ত একপ্রকার অসম্ভব কারণ বর্ষাকালে পথ ঘাট একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে। এইরূপ জীবন অশ্বারোহন পটু অবিবাহিত ব্যক্তিগণের পক্ষে হয় ত মন্দ নহে কিন্তু বিবাহিত জীবনে এই স্থানে থাকা এক প্রকার অসম্ভব। স্ত্রীলোকদের জীবন আরও দুর্ব্বহ। সিলোনে চা-বাগানের সাহেবরা যতটা আরামে থাকে সে তুলনায় এখানকার জীবন বাস্তবিকই দুঃসহ। তবে মানুষ এত সহজেই এই জীবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে এইরূপ কঠোরতার জন্য কেহ কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করে নাই। সিলোনের তুলনায় বেতনও বেশী নহে তবে কমিশন সমধিক পাওয়া যায়।

ডুয়ার্স এবং আসামে চা ঝাড়।

ডুয়ার্সের চা-বাগানের উপরি ভাগ চমৎকার সমান কিন্তু তলভাগ আসামের চা-বাগানের মত অত সমতল নহে। এখানে পাতা পূর্ণ হইলে সংগ্রহ করা হয়। সিলোনে যেরূপ উচ্চ—(Cone like) ঝাড় দেখিতে পাওয়া যায় এখানে তদ্রূপ দেখা যায় না। টোকলের চা-বাগানের বিচক্ষণগণের মতে সমতল ঝাড় অধিকতর ফলদায়ী।

কুলি লাইন গুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে নির্ম্মাণ। এখানকার মাটিতে প্রায় ৬" ইঞ্চি নিম্নে পাথর এবং নুড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। এই জেলাগুলিতে বাৎসরিক প্রায় ১৮০" ইঞ্চি পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। এ জেলাগুলিতে গ্রীষ্ম আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি পড়ে। শীত কালেই বৃষ্টির অভাব হয়।

প্রধান রাস্তাগুলি অত্যন্ত শোচনীয় তবে আসামের পথের মত অত মন্দ নহে। আসামের পথগুলি এত খারাপ যে এক পেটীর বেশী চা বোঝাই গাড়ী অনেক সময় পথ দিয়া লইয়া যাইতে পারা যায় না। অনেক স্থানে সুনির্ম্মিত শেড দেখিতে পাওয়া যায়। দাদাপ নামক স্থান তত সুবিধাজনক নহে—এখানে নানা প্রকার ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ওখানে যে কয়টী গাছ দেখা গিয়াছে তাহা সিলোনের জাতি অপেক্ষা বিভিন্ন। এই সকল স্থানে সাময়িক চেরা বীজের ফসল (coppiced legumens) প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। বোগা এবং গরুর ব্যবহার্য্য মটর প্রভৃতির চাষ দেখা যায়। বড় গাছের ছায়াতে জমির সিক্ততা অধিক নষ্ট হয় অথচ চেরা বীজের উৎপাদনেই অধিক ক্ষতি হয়। এই পরীক্ষাতে টোকলেতে দেখা গিয়াছে যে বড়গাছের ছায়াতেই কম ক্ষতি হইয়া থাকে।

ক্ষতিকর আগাছা

কতগুলি বাগানে আগাছার বৃদ্ধির পরিমাণ বাস্তবিকই সিলোন-আবাদ-কারীদের চক্ষে শঙ্কাজনক। অনেকের অভিমত এই যে জমিতে অত্যাধিক জঙ্গল হইলে চা-চারার ঝোপগুলি উন্নতি লাভ করিতে পারে না. এতদ্ব্যতীত চাষারাও চা-সংগ্রহ কার্য্যে অনিচ্ছুক হইয়া পড়ে।

সিলোন চা বাগানে রসশোষক কীট জন্মায় কিন্তু এখানে অত অধিক জন্মিতে পারে না। সিলোনে আগাছা নষ্ট করিবার খরচ অপেক্ষা এই পোকা বিনাশ করিবার খরচ অনেক অধিক। যদি সিলোনে অনবরত এইরূপ খরচ করিতে হয় তবে সেখানে চা-বাগানে অধিক দিন ফসল পাওয়া বোধ হয় অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

পুরাতন চা সরবরাহ কার্য্য এখানে একটা সাধারণ নিয়ম। এই কার্য্য এখানে বেশ সফল ভাবে করা হয়।

হেলোপেল্টিস্ নামক একজাতীয় মশক এখানে খুব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কেলানি উপত্যকায় এই মশক যেরূপ ক্ষতি করিয়াছিল এখানেও তাহারা তদ্রূপ ক্ষতি করে। এই মশকের দৌরাত্ম্যে

এখানে লক্ষ লক্ষ মণ চা নষ্ট হইয়া যায়। পাতা-বিনষ্টকারী পোকাও এখানে যথেষ্ট।

সিলোনে যেরূপ সার দেওয়ার প্রণালী আছে এই জিলাগুলিতে তদ্রূপ নাই। অবশ্য এখানকার জমি এত উর্ব্বর যে অধিক সার ব্যবহার করা প্রয়োজন হয় না। অনেক চা বাগানের মালিকেরা বলেন যে প্রতি তিন বিঘায় ২০৲ টাকার অধিক খরচ না করিলেও চলে। সার আনয়ন করাও কষ্টসাপেক্ষ। যে মিশ্রিত সার সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাহাও ভালরূপ পরিমাণমত মিশ্রিত করা হয় না।

(প্রুনিং)

[redacted]কার্য্য সাধারণতঃ খুব উচ্চ এবং—আনত'ভাবে করা হয়। ঝোপগুলি ২৮" ইঞ্চি হইতে ৩০" ইঞ্চি এবং গাছগুলি শ্লট পেন্সিলের মত। কোলার প্রুনিং—এমন ভাবে করা হইয়াছিল যে শতকরা প্রায় ২৫টী গাছ মরিয়া গিয়াছিল। প্রত্যেক ঝাড়ই সমান করিয়া নিড়ান হয়।

চা প্রস্তুত কার্য্যের প্রথম মুস্কিল এই যে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণ শস্য চালান করিতে হয়। যন্ত্রপাতি যথেষ্ট ব্যবহার করা হয় বটে কিন্তু কার্য্যের অনুপাতে তাহা মোটেই বেশী নয়। বরং এত কম যে সিলোনী প্রথা অবলম্বন করিলে এই যন্ত্রপাতিতে কিছুতেই কুলাইত না।

কারখানা।

কারখানার বন্দোবস্ত আদর্শ অনুযায়ী নহে। ইহাতে অধিক পরিমাণে চা বিনষ্ট হইয়া যায়। রোলারগুলি অতিশয় জোরে চালিত হয়। জ্যাকসনের র‍্যাপিড রোলারই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক মিনিটে প্রায় ২০।৩০ বার রোলার টানা হয়। একটী ব্যতীত অন্য সমস্ত উইদার্স গুলি সিলোনের তুলনায় শতকরা ২৫।৩০ ভাগ অধিকতর সবুজ। কলের বাহিরে শুষ্ক করিবার বংশনির্ম্মিত অনেক চাং আছে।

সমস্ত চা পাতাগুলিই মধ্যম জাতীয়। সেগুলি খুব শক্ত নহে—কতকগুলি প্রথম দৃষ্টিতে দেখিলে যত তন্তুপূর্ণ বলিয়া মনে হয় তদপেক্ষা অধিক তন্তুপূর্ণ। রাসায়নিক প্রথায় শুষ্ক করিবার প্রণালী যথেষ্ট প্রচলিত। এই প্রণালী অনুসারে চাপাতা অধিকক্ষণ শুষ্ক করিবার জন্য রাখা হয় না। তবে ইহার মূলকারণ বোধ হয় এই যে একপ্রস্থ চাপাতা তাড়াতাড়ি না সরাইলে দ্বিতীয়প্রস্থের স্থান হয় না।

এখানকার রোলার দিয়া চূর্ণ করিবার প্রথা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে হয় না। স্থানীয় হস্তনির্ম্মিত এক প্রকার যন্ত্র অথবা একপ্রকার পুরাতন ছোট যন্ত্র এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। অনেক কারখানায় আবার এইরূপ যন্ত্রও নাই।

ফারম্যানটেসান—বিশেষ কার্য্যকারী বলিয়া বিবেচিত হয়। এই কার্য্য অন্ধকার গৃহের মেঝেতে অল্পবিস্তর পুরু করিয়া বিছাইয়া দিয়া করা হইয়া থাকে। এই প্রণালী সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে।

উত্তাপ দিবার জন্য অত্যধিক তাপ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ২৪০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ দেওয়া হয়। এতদুদ্দেশ্যে বড় বড় যন্ত্র ব্যবহার হয়। সুবৃহৎ প্যারাগন যন্ত্রই বোধহয় এতদঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম যন্ত্র।

স্থানীয় রোটার সিফটার।

একটী কারখানা ব্যতীত অন্য সমস্ত কারখানাতেই ঐ অঞ্চলে প্রস্তুত সিফটার প্রচলিত আছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে সিলোনে যে প্রথায় গুণানুসারে চা বিভাগ করা হইত এখানে এখনও সেই প্রথাই অবলম্বিত হয়।

অধিকাংশ চা ই দেখিতে সুন্দর এবং খাইতে সুস্বাদু। কিন্তু তাহারা সিলোনে প্রস্তুত মধ্যমজাতীয় চায়ের বিশেষত্ববিহীন। এখানকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চা দ্বিতীয়বার শুষ্ক করিবার পরই ব্যবহার করা হয়—অনেকের মতে ইহা সমীচিন নহে।

দার্জ্জিলিং

এই জেলাতে চা প্রস্তুতপ্রণালী অন্য জিলার তুলনায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। এখানকার সমস্ত সাজসরঞ্জামই অন্য স্থানের তুলনায় ক্ষুদ্রতর। অধিকাংশ বাগানের আকার ছোট। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাগানগুলি অত্যন্ত ঢালু

জায়গায় অবস্থিত থাকার দরুণ তাহাতে যাতায়াত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কতকগুলি রাস্তা একান্ত অচল।

এই স্থানের মাটিতে নাইট্রোজেন কম কিন্তু পটাশ এবং ফসফরিক এসিড যথেষ্ট। মাইকা প্রায় সমস্ত জমিতেই দৃষ্ট হয়। এখানকার চা বাগানগুলি সমস্তই অত্যন্ত খাড়া পাহাড়ের উপর থাকে থাকে অবস্থিত। কোন কোন বাগানের উচ্চতম স্থান ও সর্ব্বনিম্ন স্থানের মধ্যে অসাধারণ দূরত্ব। বাগানগুলি সাধারণতঃ অল্প পরিসর লম্বা। এই জিলাতে টিরাই এবং পাহাড়ের নিম্ন সমতল ভূমি লইয়া মোটের উপর চল্লিশ হাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার একর জমিতে চায়ের বাগান আছে কিন্তু ইহার এক তৃতীয় অথবা এক চতুর্থাংশ স্থানেই ভাল সুগন্ধযুক্ত চা প্রস্তুত হয়। প্রতি একরে মাত্র ৩০০ পাউণ্ড চা জন্মায় কাজেই এই স্থান চা উৎপন্ন হিসাবে পৃথিবীর চা বাজারে বিশেষ প্রাধান্য পাইতে পারে না।

উপসংহার।

উক্ত জেলাগুলিতে যে সমস্ত লোক আপনাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া এরূপ ভাবে কষ্ট স্বীকার করিয়া পতিত বনভূমিকে আবাদ করিয়া সাম্রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করিতেছেন তাহারা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। এই সমস্ত সুদূরাগত মহোদয়গণ সত্যসত্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ।

কুমড়া, শশা ইত্যাদি আবাদ।

শ্রীচাষী।

শশা, কুমড়া, ফুটি জাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে প্রায় একই প্রকারের চাষ ও সার প্রয়োজন।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে এই সকল ফসলগুলি ঋতু বিশেষেই পাওয়া যায় কিন্তু তাহা ঠিক নহে। উক্ত ফসলগুলি বৎসরের সমস্ত ঋতুতেই রীতিমত চাষ করিলে পাওয়া যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ইহার মধ্যে সচরাচর কতকগুলি বারমেসে ফসলের গাছ পাওয়া যায়।

ইহাদের জন্য বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে জমি প্রস্তুত করিয়া রৌদ্র-কিরণ যাহাতে পাইতে পারে এমন অবস্থায় মাটিতে গর্ত্ত করিয়া বীজ রোপন করিতে হয়। জমি যদি ঋতুর প্রথম দিকেই প্রস্তুত করা সম্ভব না হয় তবে যে জমিতে বীজ বপন করা হইবে তাহাতে শুষ্ক ঘাস পাতা গোবর প্রভৃতি পোড়াইয়া তাহার ছাই মাটির তলায় চাপা দিয়া রাখিলে ভাল ফল হইবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে অথবা আষাঢ় মাসের প্রথমভাগে জমিতে বীজ বপন ও জল সেচ করা কর্ত্তব্য। দুইটী চারার মধ্যে অন্ততঃপক্ষে দুই ফিট দূরত্ব থাকা প্রয়োজন। এই চারাগুলি সাধারণতঃ মাচায় এবং নীচেও জন্মায়। একাধিক জাতীয় ফসলের চারা একই মাচাতে একই স্থানে রোপন করা চলিবে না—ভিন্ন ভিন্ন ফসলের জন্য ভিন্ন স্থানে পৃথক মাচা করিয়া দিতে হইবে। লাউ এবং কুমড়ার মাচা খুব শক্ত হওয়া দরকার।

বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ জল সেচন করা উচিত।

গাছ একবার লতাইয়া উঠিতে থাকিলেই আধ গ্যালন জলে এক মুষ্টি আন্দাজ নাইট্রেট্ অব্ সোডা গলাইয়া সেই জল প্রত্যেক তিন চারিটী চারায় সেচন করিতে পারিলে গাছগুলি খুব সতেজ হইবে। ইহাতে অনাবৃষ্টি অথবা অতিবৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইয়া গাছগুলি বেশ বৃদ্ধি পাইতে পারিবে। সার হিসাবে এই সব গাছের জন্য গোবর যথেষ্ট পরিমাণে দিলেই চলে।

চারা যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে তখন ফুল ধরিবার পূর্ব্বে প্রতি চারাতে এক মুঠা গোবর এবং এক মুঠা সুপার ফসফেট সারের ব্যবহারে অতিশয় উপকারজনক ফল হইবে। উক্ত মিশ্রিত সার গাছের গোড়ার অতি সন্নিকটে দেওয়া উচিত নয়—৬ হইতে ৮ ইঞ্চি দূরে জমিতে চারিদিকে ছড়াইয়া দিলেই ভাল হয়। ফল কাটা ব্যতিরেকে ইহার পর অন্য কোন পরিশ্রম বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। প্রথম ফসলগুলি বীজ করিবার জন্য রাখা উচিত নহে।

Radish (মূলা), ঢেরস এবং Gowor প্রভৃতি।

এই সকল ফসল গুলিও সকল ঋতুতেই জন্মান যাইতে পারে। খারাপ বীজ ব্যবহার করা কখনই উচিত নহে। ভাল পরীক্ষিত বীজ ব্যবহার করিলে যথেষ্ট পরিমাণে লাভ হইতে পারে। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে বীজ বপন করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে ফসল পাইতে হইলে মাঘ ফাল্গুন মাসেই বীজ বপন করা উচিত।

বীজ বপনের পূর্ব্বে ভাল করিয়া জমি পাট করিতে হইবে। অন্ততঃপক্ষে একবার লাঙ্গল দিয়া বার দুই মই দেওয়া একান্ত দরকার। মাঝে মাঝে আগাছাগুলি তুলিয়া ফেলিতে হইবে নতুবা গাছের পক্ষে ক্ষতিজনক হইতে পারে। ঢেরস এবং গোয়ারের বীজ একেবারেই জমিতে রোপণ করা উচিত। মূলার বীজ বপন করিবার ভাদ্র মাসই প্রশস্ত সময়। রীতিমত যত্ন করিলে এই ফসলগুলি হইতেও যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়। বোম্বাই প্রদেশে অনেক কৃষক কেবল এই সব ফসলের চাষ করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। বৎসরে তিনবার করিয়া এই ফসল পাওয়া যাইতে পারে। বর্ষা ঋতুর ফসল জ্যৈষ্ঠ মাসে, শীতের ফসল ভাদ্র আশ্বিন মাসে ও গ্রীষ্মের জন্য পৌষ মাঘ মাসে বীজ রোপণ করা যাইতে পারে। নিম্নলিখিত সার গোবর মাটির সঙ্গে ব্যবহার করিলে চারা গাছের বিশেষ উপকার হইবে।

নাইট্রেট্ অব্ সোডা	প্রতিবিঘা জমির জন্য		২৫ সের
সুপার ফস্ফেট	”	”	”
সালফেট অব্ পটাস্	”	”	১৩ সের

এইরূপ মিশ্রিত সার ৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থিত মেসার্স ইউল এণ্ড কোম্পানির নিকট অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

শীত এবং গ্রীষ্মের ফসলের জন্য যদিও জল সেচনের দরুণ কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় হইবে তথাপি তাহাতে লোকসান হইবে না।

এই সকল ফসলের ভাল করিয়া চাষ করিলে শতকরা একশত টাকা লাভ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

সুখচরের মেলা।

১

সে জন্মেছিল রাজার ঘরে—রাজার ছেলে হোয়ে।
তার সঙ্গে যার ভাব হোল সে চাষার মেয়ে।
মুখের আলাপ তাদের কোনও দিন হয়নি।

দেখা হোলে দুজনে কেবল চেয়ে থাকতো দুজনার পানে।

সন্ধ্যাবেলায় রাজার ছেলে সঙ্গীদের সাথে প্রাসাদের ছাদে বাজপাখী নিয়ে খেলতো।

এমন সময় গোধুলির মলিন আলোর মাঠের থেকে ঘরে ফিরতো চাষার মেয়ে সঙ্গিনীদের সাথে।

যদি তাদের মিলন হোত চোখে চোখে; তবে রাজার ছেলে বাজের পায়ের সোণার শিকল হাতে অবাক হোয়ে চেয়ে থাক্‌তো।

চাষার মেয়ে থমকে দাঁড়াতো অশোক বনের গন্ধভরা অন্ধকারে।

রাজার ছেলের সঙ্গিরা হাসতো মুখ টিপে।

চাষার মেয়ের সঙ্গিনীদের হাসি চম্‌কে দিত বেলা শেষের স্তব্ধ আকাশের বুক।

২

এমনি কোরে তাদের পরিচয় দিন দিন ঘনিয়ে ওঠে।

রাজার ছেলে রাজসভায় বসে দূরে গরুর গলার ঘণ্টা শোনে আর কাজ ভুল হোয়ে যায়। মন্ত্রী অসন্তুষ্ট হয়।

চাষার মেয়ে ধান ভানতে ভানতে দূরে মাঠের পারে অশোক বনের ফাঁকে রাজপ্রাসাদের চুড়ো দেখে আর তার হাত চলে না—কাজ বন্ধ হয়।

তার মা তাকে বকে।

রাণী বল্লেন রাজাকে "ওগো ছেলের তো বয়েস হোল এইবার বৌ আন ঘরে।"

রাজা বল্লেন 'আচ্ছা।'

ছেলে মুখ ভারি কোরে উঠে গেলো সেখান থেকে।

চাষার মেয়ের বয়েস হোয়েছে বর জোটেনা। চাষা বল্লে "কাল আমি ছেলের খোঁজে বেরব।"

চাষার মেয়ে সারা রাত কাঁদলে ছেঁড়া কাঁথায় মুখ লুকিয়ে।

৩

সুখচরেতে চৈত্র পূর্ণিমার মেলা বসেছে।

রাজার ছেলে চলেছে মেলা দেখতে, সঙ্গে লোক লস্কর পাইক পেয়াদা।

চাষার মেয়ে চলেছে সঙ্গিনীদের সাথে মেঠো পথে।

রাজার ছেলে যায় সহরের পথে—চাষার মেয়ে যায় পায়ে হাঁটার পথে—গানের সুরের তালে তালে।

রাজার ছেলে হাতির পিঠে হাওদায় বসে সেই সুর শোনে।

এবার নাকি সুখচরের চৈত্র পূর্ণিমার মেলায় কোথাকার কোন সাধু এসেছেন।

রাজার ছেলে গেল তাঁর কাছে নিজের ভাগ্যের লিখন জেনে নিতে।

চাষার মেয়েও এলো তার অদৃষ্টলিপি পড়িয়ে নিতে।

দুজনের দেখা হোল। কিসের জন্যে এসেছে সাধুর কাছে তা ভুলে গেল তারা। সাধু হাসলেন।

৪

সুখচরের চৈত্র পূর্ণিমার মেলা ভেঙেছে।

ফেরার পথে সবাই চলেছে। কেবল ফিরল না রাজার ঘরে রাজার ছেলে আর চাষার কুঁড়েতে চাষার মেয়ে।

তাদের মেলা ভাঙেনি আরম্ভ হোয়েছে।

শ্রীইন্দুব্রত শর্ম্মা।

কৃষি সম্পদ—'গোধন'।

গবাদি পশুর বর্ত্তমান অবনতির কারণ ও উহার উন্নতি বিধানের উপায়।

গরু ভিন্ন আমাদের এক দণ্ড চলে না। যে ধানের ভিতর বাঙ্গালীর জীবনদায়িনী শক্তি নিহিত আছে তাহার চাষ আবাদ গোজাতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। গরু আমাদের শুধু অন্নদাতা নহে। ইহারা নানাবিধ ফসল উৎপন্ন করিয়া মাঠ হইতে গোলা, গোলা হইতে হাট বা বাজারে বহন করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের সহায়তা করে। গরুর সহিত কৃষি কার্য্যের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে উভয়ের সাহায্য ব্যতীত কৃষিজাত খাদ্য সামগ্রী উৎপন্ন করা একরূপ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। স্বল্প ব্যয়ে কৃষি পরিচালনা একমাত্র বলদ দ্বারাই সম্ভব। লাঙ্গল টানা, বিঁদে দেওয়া, মই দেওয়া, কাদা করা, গাড়ী টানা, ঘানী টানা, কূয়া হইতে সেচনের জল তোলা প্রভৃতি ধীর পরিশ্রমের কার্য্য গোজাতির দ্বারা সমাহিত হইয়া থাকে। অনেকে হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে পাশ্চাত্য দেশে যখন অশ্বের দ্বারা কৃষিকার্য্য সাধিত হয়, তখন আমাদের দেশে বলদের পরিবর্ত্তে অশ্বের সাহায্য কেন লওয়া হয় না? অশ্ব বলদ অপেক্ষা বলবান ও দ্রুত গমনে পটু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কষ্টসহিষ্ণুতায় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। উষ্ণ প্রধান দেশের প্রচণ্ড রৌদ্রে, বর্ষার জলে, কাদায়, ঘোড়া অধিক কাল ধীর পরিশ্রমের কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। এতদ্ব্যতীত আমাদের দরিদ্র দেশে অশ্বের খাদ্যাভাব হইয়া থাকে। গোজাতির খাদ্য—যথা বিচালী, ভূষা, ভূষি, খৈল, ভাতের ফেন প্রভৃতি স্বল্পাধিক পরিমাণে সকল গৃহস্থের ঘরে কিছু না কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু তাহার দ্বারা অশ্বের জীবন রক্ষা ও পুষ্টি সাধন হইতে পারে না। প্রখর রৌদ্রে অথবা বৃষ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতে কাদার ভিতর বলদ যেমন নির্ব্বিবাদে পরিশ্রম করিতে পারে সেইরূপ অপর কোন গৃহপালিত পশু তুলনায় ইহাদের সমকক্ষতা করিতে পারে না। কোন কার্য্যে ঘোড়ার মত, বলদের সাজ সজ্জার প্রয়োজন হয় না। উহাদের ভগবান দত্ত "কুকুদ" বা "ঝুঁট" (hemp) যেমন অঙ্গের শোভা বৃদ্ধি করে সেইরূপ বিভিন্ন সাজ সজ্জার ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া দরিদ্র কৃষকের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া থাকে। এই সকল নানা কারণে বলদ কৃষি কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া আমাদের জীবন সংগ্রামে সহায়তা করিয়া আসিতেছে।

বলদ না হইলে আমাদের কৃষিকার্য্য কোন মতে চলিতে পারে না। এজন্য সকল কৃষককে বাধ্য হইয়া বলদ রাখিতে হয়। যাহা বলদের খাদ্য তাহাই গাভীর আহার। খাদ্য শস্যের পরিত্যক্ত অব্যবহার্য্য অংশগুলি যথা বিচালী, ভূষা, ভূষি, ডালের খোলা, ক্ষুদ, ফেন পল্লীগ্রামে সকলেরই ঘরে কিছু না কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, এজন্য বলদের সহিত ২।৪টী গাভী প্রতিপালনে কাহারও অসুবিধা হয় না। গোলক্ষ্মী ঘরে থাকিলে আমরা অতি পুষ্টিকর খাদ্য দুগ্ধ অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারি এবং তাহারা সন্তান প্রসব করিয়া কৃষকের অনেক অভাব মোচন করিয়া থাকে। ইহাদের গোবর চোনা সারে পরিণত করিয়া ক্ষেত্রে প্রদান করিলে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়া মানুষ গরু উভয়েরই যে মহৎ উপকার সাধিত হয় তাহা একমাত্র গবাদি পশুর সহযোগিতা ভিন্ন অপর কোন গৃহপালিত পশুর দ্বারা সম্ভব নহে। যে দেশে শতকরা ৮০ জন লোক হয় মুখ্যভাবে নয় গৌণভাবে কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং কৃষিজাত খাদ্য সামগ্রীই যাহাদের জীবন ধারণ ও পুষ্টি সাধনের প্রধান অবলম্বন ও যে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য কৃষিজাত দ্রব্য সামগ্রীর রূপান্তর মাত্র সেই দেশে বছর বছর শস্যহানী হইলে মানুষ গরু উভয়েরই খাদ্যাভাব হইয়া থাকে। কৃষিই ভারতের মেরুদণ্ড ও প্রধান অবলম্বন এবং নানাবিধ শিল্প বাণিজ্যের একমাত্র ভরসা। ইহার অনিষ্ট হইলে দেশের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের উন্নত কৃষি শুধু কৃষকের দারিদ্র্য মোচন করে নাই। কৃষির উন্নতির

সহিত গৃহপালিত পশু পক্ষীর উৎকর্ষ ও শিল্প বাণিজ্যের পথ সুগম করিয়া দেশের ধন, জন, বল বৃদ্ধি করিয়া প্রভৃত কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

যে প্রক্রিয়ার দ্বারা মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তিকে জাগরিত ও বর্দ্ধিত করা যায় তাহার নাম সুকর্ষণ। যে শক্তির দ্বারা লাঙ্গল,বিদা, মই প্রভৃতি কৃষিকর্ম্মাদি পরিচালিত হয় সেই গোজাতির স্বাস্থ্যরক্ষা ওশক্তি সামর্থের প্রতি সম্যক দৃষ্টি না রাখিলে মৃত্তিকা উত্তমরূপে কর্ষিত হইতে পারে না। মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তিকে বৃদ্ধি করিতে যত প্রকার উপায় আজ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হইয়াছে তন্মধ্যে সুকর্ষণই প্রধান। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে বাঙ্গালী কৃষক বিনা সারে কোন ফসল উৎপন্ন করিতে পারিত না। মৃত্তিকার যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে হইলে যেমন উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদির প্রয়োজন সেইরূপ যন্ত্র চালিত করিবার জন্য বলিষ্ঠ বলদের একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে। ভাদ্র, আশ্বিন, চৈত্র ও বৈশাখ এই চারিটী মাস গো গ্রাসের স্বাভাবিক অভাবের সময়। এই সময় যদি বলদগুলিকে পেট ভরিয়া খাইতে না দিয়া, নিষ্ঠুর ভাবে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করান যায় তাহা হইলে উহারা অতি অল্পকাল মধ্যে কঙ্কলসার হইয়া পড়ে। গোজাতি আমাদের আহার যোগাইতে, মালাদি বহনে ও কৃষি বাণিজ্যের প্রধান সহায় হইলেও খাদ্যাভাবে উহারা যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ পৃথিবীর কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর যে সামান্য পরিমাণ বিচালী প্রাপ্ত হয় তাহার দ্বারা দেহের পুষ্টি সাধন হওয়া দূরে থাকুক শুধু উদর পুরণ হয় না। যাহাদের ভাগ্যে বিচালীও জোটে না তাহারা বৎসরের অধিকাংশ কালই মাঠের শুষ্ক তৃণ ভক্ষণ করিয়া অর্দ্ধাশনে জীবন যাপন করে। আজীবনব্যাপী স্বল্পাহারে গোজাতি ধীরে ধীরে কৃশ, দুর্ব্বল হইলে উহাদের দৈহিক অবনতি ঘটিয়া থাকে। গো-বসন্ত, গলাফুলা, তড়কা প্রভৃতি ভীষণ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে এই সকল দুর্ব্বল প্রাণী সহজে আক্রান্ত হইয়া রোগ বিস্তারের সহায়তা করে ও অধিকাংশ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া কৃষির বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। চাষে উপযুক্ত সময়ে ব্যাধি সংক্রামক হইলে দরিদ্র লোকে যে কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ ও বিপদগ্রস্থ হয় তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

আমাদের জীবন ধারণ, পুষ্টি সাধন ও সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার জন্য যে সকল খাদ্য সামগ্রীর নিত্য প্রয়োজন তন্মধ্যে ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ভারতবাসীর খাদ্য দ্রব্যের তালিকায় আদর্শ খাদ্যরূপে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। যে সকল উপাদানে মনুষ্য দেহ গঠিত হয়, দুগ্ধের ভিতর সেই সকল উপাদান যথোচিত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। ডাক্তার, বৈদ্য, এবং হিন্দু শাস্ত্রকারেরা সেই জন্যই দুগ্ধকে "পূর্ণ খাদ্য" বলিয়া থাকেন। আমাদের সকলেরই পক্ষে দুগ্ধ অতি প্রয়োজনীয় উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য হইলেও শিশু সন্তান ও রোগাতুর ও বৃদ্ধের একমাত্র আহার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে দেশে এই নিত্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য দুষ্প্রাপ্য ও ভেজাল মিশ্রিত হয় সেই দেশের লোকের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। ঘৃত, দুগ্ধ, মাখন প্রভৃতি অতি পুষ্টিকর খাদ্য সমূহ আজ কাল বাংলা দেশে এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজারে খাটী বলিয়া যে দুগ্ধ, ঘৃতাদি বিক্রিত হয় তাহা এরূপ নির্লজ্জ ভাবে ভেজাল দেওয়া হয় যে কোনমতে শিশু সন্তান ও রোগাতুরকে দেওয়া যাইতে পারে না। পূর্ব্বে যে সকল অঞ্চল দুগ্ধ ও দুগ্ধ জাত খাদ্য সামগ্রীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল বর্ত্তমানে সেই সকল স্থানে ইহার অভাব হইয়াছে। গাভীর সংখ্যা অনুপাতে আমাদের যে পরিমাণ দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত খাদ্য সামগ্রী পাইবার কথা আমরা তদপেক্ষা অনেক কম প্রাপ্ত হইতেছি। সর্ব্বগ্রাসী কলিকাতার অভাবনীয় ক্ষুধার তাড়নার জন্যই হউক বা গাভী দুগ্ধশূন্য হইবার জন্যই হউক অথবা অপর যে কোন কারণেই হউক দুধ ঘি এত দুর্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে যে সঙ্গতিপন্ন লোক ভিন্ন সাধারণ লোকে মূল্য দিয়া এই খাদ্য ক্রয় করিতে পারে না। তাহারা মন বুঝাইবার জন্য দুগ্ধ বলিয়া যে পদার্থ ক্রয় করে তাহা দুগ্ধের অপভ্রংশ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। আজকাল বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধ ক্রয় করিয়া সন্তান প্রতিপালন করা মধ্যবিৎ লোকের পক্ষে একরূপ কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলার গোধন ক্রমশঃ কৃশ ও খর্ব্বকায় হইয়া দুর্ব্বল হইতেছে বলিয়া দেশে দুধের পরিমাণ হ্রাস হইতেছে। গবাদি পশুর এই অবনতির কারণ

অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে উহারা কোন একটী বিশিষ্ট কারণে এই অবস্থায় উপনীত হয় নাই। পূর্ব্বে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ভাল থাকায় বাঙ্গালী কৃষক ও সাধারণ লোকে গোপালনের যে সকল সুযোগ প্রাপ্ত হইত বর্ত্তমানে সেই সকল সুবিধা হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়াছে। দেশের নদ নদী খাল বিলাদি মজিয়া যাওয়ায় কৃষির দুরবস্থার সহিত সঙ্গে সঙ্গে গোজাতির অবনতির সূত্রপাত হয়। যদি একটু বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করা হয় তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে মাত্র ১৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলার কৃষির অবস্থা এত ভাল ছিল যে প্রতি বৎসর দেশে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত। বাঙ্গালী কৃষক ও সাধারণ লোক একাধারে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী ও গোধনের অধিকার ছিল। এই সময়ে বাংলার গাভী দৈনিক ৬।৭ সের করিয়া দুগ্ধ প্রদান করিত। কৃষির অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত গো গ্রামের অভাব হওয়ায় গরুর দুর্দ্দশা হইতে আরম্ভ হয়। এতদ্ব্যতীত যে সরল ও সুন্দর উপায়ে উহাদের অবনতির মুখ হইতে রক্ষা করা হইত সেই প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন হওয়ায় গোজাতির অবনতি পূর্ণ মাত্রায় প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। নদী মাতৃক বাংলা দেশ, অসংখ্য নদ নদী খাল বিলে পরিপূর্ণ ছিল। প্রতিবৎসর বন্যার জলে সমস্ত দেশে আবর্জ্জনাদি ধৌত হইয়া যাইত। বছর বছর বন্যার তাজা জলে ধৌত দেশের কোথাও জলাভাব বা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইত না। এতদ্ব্যতীত ঘোলাজলের ভাসান পদার্থ সমূহ থিতাইয়া মাটীতে বসিলে—মাটীর উপর "পলি" পড়িয়া মৃত্তিকায় উর্ব্বরতা বৃদ্ধির সহিত প্রচুর রসের সঞ্চার হইয়া থাকিত। এক বৎসর দেশে যে ফসল জন্মিত তাহাতে সাধারণ লোকের ২।৩ বৎসর অনায়াসে চলিয়া যাইত। বৃষ্টির অভাবে বা জলপ্লাবনে অথবা অপর কোন কারণে কৃষির ব্যাঘাৎ ঘটিলেও দেশের লোকের বা গোধনের কাহারও খাদ্যাভাব হইত না। নদী খাল বিল বার মাস তাজাজলে পূর্ণ থাকায় সর্ব্বত্র প্রচুর মৎস্যোৎপত্তি হইত। বাংলার মাটীতে বছর বছর পলি সংযুক্ত হওয়ায় বাঙ্গালী কৃষক সার না দিয়া প্রচুর শস্য উৎপাদনে এমন অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছিল যে আজও তাহারা সারের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যেমন শস্যাদি উৎপাদনে সারের ব্যবহার এদেশে অজ্ঞাত ছিল সেইরূপ দেশের সর্ব্বত্র কাঁচা ঘাসের সংস্থান আশায় কেহই গরুকে বাঁধিয়া খাওয়াইতে অভ্যস্থ হয় নাই। দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও সেই পুরাতন প্রথা অনুযায়ী যে ভাবে গরু গুলিকে মাঠে চরিতে দেওয়া হইত আজও সেই প্রথার তিল মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। ফাল্গুণ, চৈত্র, বৈশাখ মাসে মাঠের কুত্রাপি ঘাস দেখা যায় না, শুষ্ক মাঠে গরু গুলিকে স্বাধীন ভাবে চরিতে দিলে পেটভরা ত দূরের কথা, উহারা নানা সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্থ গরুর সহিত মিলিত হইয়া অকালে ধ্বংস মুখে গমন করিবার পথ প্রস্তুত করিয়া রাখে। শুধু তাহাই নহে, বিনা মূল্যে গো চর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার লোভে ধূর্ত্ত চামারেরা মৃত গোবসন্ত রোগীর দেহ হইতে পিত্ত সংগ্রহ করিয়া মাঠে ছড়াইয়া রোগ বিস্তারে সহায়তা করে। গো মড়কের সংখ্যাধিক্য ঘটিবার ইহা একটী বিশিষ্ট কারণ বলিয়া জানা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত গাভী গুলি দুর্ব্বল ষণ্ডের সহিত মিলিত হওয়ায় ক্রমেই দুর্ব্বল ও খর্ব্বাকৃতি বাছুর প্রসব করিয়া দেশের অনিষ্ট সাধন করে। হিন্দু সন্তান যাঁহারা শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলেন তাঁহারা গোবৎকে মাতৃদুগ্ধের অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া অর্দ্ধেক দুগ্ধ দোহন করিয়া থাকেন। আজকাল গাই গরুর দুধের পরিমাণ এত অল্প হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার অর্দ্ধেক কেন, পূর্ণ মাত্রায় ছাড়িয়া দিলেও বাছুরের পেট ভরে না ও দুগ্ধ দোহন না করিলে গৃহস্থের উপায় থাকে না সুতরাং এই দোটানায় পড়িয়া যাহা হইবার হইতেছে।

পূর্ব্বকালে এদেশের লোকেরা—গোবৎসকে প্রচুর পরিমাণে মাতৃদুগ্ধ পান করিতে দিত এবং কেহ কেহ বলিষ্ঠ বলদ বা ষণ্ড উৎপাদনের জন্য গাভীর সমস্ত দুধই ছাড়িয়া দিত। গো-বৎস বাল্যকালে মায়ের দুধ ও বয়স কালে দানা ঘাস খাইতে পাইলে উহাদের আকৃতি আয়তন শক্তি সামর্থ ও দুগ্ধদায়িকা শক্তি জাতের অনুরূপ হইয়া থাকে। মানুষ ইচ্ছামত ইহাদের বাড়

বা দামড়ায় পরিণত করিতে পারে। বাল্যকালে গো বৎসের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হইলে বয়স কালে যত প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য যত্ন-পূর্ব্বক দেওয়া হউক না কেন আর তেমন কাজে লাগে না। গাভী ভাল খাইতে পাইয়া দুধের মাত্রা সামান্য বৃদ্ধি করিলেও জাতের অনুরূপ পূর্ণমাত্রায় দুগ্ধ কিছুতেই প্রদান করিতে পারে না এবং বলদ বা ষণ্ড হৃষ্টপুষ্ট হইলেও বলশালী ও গুণসম্পন্ন হইতে পারে না। পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত হান্সি হিসার ও রোহটক জেলার অধিবাসিরা আজও সেই পুরাতন প্রথা মত এঁড়ে বাছুরকে পূর্ণমাত্রায় দুগ্ধ পান করিতে দেয়। পরে যথাসাধ্য দানা ঘাস খাওয়াইয়া হৃষ্টপুষ্ট করে। একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রায় ৫।৬ শত গ্রামবাসী একত্রিত হইয়া হৃষ্টপুষ্ট এঁড়ে বাছুর গুলিকে বাছাই করে। নির্ব্বাচিত বৎস ভবিষ্যতে ষণ্ড হইয়া ঐ অঞ্চলের গোবংশ বৃদ্ধি করে বলিয়া আজও পাঞ্জাবের হান্সি-হিসার জাতি অবনতির মুখে যাইতে পারে নাই। বাংলা দেশে অবিকল এই প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও দেশের ধনী লোকেরা শ্রাদ্ধবাসরে যে বাছাই করা ষণ্ড উৎসর্গ করিতেন তাহারাই বাংলার গোধনকে অবনতির মুখ হইতে রক্ষা করিত। যত দিন বাছাই কার্য্য একটু যত্নের সহিত সম্পন্ন হইত ততদিন বাংলার গোধনের কোন অনিষ্ট সাধন হয় নাই। এই প্রথার ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হইলেই গোজাতির অবনতির সুত্রপাত হয়। বর্ত্তমানে বাংলা দেশের বৃষোৎসর্গ ব্যাপার আসল কাজের ছায়া মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। একে বাংলার গরু অর্দ্ধাশনে জীবন যাপন করে বলিয়া উহাদের আকৃতি আয়তন ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে তাহার উপর যদি বাছিয়া বাছিয়া অকর্ম্মণ্য খেটুরে এঁড়ে বাছুরকে অর্থাৎ যে বাছুর বলদ হইবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী তাহাকে মহা সমারোহে উৎসর্গ করা হয় এবং তাহারাই পরে গোবংশের বৃদ্ধি সাধনে তৎপর হয় তাহা হইলে গো-জাতির ধ্বংস সাধন অনিবার্য্য ইহাতে অনুমাত্রসন্দেহ নাই।

মান্দ্রাজ সমবায় সমিতির বিবরণী

মান্দ্রাজ সমবায় সমিতির সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে—১৯২৪-২৫ সালের বিবরণীতে দেখা যায় যে, ইহার সংখ্যা আগের বৎসরের ৯৭৮৫ স্থানে উল্লিখিত বৎসরে ১১,১৪১ হইয়াছে—সভ্যের সংখ্যা এখন ৬,২০,৭৪০, সমিতিগুলির ব্যবসাও যথেষ্ট বাড়িয়া উঠিয়াছে—এখন তাহাদের ব্যবসায়ে ৫ ক্রোর ৮ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা খাটিতেছে ইহার শতকরা ৪০·২ অংশ এই সমিতিগুলির নিজস্ব, বাকী টাকা অন্য প্রতিষ্ঠান হইতে কর্জ্জ করা হইয়াছে। এ সমিতিগুলি দুই প্রকারের—কৃষি ও অকৃষি; ইহাদের সংখ্যা যথাক্রমে, ৯৫৭২ ও ১০৩৯ স্থানীয় পরিদর্শক সমিতির সংখ্যা ৩১৩—জেলা সমিতি দশটী—ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ৩২টী—দুইটী প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান আছে—একটীর নাম মান্দ্রাজ প্রাদেশিক সমবায় সংঘ—ও অপরটীর নাম মান্দ্রাজ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির মূলধন ৪ ক্রোর ৫৫ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিতে মিউনিসিপালিটী লোকাল বোর্ড প্রভৃতি সাধারণ প্রতিষ্ঠান সমূহ আলোচ্য বর্ষে অনেক টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিল।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কও প্রায় ৪৭ লক্ষ ১১ হাজার টাকা এই সমিতিগুলিকে ঋণস্বরূপ প্রদান করিয়াছিল, এই অর্থ, সমিতিগুলি অস্থায়ী ঋণদান কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিল। মান্দ্রাজ কেন্দ্রীয় ধনভাণ্ডারই প্রাদেশিক

ধনভাণ্ডারের কার্য্য করে। এই ভাণ্ডারের মূলধন ৫ লক্ষ ৯৪ হাজার ১০০ টাকা—ইহা সমান অংশে বিভক্ত। এই ব্যাঙ্কের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১ ক্রোর মুদ্রা। ব্যাঙ্কের হাতে সারা বৎসরই যথেষ্ট বাড়তী টাকা ছিল—কিন্তু সে টাকা সমিতিগুলির কোন সাহায্যে আসিতে পারে নাই।

কৃষিসমিতিগুলি সংখ্যায় ৯১৮৪ এবং তাহাদের মূলধন ছিল ৩ ক্রোর ৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩শ ২৪ টাকা। এই সমিতিগুলির সারা বৎসরে লাভের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৯৭ টাকা। এই সমিতিগুলির কার্য্যবিবরণী পাঠে দেখা যায় যে ক্রমেই লাভজনক কার্য্যের জন্য ঋণের চাহিদা বাড়িতেছে। কিন্তু আদায়ের কার্য্য বেশ ভালরূপ চলিতেছে না।

কৃষিক্রয়বিক্রয় সমিতির সংখ্যা এখন ৭৮ ও ইহাদের মূলধন, ৪৮৪, ৫৫৪, ইহাদের মধ্যে ৩৯টী সমিতি এই কার্য্যে লাভ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। লাভের পরিমাণ ১২৯৯০ টাকা—কিন্তু ৩৮টী সমিতির এই কার্য্যে লোকসান হইয়াছে—ইহার পরিমাণ ৪৮২৭৩ টাকা।

এই প্রদেশে ৪টী আবাদ ও বিক্রয় সমিতি তন্মধ্যে ১টী মাত্র সমিতির কার্য্যে লাভ হইয়াছে বাকী তিনটীতে লোকসান হইয়াছে।

এই প্রদেশস্থ অন্য কৃষি সমিতিগুলি প্রধানতঃ তাহাদের সভ্যদের জন্য জমি খরিদ করিয়া তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। এই জমি সভ্যেরা কৃষিকার্য্যের বা থাকিবার জন্য গৃহনির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন—বিবরণীতে আর একটী বড় আনন্দের সংবাদ আছে—সমবায় আন্দোলন ক্রমে অস্পৃশ্য জাতিদের মধ্যেও পৌছিয়াছে। তাহাদের ভিতর ইহা এক নূতন জীবনের সৃষ্টি করিয়াছে।

জলসেচের সুবিধার জন্যও একটী সমবায় সমিতির উল্লেখ আছে—দুইটি সমিতি গৃহনির্ম্মাণের সাহায্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তিনটি শ্রমিকদের সমিতি আছে—৪টি সমিতি তাহাদের সভ্যদের ঋণদান করে, এবং তাহাদের শ্রমজাত দ্রব্য বিক্রয়ে সাহায্য করে।

৭টি সমিতি পতিত জমির উদ্ধারের সাহায্যের জন্য গঠিত। এবং একটি সমিতি সভ্যদের মধ্যে, কৃষিযন্ত্র ও সারের বিক্রয়ে লিপ্ত।

উপরে আমরা শুধু কৃষি সমিতিগুলির কাজের বিবরণ দিলাম—কিন্তু ইহা ছাড়াও আরও অনেকগুলি সমিতি আছে ইহাদের সংখ্যা ১০৭৯—সভ্যও ইহাতে আছেন ১৫৬১২১, মূলধনের পরিমাণ ১ ক্রোড় ৪৬ লক্ষ টাকা।

এই সমিতিগুলির যে বিবরণ আছে তাহা দেখিলে ইহাদের উন্নতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমিতিগুলির মধ্যে ১১২টি সঞ্চয়সমিতি। এই সমিতিগুলির সাহায্যে ইহার সভ্যদের জন্য ৫৩ হাজার ১৪ টাকা সঞ্চিত হইয়াছে।

বেতনজীবী সভ্যের সংখ্যা ২৪৬ ইহাদের ভিতর অধিকাংশই সরকারী কর্ম্মচারী। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের সাহায্যের জন্য যেরূপ সমিতি আছে—সেরূপ অনুরূপে শ্রমজাত দ্রব্যের জন্যও বিভিন্ন সমিতি আছে। ইহাদের মধ্যে ৫৫টি সমবায় ভাণ্ডার আছে, ইহাদের মূলধনের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। সারা বৎসরে ইহারা ৩৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার কারবার করিয়াছে।

৪৯টি তন্তুবায় সমিতি সভ্যদের তরফে ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ২৫৫ টাকার মাল কেনাবেচা করিয়াছে। এই কার্য্যে তাহাদের লাভের পরিমাণ মাত্র ২০৩০ টাকা হইয়াছিল, কিন্তু কোন কোন সমিতি এ কার্য্যে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে মোটের উপর ক্ষতির ভাগই বেশী—ক্ষতির পরিমাণ ৪৫৫৫ টাকা। গৃহনির্ম্মাণ সমিতির সংখ্যা ৭৮, ইহারা মূলধন হিসাবে সভ্যেদের নিকট হইতে মোট ৪ লক্ষ ৩ হাজার ৩২২ টাকা পাইয়া এই সমিতিগুলি ৩৩৭টি গৃহনির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই কার্য্যে তাহাদের ১০ লক্ষ ৫২ হাজার ৯২২ টাকার প্রয়োজন হইয়াছিল।

ঠিকাদার সমিতির সংখ্যা বৎসরের শেষে ৩৮টি হইয়াছিল—ইহারা এক বৎসরে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার কাজ শেষ করিয়াছিল—এই সমিতিগুলির প্রতি

সরকার স্থানীয় মিউনিসিপালিটিসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

এই প্রদেশে আর এক নূতন কার্য্যের আয়োজন হইতেছে। কৃষককে বহুদিনস্থায়ী ঋণের ব্যবস্থা করিবার জন্য নূতন সমিতি গঠিত হইতেছে—এই সমিতিগুলি কৃষকের নিকট হইতে জমিবন্ধক রাখিয়া অল্পহারে বহুদিন স্থায়ী ঋণের বন্দোবস্ত করিবে। ইহারা এই কার্য্যের অর্থ আবার সাধারণের নিকট হইতে ঋণপত্র (ডিবেঞ্চারস) বিনিময়ে সংগ্রহ করিবে। এইরূপ চারিটি সমিতি এ বৎসরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পতিত জমির উদ্ধারার্থে যে সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে তাহারা এ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ৫০ হাজার টাকা ঋণস্বরূপে পাইয়াছে।

ফলের বাগান

'বাগান পাতা"

মানুষ যখন তাহার কুটীর বাঁধে, তখন সে অনেক ভাবিয়া সেই স্থানটী মনোনীত করে—সে দেখে পাড়াটী কেমন, বাজার করিবার সুবিধা কতদূর চলাচলের রাস্তা কেমন, শিক্ষার ব্যবস্থা কেমন, এই সব দেখে তবে সে তার কুটীরের বনেদটী খোঁড়ে। এত দেখে তার কারণ সে কুটীরটি যখন খুসি অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করিতে পারে না, সে শুধু নয়—তার বংশ এখানে চিরকালের জন্য বাস করিবে। তার নিজের ও তাহার বংশের ভবিষ্যৎ এই কুটীরের উপরই নির্ভর করে।

কুটীর বাঁধিবার সময় যেমন যত্ন করিয়া আমরা স্থান নির্ব্বাচন করি ফলের বাগান 'পাতিবার সময়ও" আমাদের সেইরূপ যত্ন লইতে হইবে। একটি বাগানও যদি—সকল রকম সুবিধা পায় এমন স্থানে স্থাপন করিতে পারা যায়—তাহা হইলে আমাদের ও আমাদের বংশধরদিগের অর্থের হাহাকার বহুকালের জন্য লাঘব হইবে।

বাগান চিরকালের জিনিস এখনও আমাদের পিতামহদের আমলের বাগান অতি অযত্নে থাকা সত্বেও প্রা· বৎসর কিছু কিছু আমাদিগকে দান করে।

বাগান পাতিবার সময় প্রথম পরীক্ষা করিতে হইবে সে দেশের মাটি।

মাটির উপরে গাছ জন্মায়। মাটি থেকে গাছ তাহার আহার্য্য যোগায়। মাটির গুণে ফলের পরিমাণ এবং গুণাগুণ নির্ভর করে। অতএব মাটির কথাই প্রথম ভাবিবার বিষয়।

বাগানের মাটি বেশি যদি এঁটেল হয় ত গাছ চারা অবস্থায় তার শিকড় মাটিতে বেশ বিস্তার করিতে পারে না, তার ফলে এই হয়, যে গাছটি শীঘ্র বাড়িয়া উঠিতে পারে না।

অধিকন্তু এঁটেল মাটিতে জল তাড়াতাড়ি নিক[illegible] [illegible] পারে না ফলে ঐ স্থানে জল জমিয়া [illegible] [illegible] নাইট্রোজেন নষ্ট হইয়া যায়। জল নির্গ[illegible] করিতে পারিলে জমিতে বায়ু চলাচল [illegible] পারে কিন্তু ইহা ব্যয়সাধ্য।

আবার এঁটেল মাটি প্রখর রৌদ্র তাপে একবারে ফাটিয়া "চৌচির" হইয়া যায় তখন গাছের সব শিকড় সব ছিঁড়িয়া যায়। গাছ কোন রকমে "জোর" পায় না, শীঘ্রই শুকাইয়া যায়, চাষীরা ফলের বাগান এ জমিতে

কখন করে না তবে দেখা যায় একমাত্র কলাগাছ এঁটেল মাটিতে হয় কিন্তু খুব ভাল হয় না। অন্য কোনপ্রকার গাছ একবারেই সুবিধা হয় না। বালী মাটি যেখানে বেশী আছে গাছ সেখানে প্রথম অবস্থায় খানিকটি "বাড়" ধরে। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা যায়—গাছ আর বাড়ে না—পাতা হলদে হইয়া যায়—গাছও ক্রমেই মরিয়া যায়। গাছের "বাড়" প্রথম অবস্থায় ভাল হয় তার কারণ—গাছ তার মূল বালী মাটীর দিকে বিস্তার করিতে পারে। আর চারা গাছে জল বেশী লাগে না বলিয়া প্রথম অবস্থায় যে জল আমরা সেচন করি গাছের বাঁচিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট হয়।

কিন্তু বালী মাটিতে জল বেশীক্ষণ থাকে না, চুঁয়াইয়া নীচে চলিয়া যায়, এবং জল যাইবার সময় মাটিতে গাছের যাহা আহার্য্য থাকে তাহাও ধৌত করিয়া লইয়া যায়। সেইজন্য গাছ বড় হইলে বেশী জল ও বেশী আহার্য্য দরকার। জল আমরা আর যোগাইতে পারি না। যত দিব মাটিই তাহা শুষিয়া লয়। আর আহার্য্যও সব মাটির তলে জলের সঙ্গে চলিয়া যায় সেইজন্য বালী মাটিতে গাছ বড় হয় না। যে গাছের শিকড় একবারে মাটির অনেক তলায় যায় তাহারা অনেক বালী মাটিতে জন্মায়—অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি জাতীয় বৃক্ষ বালী মাটিতে বাঁচিতে পারে, -কিন্তু "ফল" হিসাবে এরা মানুষকে কিছুই দেয় না। সেই জন্য বালীমাটী বাগনের পক্ষে একবারেই অনুপযুক্ত।

"বেলে দোয়াঁসলা মাটী"ই বাগানের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। এই মাটীর জলধারণ করিবার ক্ষমতা অসাধারণ; অল্প জলেই গাছের খুব উপকার হয়। সেঁচের খরচা অনেক বাঁচিয়া যায়। আর এই মাটীতে গাছের উপকারী অনেক দ্রব্য থাকে—গাছ ও শিকড় বিস্তার করিয়া সেই সব আহর্য্য সন্ধান করিতে পারে। এই জমিতে সার দিলে সমস্ত সারই গাছের কাজে লাগে—সারের অপব্যবহার হয় না। আজ কাল খইল বা অপরাপর সারের বেশী অপচয় করিলে আমরা চাষে লাভবান হইতে পারিব না।

আমরা আগে যাহা বলিয়াছি তাহা মাটীরউপরের অংশেরই কথা অর্থাৎ উপর হইতে মাটী দেখিয়া যাহা যাহা ধারণা হয়—এঁটেল, বেলে বা দো-আঁসলা তাহারই উপর আমাদের সাধারণ বড় জমি নিদ্ধারণ করা হয় কিন্তু উপরের মাটীর উপর নির্ভর করিলে সময় সময় বড়ই ঠকিতে হয়।

ঠিক উপরের একটু নিচে অত্যন্ত খারাপ মাটী থকিতে পারে। গাছ প্রথম অবস্থায় বেশ বাড়ে তারপর যখন বাড় কমিয়া শুকাইয়া যায় তখন আমরা একবারে হতভম্ব হইয়া যাই। অনেক সময় কপালের দোহাই দিয়া বসিয়া থাকি। কারণ অনুসন্ধান করিলেই সব ধরা পড়িয়া যায়; আজ বিজ্ঞানের যুগে মানুষকে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া শুধু কপালের দোষ দিতে দেখিলে বড়ই বিসদৃশ বোধ হয়। ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা সকল দেশেই এই রূপ কিছু ঘটিলে তৎক্ষণাৎ মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্য লয় আমাদেরও তাহাই করিতে হইবে মানুষের অসুখ করিলে আমরা ডাক্তারের নিকট ছুটি কিন্তু গাছের অসুখ হইলে আমরা কৃষিবিদের নিকট যাইতে এখনও শিখি নাই। যখন গাছ না বাড়ে বা শুখাইয়া যায় তখন গোড়া খুঁড়িলে অনেক সময়ই দেখা যায় যে শিকড় নীচে আর ভেদ করিতে পারিতেছে না। হয় রবারের মত একরকম মাটী এখানে আছে আর নয় প্রস্তরের মত মাটীর সন্ধান পাওয়া যায়—ইংরাজীতে তাহাকে Had pan কহে। উভয় মাটীতেই শিকড় প্রবেশ করিতে পারে না—জল ইহাকে নরম করিয়া গাছের উপযুক্ত করিতে পারে না। আর ইহাতে গাছের আহারোপযোগী—কোন প্রকার দ্রব্য বর্ত্তমান থাকে না সেই জন্য শুধু উপরকার মাটী বা surface soil দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিলেই চলিবে না নিচেকার মাটী বা subsoil পরীক্ষা করিতে হইবে Specially for fruits soil the roots of which always go deep into subsoil. ফলের গাছের পক্ষে যে মাটীতে যুসের ভাগ কিছু মাত্রায় আছে সেই মাটীই খুব ভাল।

পেশোয়ার, দারভাঙ্গা ইত্যাদি জায়গায় ফলের গাছ খুব ভাল হয়, আমাদের দেশে সাধারণতঃ গাছ বড় হইয়া যায়—পাতা ডালাপালা বেশী হয়, ফল কিন্তু খুব কম হয়—

এই কথা শুনিয়া কেহ যেন না ভাবেন যে আমাদের বাংলা দেশে বুঝি ফলের গাছ লাভজনক নয়—পরিশ্রম করিয়া গাছগুলিকে আমাদের আয়ত্তে আনিলেই হইবে। দারভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে অবশ্য আমাদের অপেক্ষা কিছু অল্প আয়াসে হইবে কিন্তু সেখানে ফলের বিক্রয় নাই তাই ফলের বিক্রয়ের জন্য এখানে তাদের সেই ফল বহিয়া আনিতে হয়। আমাদের দরজার নিকট বাজার—আমরা এখানে যদি ফলের বাগান ভালরূপে করিতে পারি তাহাহইলে আমাদের নিকট সহযোগিতায় সকলেই পরাস্ত হইবে—আর এককথা এখানে টাটকা ফল পাওয়া যাইবে আর বাঙ্গলার মাটীতে potash বেশী থাকায় ফলের মিষ্টতা সকল দেশ অপেক্ষা বেশী হয়। বাগানের উপরের মাটীও যেমন ভাল নীচের মাটীও তদ্রূপ হওয়া দরকার। বিখ্যাত জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক Riebig বলেন—মাটীর উর্ব্বরতা নির্ভর করে সেই মাটীতে আগে যে ফসল ছিল তাহার উপর। সেই ফসল সেই মাটী হইতে সার লইয়া যতটা পড়িয়া থাকে তাহাই পরবর্ত্তী গাছের খোরাক্ জোগায় অর্থাৎ দেখিতে হইবে যে মাটীকে ফসল একবারে অন্তঃসার শূন্য করিয়া না ফেলে। অবশ্য সার দেওয়া যায় কিন্তু সার গাছের আহারোপযোগী হইতে দেরী হয় সেই জন্য গাছটা শিশু অবস্থায় সেই মাটীতে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাই আহরণ করে।

মাটী যাহাতে উত্তমরূপে গাছের শিকড় বিস্তারের উপযোগী হয় তাহাও দেখিতে হইবে। মাটীতে সময় সময় গাছের হানিকর অনেক প্রকার Acid থাকে সে গুলির দিকেও নজর রাখা দরকার। বিশেষতঃ যে জমীতে জল জমে সে জমী একবার oxygen শূন্য হইয়া গাছের পক্ষে একবারে বিষবৎ হয়। এ জমি ফলের বাগানের পক্ষে একেবারে পরিত্যজ্য; আবার ইহাও দেখিতে হইবে যে জমি যেন সর্ব্বদা সরস থাকে। সরস মাটী সকল বৃক্ষের পক্ষেই হিতকর। সর্ব্বশেষে দেখিতে হইবে আসে পাশে চাষীরা কি ফলের চাষ করে—যতটা পারা যায় সে দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অবশ্য নূতন বৃক্ষ লইয়া আমাদের পরীক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু সারা বাগানটী যেন সে গাছে না পূর্ণ করে।

(ক্রমশঃ)



বঙ্গীয় মৎস্য বিভাগ—

বঙ্গীয় সরকার, শীঘ্রই মৎস বিভাগ পুনঃ স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই বিভাগটী গত ব্যয়সংকুলান কমিটীর পরামর্শ অনুসারে উঠাইয়া দেওয়া হয়। মিঃ ফিণলো, আমাদের বর্ত্তমান কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ যখন বিলাতে ছুটীতে ছিলেন—সেই সময় সরকার তাঁহাকে ইংলণ্ডে ও ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশে মৎস্যের আবাদ প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতে ও বিভিন্ন প্রণালী অনুশীলন করিতে অনুরোধ করেন—ফিনলো মহাশয় এই কার্য্য শেষ করিয়া এদেশে ফিরিয়াছেন শীঘ্রই এ বিষয় তিনি তাহার মন্তব্য সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

বাঙ্গলা দেশে রেশম চাষের বিস্তার—

সরকারের রেশম বিভাগের কাজ ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতেছে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে যে রেশম চাষ সম্ভব তাহা এখন তাহারা কার্য্যে প্রতিপন্ন করিয়াছে। কলিকাতার নিকটে চুঁচুড়া কৃষি বিদ্যালয়ে তাঁহারা একটী কেন্দ্রস্থাপন করিয়া অত্র বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগকে রেশমের কাজ শিখাইতেছেন। এখানে—এরি গুটী ও ছোট পলুর গুটী পালন বেশ চলিতেছে—এই শিল্প যদি আবার ইহাদের চেষ্টায় বাঙ্গলায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় তাহা হইলে সত্যই বাঙ্গলার অর্থাগমের এক নূতন পথ মুক্ত হইবে।

তুলা লইতে বীজ ছাড়াইবার সমবায়প্রথা,

বম্বে প্রদেশের সমবায় সমিতির রেজিষ্টার মিঃ জে, এস, ম্যাডান, আই, সি, এস মহোদয় সম্প্রতি নাসিক জেলার নন্দগাঁও নামক স্থানে তুলা হইতে বীজ ছাড়াইবার জন্য একটী সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। এই সমিতি বিগত অক্টোবর মাসে আরম্ভ করা হইয়াছে। এই কোম্পানির জন্য ইতিমধ্যেই একশত সভ্যের নিকট হইতে প্রায় পনের হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত কার্য্যের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া আশী অশ্ব শক্তির একটী ব্ল্যাকষ্টোন কল ক্রয় করা হইয়াছে—কাজও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

বোম্বাই কো অপারেটিভ্ সেণ্টাল ব্যাঙ্ক টাকা দিয়া উক্ত সমিতিকে সাহায্য করিতেছেন। সমিতি উদ্বোধনের দিন রেজেষ্টার মহোদয় এইরূপ সমিতি পরিচালন সম্বন্ধে নানা সদযুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়া সমিতিটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন।

দুগ্ধে স্নান:—

শুনা গিয়াছে যে প্যারিসের জনৈকা নর্ত্তকী—স্নান করিবার জন্য প্রত্যহ অনেক পরিমাণে দুগ্ধ ব্যবহার করেন বলিয়া অভিযুক্তা হইয়াছেন। কেবল একজন নহে এইরূপ অনেকেই বিলাসের জন্য দুধ নষ্ট করিয়া থাকেন। ফরাসী সরকার তাহাদের দেশে এই দুধের অনটনের সময় দুগ্ধ অপব্যবহারীদের বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। শিশুদের আহারের জন্য দুধের অভাব—এদিকে বিলাসের উপকরণ করিয়া তাহার অপব্যয় করা নির্ম্মমতার চরম নিদর্শন।

পাঞ্জাব কৃষি-শিল্প বোর্ড—

পাঞ্জাব কৃষি বিভাগের মন্ত্রী সরদার যোগেন্দ্র সিংহের উদ্যোগে ঐ প্রদেশের শিল্প, কৃষি ও ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের একটী সভা হইয়াছে। উক্ত সভায় সকলে এক মত হইয়া "উন্নতি বিধায়ক বোর্ড" নামে একটী বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই বোর্ডের দুইটী বিভাগ থাকিবে—একটী কৃষি ও অপরটী শিল্প সম্বন্ধীয়।

মাদ্রাস জলপথ সম্বন্ধে প্রস্তাব,—

জানা গিয়াছে যে মাদ্রাসে একটী সুবৃহৎ জলপথের প্রস্তাব সরকারের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই জলপথ প্রস্তুত করিতে প্রায় ৪।৫ কোটী টাকার প্রয়োজন হইবে। প্রস্তাবটী গবর্ণমেন্টের অনুমতি সাপেক্ষ রহিয়াছে।

মধ্য প্রদেশীয় জলপথ,—

১৯২৪—২৫ খৃঃ অব্দের মধ্য প্রদেশের জলবিভাগের কার্য্যাবলীর কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ একটী প্রস্তাব স্থানীয় সরকার প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রকাশ—যে সকল জলপথ বর্ত্তমানে কাটা হইতেছে তন্মধ্যে মহানদী জল নির্গমন ব্যবস্থা, খারুং আম্বরীর মূল ও শাখা খাল এবং মনিয়ারীর মূল খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাজ করিবার মজুরের অভাব, অনুসন্ধান এবং নকসা প্রস্তুত ও খরচ ঠিক করিবার কার্য্যে অযথা বিলম্ব প্রভৃতি নানা কারণে অর্থের অসংকুলান হইয়া পড়িয়াছে। সরকার মনে করেন যে আনাপুর-কোরিয়া এবং রায়পুর ভিজিয়ানা গ্রাম রেলওয়ে লাইন নির্ম্মাণের জন্য অত্যধিক লোকের আবশ্যক হওয়ায় ঠিকাদারগণ জলপথ নির্ম্মাণের জন্য চুক্তিমত লোক সরবরাহ করিতে পারিবে না বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসরে অধিকতর ধানজমিতে জলাগমের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অধিক জমি জরিপ করা হইয়াছে। গত বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারা গিয়াছে যে মধ্য প্রদেশে চুক্তির প্রথাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। জল পথের বৃদ্ধি এবং চুক্তির হার বৃদ্ধি হওয়ার দরুণ ভবিষ্যতে ফল ভাল হইবে বলিয়াই মনে হয়। যদিও বর্ত্তমানে সাক্ষাৎভাবে ফল ভাল হইবে না তথাপি আশা করা যায় যে শস্যের ফলন অধিক হইবে। জল না হওয়ার দরুণ শস্যের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়া বাৎসরিক ফসল বৃদ্ধি হইবে।

কচুরি পানা সপ্তাহঃ—

বিভাগীয় কমিশনার মিঃ জে, এন, গুপ্ত মহাশয়ের উদ্যোগে কৃষ্ণনগর সভায় গত জানুয়ারী মাসে যে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল—তদনুসারে সদর মহকুমায় গত মে মাসে প্রথম সপ্তাহে "কচুরী পানা সপ্তাহ" অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সদর মহকুমার সবডিভিসনাল অফিসার মহাশয় উক্ত সপ্তাহে একটী দল গঠন করিয়া সমগ্র মহকুমার কচুরী পানা বিনষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য নব সৃষ্ট ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্য লওয়া হয়। এই দল নানাস্থানে ঘুরিয়া স্থানীয় ভদ্র লোক এবং স্বার্থত্যাগী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সাহায্যে অনেক পুষ্করিণী এবং নালার কচুরি পানা উৎপাটন করিয়া ফেলেন। উৎপাটিত কচুরীপানাগুলি নদীতীরে শুকাইবার জন্য রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে শুকাইলে সে গুলি পুড়াইয়া ফেলা হইবে। উপস্থিত অনেক পদস্থ ব্যক্তিগণ স্বহস্তে এই কার্য্য করিয়া গ্রামবাসীগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এইরূপ সৎকার্য্য বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য, যদি অন্যান্য মহকুমার এবং গ্রামের ভদ্র মহোদয়গণ এরূপ নিঃস্বার্থভাবে দেশের প্রকৃত উপকারের জন্য পরিশ্রম স্বীকার করেন তবে অবিলম্বে এই সমূহ ক্ষতিজনক কচুরী পানা নিঃশেষ হইয়া যাইতে পারে। আমরা আশা করি এরূপ উদাহরণ অচিরে আরও পাইব।

সাপের চামড়ার উপকারিতা—

আমাদের আনাচে কানাচে কত রকম সাপ দেখা যায়, গোসাপ, বোড়াসাপ প্রভৃতি—এগুলি আমাদের কোনই উপকারে আসে না। কিন্তু ইউরোপে ইহাকেও কাজে লাগাইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছে; সে দেশে দস্তানা, মণিব্যাগ এমন কি জুতাও ইহাতে প্রস্তুত হইতেছে

আবার অজগরের চামড়া হইতে ওভার কোটও তৈয়ারী হইতেছে শৌখিন লোকের ভিতর ইহার আদর যথেষ্ট। তাই ইহার চাহিদাও যথেষ্ট। আমাদের দেশে অনেকেই চামড়া "ট্যান" করিতে শিখিয়া আসিয়াছেন তাহাদিগকে আমরা এ বিষয়ে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

কাপাসের চাষ—

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটীর নাম বোধ হয় সকলে জানেন এই সমিতি দেশে যাহাতে কার্পাসের আবাদ বাড়ে তাহারই জন্য স্থাপিত হয় এই সমিতির সভ্যেরা সরকার ও বিভিন্ন সমিতি কর্ত্তৃক মনোনীত হয়েন—বর্ত্তমান বৎসরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্যরূপে গণ্য হইয়াছেন।

(১) জে, এ, কে, এম, এল, সি,—ইনি টিউটি-কোরিন চেম্বার অফ কমার্শের মনোনীত।

(২) টি. ই, কার্টরাইট উত্তর ভারত চেম্বার অব্ কমার্শ কর্ত্তৃক মনোনীত।

(৩) মিঃ ওয়েব, মান্দ্রাজ সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত।

(৪) বি, পি, শেষে রেড্ডি, মান্দ্রাজ প্রদেশকার্পাস সমাজের মনোনীত।

(৫) বি, কে, লাহিড়ী, বাঙ্গালার প্রতিনিধি।

(৬) রাও সাহেব ভীমভাই দেসাই, গুজরাট কৃষি বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ—পুনর্ব্বার এই সমিতির সভ্যরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কৃষ্ণনগর সম্মিলন—

কৃষ্ণনগরে এবারে অনেকগুলি সমিতির অধিবেশন হইয়া গেল—রাষ্ট্রীয় সমিতি, ছাত্র সমিতি, যুবক সমিতি শ্রমিক সমিতি, কৃষক সমিতি, ধীবর সমিতি ইত্যাদি এতগুলি অধিবেশনের ফলে দেশের কি উপকার হইল তাহারই প্রতীক্ষায় আমরা রহিলাম।

আসাম চা সমিতি—

গত ১৮ই মে জোড়হাটে আসাম প্রাদেশিক চা সমিতির সপ্তত্রিংশ বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতির আসনে ছিলেন এই সমিতিরই লেফটনেণ্ট কর্ণেল ডাবলিউ ডিস্নাইলস এম, এল-সি। এই সভায় শ্রমিকদের সংগ্রহপত্রে (recruitng sheet) তাহাদের দৈনিক বেতনের উল্লেখ সম্বন্ধে আলোচন হয়। সভাপতি মহাশয় বলেন যে তিনি পূর্ব্বের এক কমিটীতে চাবাগানের ম্যানেজারদিগকে. পুরুষ শ্রমিকদের ঘণ্টায় ১ আনা ৩ পাই ও স্ত্রী শ্রমিকদের ১ আনা এই হারে বেতনের বিষয় সংগ্রহ পত্রে লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করেন—সে সভায় অনেক ম্যানেজার এবিষয়ে আপত্তি জানান এবং বলেন যে তাঁহারা তাহাদের মনিবের বিনা অনুমতিতে এ কার্য্য করিতে অপারগ।

এই জন্যই এই প্রস্তাব এই বাৎসরিক অধিবেশনে, পুনঃ স্থাপন করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন যে "এখন সকল চাবাগানের শ্রমিকদের হার এক হওয়া উচিত সেই জন্য যদি এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে চাবাগানগুলি কি হারে শ্রমিকদের বেতন দেয় আমার বিশ্বাস খুব অল্প বাগানেই বোধ হয় এই হারের কম তাহাদের শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হয়। আর একটা কথা, শ্রমিক যদি তাহার বেতনের হার অগ্রেই জানিতে পারে তবে কাজেও বেশী আকৃষ্ট হইবে।" অনেক আলোচনার পরে সভ্যগণ স্থির করেন, এই কার্য্য তাঁহারা স্বীয় মত অনুসারে সম্পাদন করিবেন।

পক্ষী চাষ অধিবেশন—

ক্যানাডার কৃষিবিভাগ আগামী বৎসরে তথায় একটি বিশ্বভারত পক্ষীচাষের কংগ্রেসের (Poultry Congress) বৈঠক বসিবে এই সংবাদ দিয়াছেন, এই অধিবেশনের স্থান, ওটাওয়া—কানাডার রাজধানী। সময় ২৭শে জুলাই হইতে ৪ঠা আগষ্ট। তাঁহারা এই কংগ্রেসের বিষয় আলোচনা করিয়া একটী পুস্তিকাও প্রকাশ করিয়াছেন—যাঁহারা এই কংগ্রেস সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছুক—তাঁহারা National resources, and information. Branch, Canada Buildings Trafalgar Square এ আবেদন করুন।

ছাগলের চাষ—

দেশে যেরূপ দুধের অভাব হইয়াছে তাহাতে ছাগলের চাষে বোধ হয় সে অভাব কিছু দূর হইতে পারে,—গৃহস্থের পক্ষে আজকাল গরু রাখা একেবারে অসম্ভব হইয়াছে। ইংলণ্ডের সরকার সেখানে ছাগপালকদিগের সুবিধার জন্য পুং ছাগের বন্দোবস্ত করেন। যে কোন পুং ছাগ ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে সকল পুং ছাগ সরকারের নিকট রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছে সেগুলিই কেবল এই কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এই ছাগগুলি বিশেষ যত্ন সহকারে মনোনীত হয় এরূপ ৮৯টি ছাগ মাত্র সরকারের নিকট আছে—সরকার প্রত্যেক বৎসরে এইরূপ পুং ছাগের অধিকারীদিগকে তাঁহাদের তালিকাভুক্ত করেন, এই কার্য্যে ব্রিটিশ গোটসোসাইটিও তাঁহাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন—তাঁহারা ইংলণ্ডের এরূপ ছাগে ও তাঁহার অধিকারীদের তালিকা একটি পুস্তকে ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করেন-তাহার নাম Herd Book। আমাদের গরু ও ছাগলের এরূপ Herd Book থাকিলে বড়ই উপকার হইবে। আমরা এ বিষয়ে সরকারী কৃষিকর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মধ্য প্রদেশের কৃষিবিভাগের বিবরণী—

এ বৎসরের মধ্যপ্রদেশের কৃষিবিভাগের বিবরণী বাহির হইয়াছে—কৃষিবিভাগ এখন নূতন কৃষিযন্ত্র উদ্ভাবনের বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, একটি পাথর লাঙ্গল, ও একটি ক্ষেতের তুলার কাটি প্রভৃতি পরিষ্কারযন্ত্র তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন। আরও দুইটি যন্ত্র তাঁহারা পরীক্ষা করিতেছেন—একটি ঢেলা ভাঙা যন্ত্র ও আর একটি শস্য ঝাড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সমবায় সমিতির সংখ্যা ক্রমে কমিয়া যাইতেছে কিন্তু তাহাদের মূলধনের পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছে—৯টি গোজনন কেন্দ্র ও দুইটি গোশালা এ প্রদেশে আছে—এই প্রদেশস্থ সকলজাতীয় গরুই এখানে রাখা হয় এবং পঞ্জাবস্থ হিসার জেলার ভাল ষাঁড় সংযোগে যাহাতে ভবিষ্যত একটি নূতন উন্নত গোজাতির সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে চেষ্টা চলিতেছে। রোসিয়ম কাপাশের বীজ বিতরণকার্য্য বেশ চলিতেছে এবং বিভাগস্থ বীজ ভাণ্ডার প্রদেশের চারিদিকে স্থাপন করা হইতেছে।

এই প্রদেশে সকলপ্রকার কার্পাশ বিষয়ে অনুশীলন, ও অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে এবং কয়েকটি ভাল জাতীয় কার্পাসের সন্ধান মিলিয়াছে।

অধরতল ফার্ম্মে এক জাতীয় ধানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—এই ধানের আবাদ বিনা সেচনে চলে। এবং পাকিতে ৬৯ দিন লাগে—একরে ফলন ১০ মন।

লাবান্ধী ফার্ম্মে অনুসন্ধানের ফলে একজাতীয় কাল রঙ্গের ধান পাওয়া গিয়াছে—ইহার ফলন খুব বেশী।

বিভাগীয় প্রথার কার্য্যও যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে বিভাগ এখন স্থানে স্থানে, ছোট ছোট ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রণালীমতে কার্য্য করিয়া দেখাইয়া থাকেন। মাঝে মাঝে কৃষি প্রদর্শনীরও বন্দোবস্ত করিতেছেন তাঁহারা আলোক চিত্রে ও বক্তৃতার সাহায্যে তাঁহাদের প্রণালীর উৎকর্ষতা সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন—সাধারণের বোধগম্য ছোট ছোট পুস্তিকার সাহায্যে তাহারা এই জ্ঞান সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন।

কৃষিশিক্ষা—

এদেশে কৃষিশিক্ষার কোনই আয়োজন নাই—সকল প্রদেশেই অন্ততঃ একটি কৃষি বিদ্যালয়,আছেকিন্তু বঙ্গদেশে বর্ত্তমানে তাহাও নাই—১৯১০ সালে এদেশে কয়েকটি কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে চুচুড়ার কৃষি বিদ্যালয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই বিদ্যালয়টি রেলের অতি সন্নিকটে সরকারী কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত। এই বিদ্যালয়টি সরকার Retrenchment কমিটির পরামর্শ অনুসারে আজ দুই বৎসর হইল উঠাইয়া দেন।

গত বৎসর হইতে একদল উদ্যোগী যুবক এই বিদ্যালয়টি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহারা সকলেই বিদেশ প্রত্যাগত ও কৃতবিদ্য। স্কুলটীর কার্য্য বর্ত্তমানে আবার বেশ চলিতেছে—ছাত্রেরা তন নিয়মে এখানে

শিক্ষা পায় —তাহারা নিজেরাই জমি চাষ করে, গোপালন করে,—স্বহস্তে কার্য্যের ফলে তাহারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে তাহা তাহাদের কর্ম্মজীবনে বিশেষ উপকার দিবে। ছাত্রদের স্বাস্থ্যও এখানে খুব ভাল থাকে, খোলা মাঠের হাওয়া—টিউবওয়েলের জল এবং ক্ষেত্রজাত বিশুদ্ধ আহার্য্য দ্রব্য, এই তিনটী শরীর গঠনের বিশেষ উপযোগী।

শিক্ষকেরা ছাত্রদের সহিত মিলিয়া সকল কার্য্য করেন—

এই বিদ্যালয়ের পাঠ দুই বৎসরে শেষ হয় কিন্তু যতদিন না শিক্ষার্থী কৃষি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়া অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হয় ততদিন তাহাকে ছাড়পত্র দেওয়া হয় না।

এই বিদ্যালয়ের প্রতি আমরা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বঙ্গীয় সমবায় সমিতির কার্য্য বিবরণী :—

১৯২৫ খৃঃ অব্দের ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরের সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় সমবায় সমিতিগুলির ফল বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর গুলিতে যেমন উন্নতি হইয়াছিল বর্ত্তমান বর্ষে ও তদনুপাতে ব্যবসায়গুলি উন্নতিলাভ করিয়াছে—উক্ত রিপোর্টে এই কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

ডিমের উপকারীতা।

সাধারণের বিশ্বাস, মাংস, রুটীই প্রধানত পুষ্টিকর খাদ্য কিন্তু ডিম্ব ইহাদের অপেক্ষা কোনমতে কম পুষ্টিকর নহে। মানুষের যখন রক্ত কমিয়া যায় তখন সে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে সেই সময় তাহাকে ডিম্বের ভিতরকার “লাল” খাইতে দিলে, সে বিশেষ উপকার পায়। নয় মাসের শিশুকে ডিম্বের লালা অল্প সিদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। দুগ্ধে লৌহের ভাগ অত্যন্ত অল্প। শিশুর দেহ গঠনের জন্য তাহার শরীরে লৌহের প্রয়োজন—জন্মিবার সময়, প্রকৃতি কতক পরিমাণ লৌহ তাহার দেহের ভিতরে সরবরাহ করিয়া রাখে।

উক্ত সঞ্চিত লৌহ নিঃশেষ হইতে নয় মাস লাগে। এ সময়ে—দেহের পুষ্টি ও রক্তের বৃদ্ধির জন্য লৌহ তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহা না হইলে সে বাড়িতে পারে না। দুগ্ধে কালসিয়মেরও পরিমাণ যতখানি ডিমেও তাহাই। এই ক্যালসিয়ম আমাদের দেহের অস্থি বর্দ্ধনের বিশেষ সহায়ক। ডিম খাইলে অস্থি খুব সবল হয়; আর ডিম্বে ভাইটামিন ও যথেষ্ট আছে—ডিম্বে চর্ব্বি ও কিয়ৎ পরিমাণে আছে এই চর্ব্বি আমাদের চক্ষুকে সুস্থ রাখে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—শরীর গঠনোপযোগী সকল দ্রব্যই ডিম্বে বর্ত্তমান, উপরন্তু ডিম্ব অতি সহজে হজম হয়, সেই জন্য ইহা দেহের পক্ষে মাংস ও অন্যান্য পুষ্টিকর আহার্য্য অপেক্ষা বেশী উপকারী—মাংস হজম হইবার সময় পাকস্থলীর ভিতর একরূপ বিষাক্ত নির্য্যাস বাহির হয়—ইহাই দেহে বাত রোগের সৃষ্টি করে, ডিম্বে এ সব কোন অপকারের লেশমাত্র ভয় নাই—৯টি ডিম্বে আধসের মাংসের পরিমাণ পুষ্টিকর দ্রব্য আছে—এই জন্য মাংসের বদলে ডিম ব্যবহার করা চলে, লঘু পথ্য বলিয়া রোগী ইহা ব্যবহার করিতে পারে। ১টী ডিম্বে অর্দ্ধ গেলাস দুগ্ধের কার্য্য করে। আমাদের দেশে যেরূপ জোলো এবং বীজাণু মিশ্রিত দুগ্ধ প্রচলিত হইয়াছে—তাহাতে ডিম্বের প্রচলন বাঞ্ছনীয়।

গ্রাম্য ঋণদান প্রথা

ক্যানেডা দেশের কৃষি কাউন্সিলের সভ্যগণ গ্রাম্য চাষীদিগকে ঋণদানের জন্য একটী খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। এই খসড়া সত্বরই ক্যানেডা দেশের সরকারের নিকট উপস্থাপিত করা হইবে।

এই খসড়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে সরকার কতকগুলি বণ্ড বিক্রয় করিয়া সাধারণের নিকট হইতে টাকা তুলিবেন—অতঃপর সেই টাকা উক্ত সরকারী

বণ্ডের সুদ অপেক্ষা একটাকা মাত্র অধিক সুদে কৃষকদিগকে বহু বৎসরের জন্য কর্জ্জ দেওয়া হইবে। প্রাদেশিক সরকার অথবা ক্যানেডা ডোমনিয়ান সরকার উক্ত কাগজের জন্য গ্যারিণ্টী থাকিবেন এবং উক্ত খসড়ার কার্য্য প্রণালী প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

কৃষি কাউন্সিলএর অভিমত এই যে কৃষিশিল্প রক্ষা করিতে হইলে কৃষি সাহায্যের নিমিত্ত কোনপ্রকার ঋণদানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

সমবায় কার্পাস পিঞ্জন সমিতি –

বোম্বায় সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার মিষ্টার জে, এ, মদন আই, সি, এস সম্প্রতি একটী পিঞ্জন সমিতির উদ্বোধন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন,এই সমিতি গত অক্টোবর মাসে রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছিল। ইহার মুলধন ৩০ হাজার টাকা, তন্মধ্যে ১৫০০০ টাকা ইহার একশত সভ্যের নিকট হইতে আদায় হয়। একটী ৮০ ঘোড়ার এঞ্জিন এই কলটী চালায়। ইহাতে ২৪টী জীন (পিঁজিবার কল) আছে—এই সরঞ্জামের খরচ ৪০ হাজার টাকা হইয়াছে। বোম্বাই প্রোভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক এই সমিতিকে অর্থ সাহায্য করিতেছেন, উদ্বোধনের সময় রেজিষ্টার মহাশয় সমিতিকে উত্তমরূপে পরিচালিত করা সম্বন্ধে কয়েকটী মূল্যবান উপদেশ দেন।

ভারতে তুলার চাষ—

মিষ্টার ডাব্লিউ, এইচ, হিমব্রী—ব্রিটিশ কটন গ্রোইং এসোসিয়েসনের প্রধান অধক্ষ, মেঞ্চাষ্টারের এই সমিতির নিকট তাঁহার ভারত ও আফ্রিকার ভ্রমণ সম্বন্ধে বিবরণ পেশ করিয়াছেন। এই বিবরণে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে বর্ত্তমান বৎসরে ভারতবর্ষে ৬০ লক্ষ বেল তুলা পাওয়া যাইবে। এবং পাঁচবৎসরের ভিতর ১ কোটী বেল পর্য্যন্ত উঠিবে। এই তুলার ভিতর, ভাল জাতীয় তুলার পরিমাণ যথেষ্ট থাকিবে। ভারতবর্ষের বাহিরে তাঁহার মতে উগাণ্ডা, সুডান ও নাইজারিয়া প্রদেশই তুলার চাষের পক্ষে উপযুক্ত স্থান। তিনি বলেন যে লাংকাশায়ারের যত পরিমাণ তুলার প্রয়োজন হয় তাহা সমস্তই এই ব্রিটীশসাম্রাজ্যের ভিতরেই উৎপন্ন হইতে পারে। এবং এই তুলা উৎপন্ন করিতে খরচ ও আমেরিকার মতই সস্তায় হইবে।

রাণাঘাট জন সাধারণ যৌথ ব্যাঙ্ক—

উক্ত ব্যাঙ্কের নূতন গৃহের উদ্বোধন উৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসবে বঙ্গীয় যৌথ সমিতির রেজিষ্ট্রার রায় বাহাদুর যামিনীভূষণ মিত্র বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি একটী সারগর্ভ বক্তৃতায় সকলকে যৌথ ব্যাঙ্কের কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিতে বলেন। তিনি সকলকে অনুরোধ করেন যে তাহারা বহুল পরিমানে এই-রূপে ব্যাঙ্ক স্থাপিত করিয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের শিক্ষা ও প্রসার বৃদ্ধি করুন। এই ব্যাঙ্ক হইতে বিশেষভাবে অভাব-গ্রস্থ বেকার বঙ্গযুবকগণকে, ছোট খাট ব্যবসায়ীগণকে এবং যে কোন ব্যবসায়েচ্ছু ব্যক্তিগণকে যথেষ্ট পরিমানে সাহায্য করা হউক। এই অভাব অনটনের দিনে এই রূপ সাহায্যে বেকার সমস্যা অনেকটা প্রশমিত হইতে পারে। উক্ত ব্যাঙ্কের শেয়ার হোলডার গণের সভায় নাকি অংশীদারগণ ও ডিরেক্‌ট্রগণের মধ্যে গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছিল কিন্তু সভাপতি রায় বাহাদুর মহাশয়ের কৃতিত্বে কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে নাই। সহরের অনেক গন্যমান্য ব্যক্তি লইয়া ব্যাঙ্কের নূতন বোর্ড মনোনীত হইয়াছে। আশা করা যায় অতঃপর বিবাদ বিসম্বাদ ছাড়িয়া দিয়া সকলে এই হিতকর অনুষ্ঠানটীকে উন্নত করিয়া তুলিতে যথাযোগ্য সাহায্য করিবেন।

'অণ্টারিয়তে' বীজের ট্রেণ।

এই বৎসর বসন্তকালে ক্যানাডার অন্তর্গত অণ্টারিয়া প্রদেশের সরকার তথাকার ২টী রেলওয়ে কোম্পানির সহায়তায় উক্ত প্রদেশের সমস্ত পূর্ব্বার্দ্ধে বীজপূর্ণ ট্রেণ চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই স্পেশাল ট্রেণে তিনখানি গাড়ী থাকিবে ইহার এক খানিতে বক্তৃতা দিবার জন্য লোক থাকিবে এবং দ্বিতীয় খানিতে পরিষ্কার এবং অপরিষ্কার বীজ থাকিবে এবং অপর

থানিতে বীজ পরিষ্কারক আধুনিক যন্ত্রাদি দেখান হইবে। যে সমস্ত কৃষক এই প্রদর্শনী দেখিতে আসিবে তাহাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে তাহারা যেন সঙ্গে অপরিষ্কার বীজ লইয়া আইসেন। এই সকল বীজ--উক্ত প্রদর্শনীর যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রদর্শনী ট্রেন যেখানে প্রথম থামিয়াছে সেই খানেই এত লোক দেখিবার জন্য আসিয়াছে যে তাহাদের সকলকে বিশদভাবে দেখান এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

চিঠিপত্র

নাগরিক নেতাদিগের প্রতি পল্লীবাসীর নিবেদন

নিম্নলিখিত পত্রখানি শ্রীসতীভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি।—

আঃ সঃ।

মহাশয়গণ, আজ আপনাদের পল্লীসংস্কারের একটা বড় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। উক্ত সংস্কার কল্পে প্রভূত চাঁদা আদায় করিয়াছেন। তাহার কার্য্যাবলী নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে, পুস্তিকা ও ফারম ইত্যাদিও ছাপা হইয়া গিয়াছে, উক্ত চাঁদায় পরিপুষ্ট হইয়া মনীষিগণ পল্লীবাসী দিগের দুঃখ বিমোচনের জন্য কলিকাতায় সুবৃহৎ হর্ম্মে অবস্থিতি করিয়া বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ায় মস্তিষ্ককে স্নিগ্ধ করিয়া সর্ব্বদায় চিন্তাতেও নিযুক্ত আছেন, পল্লীবাসী দিগের পক্ষ হইতে এই মুখবন্ধে তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি।

মশক ম্যালেরিয়াসেবিত পুতিগন্ধময়জলেপুষ্ট কঙ্কালদেহী-পল্লীবাসী আমরা—আমাদের নিকট হইতে অদ্যাপি আমাদের প্রধান কষ্টের বারতা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করা হয় নাই, এতদিন কেন আসি নাই? আমরা যে হতভাগ্য! তাহা না হইলে কি আমরা এই মাটি কামড়াইয়া বৎসরের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, অভাবের মধ্যে, রোগ শোকের মধ্যে, পড়িয়া থাকি? দরিদ্র কি কখনও ধনীর নিকট কথা কহিতে স্পর্দ্ধা করিতে পারে? তবে আজ আসিয়াছি—কত ভয়ে ভয়ে আজ আপনাদের নিকট একটী কথা বলিতে আসিয়াছি, শুনিয়াছি আপনারা দয়ালু। কৃপা করিয়া আমাদের একটা নিবেদন শুনিবেন কি?

সংস্কার বলিতে আপনারা যাহা বুঝাইয়াছেন তাহা সকলই বুঝিয়াছি। কিন্তু সংস্কারের প্রথম, আমাদের অন্ন সংস্কার—তাহার কথা কই? হয়ত আপনারা বলিবেন যে আজ কয়দিন হইল পল্লীসংস্কারের কথা উঠিয়াছে, ইহার মধ্যে সারা বাংলার অন্নসমস্যাসমাধান যাহারা চাহেন - তাহারা হয় বাতুল নয় নিন্দুক, কিন্তু কি করিব উহা ভিন্ন আমাদের আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। আজ যদি খাইতে পাই, দুদিন পরের সহিত বুঝিতে পারিব। আজ যদি আমার পয়সা থাকে তবে আপনাদিগকে বা কেন ব্যস্ত করিব? আর আপনারাও ত আসিবেন

আমাদের উপকার করিতে আমাদের ভিক্ষা দিতে? আমাদের অভাব অভিযোগ যে অনন্ত! আপনারা কত দিনই বা আমাদের চালাইবেন ?

আপনারা হয়ত লোকপরম্পরা আমাদের চরিত্রের কথা শুনিয়াছেন। যদি শুনিয়া থাকেন তবে হয় একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন না হয় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু সে কথা আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে আমরা পরশ্রীকাতর, আমরা মামলা-বাজ, আমরা প্রতিবাসীর জন্য একটু স্বার্থত্যাগ করিতে পারি না। আমরা আরও যে কত কি তাহা আপনা-দিগকে জানাইয়া আর আপনাদের অশান্তি আনিব না। মনে করিবেন না যে ইহাতেই আমারা শান্তিতে আছি— আমরা এই বিষে জর্জ্জরিত। আমাদের এই মনের ভাবের কারণ কি জানেন?—আমরা ক্ষুধার্ত্ত, আমরা দরিদ্র। আপনারা চিকিৎসক আমরা রোগী—রোগ নির্ণয় করিলেন, এখন ইহার ঔষধ দিন। দেখিবেন মাত্র এই রোগের চিকিৎসা হইলে আমাদের ম্যালেরিয়া থাকিবে না, আমরা সকলেই সুশিক্ষিত হইব—আপনারা যত গুণে গুণী সকল গুণই আমরা পাইব, বলিতে ভয় হয়, হয়ত আপনাদের যে গুণের অভাব সে গুণও আমাদের বরণ করিবে।

আমার কথা শুনিয়া হয়ত ভাবিতেছেন যে, আমি কত বড়ই না টাকার ফর্দ্দ আপনাদের নিকট বাহির করিব। নিশ্চিন্ত হউন, সে কথা একটী বারও বলিব না। পরন্ত আপনাদের সুসারের যাহাতে আরও প্রসার হয় সেই কথাই বলিব। তবে কৃতাঞ্জলি পুটে এই নিবেদন করি— বিশেষ বিবেচনা না করিয়া আমাদিগকে কোন উপদেশ দিবেন না; কারণ, জানেনইত আমরা অশিক্ষিত আমা-দিগকে বাজীকরের মর্কট নাচাইবার মত নাচানো বড়ই সহজ।

কখনও কখনও কলিকাতা মহানগরীতে গিয়াছি। সেখানে কত কারখানা, কত কারবার দেখিয়াছি। কখনও ব্যাঙ্কের ঘরে উঁকি ঝুঁকি মারিয়াছি, কত টাকার লেন দেন দেখিয়াছি। তখনই ভাবিয়াছি এই রকম কোন কাজ কি পল্লীগ্রামে হয়না? আবার ভাবিয়া ছি যতই টাকার খেলা হউক না কেন, ঐ টাকার উদ্ভব স্থান ত পল্লীতে, বা সুদূর প্রান্তরে বা পর্ব্বতে। সেই অবধি রাত্র দিন ভাবিয়াছি, আপনাদের কত লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি; কিন্তু কখনও কোন আশার বাণী পাই নাই। কিন্তু আজ যেন মনে হইতেছে, সুদূরে উষার অরুণরাগ দেখিতে পাইতেছি। সে আশার কথা দুই একজনকে বলিতে চেষ্টা পাইয়াছি, কিন্তু আমরা যে দরিদ্র, আমাদের কথা শুনিবার আপনাদের সময় কোথায়! আজ আবার সেই কথাই যোড়হস্তে নিবেদন করিতে উপস্থিত হইয়াছি, একবার দয়া করিয়া শুনুন। জানি আপনাদের সময় বড়ই কম, তত্রাচ আপনারা কৃপাবান, দয়া করিয়া একটু সময় করিয়া আমাদের নিবেদন গ্রহণ করুণ।

পল্লীগ্রামে কৃষি ও শিল্পের দ্বারা অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইবে, কৃষিকর্ম্ম ত পল্লীগ্রামেরই নিজস্ব; কিন্তু তাহার অবস্থা কখনও সমালোচনা করিয়াছেন কি? যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দেখিয়াছেন যে বাংলা দেশে যত জমি আছে তাহার উৎপন্ন শস্যের মূল্যের অনুপাত করিলে বিঘাপ্রতি ১৲ একটাকাও আয় নাই। কত জমি চাষ অভাবে পতিত রহিয়াছে উহার প্রধান কারণ লোক ও জলাভাব। আবার শত শত পল্লী আছে, যাহাতে গত ত্রিশবৎসর সময়ের মধ্যে শতকরা ৮০ জন লোক নানাকারণে অন্তর্হিত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রাম মধ্যস্থ জমি বনজঙ্গল আগাছা পুর্ণ হইয়া রহিয়াছে। গ্রামবাসী সর্ব্বদাই অভাবগ্রস্ত টাকা কোথায় পাইব যে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ঐ সকল জমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করিবে?

আবার যে দিকে জমি চাষ হইতেছে তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সুসময়ের কথা স্মরণ করুণ। নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর সময়ের কথা পুরাতন হইলেও বিবরণেতিহাসে জলন্ত অক্ষরে রহিয়াছে। কল্পনা করুণ একজন সেই সময় নিদ্রিত হইয়া আজ সুপ্তোত্থিত হইয়া দেখিতেছে—'কি দেখিতেছে—সে দেখিয়াছে বৈশাখ মাসে গঙ্গার জল ধীরে ধীরে আসিতেছে আষাঢ় মাসে নদী নালা সব ছাপাইয়া গ্রাম প্রান্তর সব

জলে টুপ্‌ টুপ্‌ করিত আজ সে জল কোথায়! আশ্বিন মাসে মা দশভুজার বিসর্জ্জনে কত শতশত নৌকা গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে আনন্দে নৃত্য করিত—আজ সে পূজাও নাই-সে নৌকাও নাই। কার্ত্তিক মাসে জল সরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে রবিশস্যের বীজ ছিটাইয়া দিত, চাষের প্রয়োজন হইত না। পৃথিবীতে যত প্রকার শ্রেষ্ঠ সারের আবিষ্কার হইয়াছে তাহার মধ্যে পলিমাটী অন্যতম। সেই পলিমাটীতে বীজ পড়িয়া যে প্রভূত শস্য উৎপন্ন হইত, তাহা ঐ সুপ্তোত্থিত পুরুষ দেখিয়াছে। দেখিয়াছে কৃষকের সহিত ভূম্যধিকারীর কলহ হইতেছে। ভূম্যধিকারীর অংশে কৃষক বেশী শস্য দিতেছে কারণ, তাহার রাখিবার স্থান নাই; আবার গৃহস্থও লইতে চাহিতেছে না কারণ তাহার ও রাখিবার স্থানাভাব, আর আজ সে কি দেখিতেছে? যাহা দেখিতেছে, বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, চক্ষু মুছিতেছে, আবার দেখিতেছে—সেই ক্ষেত্র হইতে মুষ্টিমেয় উৎপন্ন লইয়া কৃষক বুক দিয়া তাহা আঁকড়াইয়া রহিয়াছে, গৃহস্থ তাহার দুর্ব্বল দুইখানি হস্ত কৃষকের বুকের মধ্যে দিয়া উৎপন্নের অংশ লইতে চেষ্টা করিতেছে, কৃষক তাহাকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিতেছে। ঐ পুরুষ আর দেখিতে পারিতেছে না, তার চক্ষু রক্ত বর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার মনে হইতেছে সে পাগল হইয়া গিয়াছে। চৈত্র মাস আসিত, চাষা হাসিতে হাসিতে ক্ষেত্রে যাইত, হেলায় দু'টা চাষ করিত, আগাছা সরাইয়া দিত, বৃষ্টি হইলেই ধান্যের বীজ ছিটাইত, সময়ে প্রচুর ধান্য পাইত। ঐ পুরুষ বর্ত্তমানের সহিত তুলনা করিতে বসিয়াছে। অবাক হইয়া গিয়াছে—ভাবিতেছে, একি ভোজবাজী!

পূর্ব্ব পুরুষ যে ভাবে চাষ করিত, চাষা আজও সেই ভাবেই চাষ করিতে চায়। বাধ্য হইয়া একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়াছে। কার্ত্তিক মাসে কিছু চাষ দিয়া রবিশস্য আবাদ করে। মানবের সংস্কারের পরিবর্ত্তন হওয়া বড়ই কঠিন। চাষাকে চাষ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে যান, তাহার ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা দেখিতে পাইবেন। তাহারা পুরুষানুক্রমে চাষ করিতেছে তাহারা চাষ জানে না, জানেন আপনি ও আমি? আপনারা যে এসম্বন্ধে কিছুই চেষ্টা করেন নি তাহা নয়, সভা সমিতিতে, সংবাদ পত্রে ও মাসিক পত্রিকায় কতবার আপনারা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু নিবেদন করি, ওভাবে বলিলে চলিবে না। আজ যদি আমি তাহার সহিত একত্রে চাষ করি, উন্নত প্রণালীতে চাষ করিয়া আজ যদি তাহাকে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ দেখাইয়া বুঝাইতে পারি, তাহা হইলে সে বুঝিবে। সে আবার হাসিবে, তাহাকে আমার হাসাইতেই হইবে! সে যে আমার সব! আপনাদের সহিত আমার পার্থক্য আছে কিন্তু তাহার সহিত আমি যে এক পরিবারে থাকি।

বুঝিলাম আমাকেই করিতে হইবে, মাঠে গেলাম লাঙ্গলের মুষ্টি চাপিয়া ধরিলাম। পাঁচ মিনিট অনভ্যস্ত সূর্য্যকিরণে থাকিয়া শুষ্কমৃৎখণ্ডে আমার সুকোমল পদযুগল ক্ষতবিক্ষত হইল, হস্তের মুষ্টি শিথিল হইল, গলদঘর্ম্ম হইয়া নিরাশ হইয়া লাঙ্গল ছাড়িয়া দিলাম, চাষা হাসিতে লাগিল। বুঝিলাম ঐ ভাবে আমরা কিছুতেই চাষের নিকট যাইতে পারিব না, বিফল হইয়াও আশা ত্যাগ করিলাম না। শুনিলাম, মেসপটমিয়ার অনুর্ব্বর প্রান্তর—সুজলা সুফলা, শস্যশালিনী হইয়াছে মাত্র মানুষের বুদ্ধিবলে। আমাদের বৃটিশ গবর্ণমেণ্টই ঐ চাষ করাইয়াছেন। প্রাণীশক্তিচালিত কৃষিযন্ত্র আদৌ ব্যবহার হয় নাই। আশা পাইলাম, সংবাদ লইতে লাগিলাম, পরে বাংলা দেশেও কতিপয় ব্যক্তিকে ঐ কলের চাষের উদ্যোগী দেখিলাম। আবার তাহাদের বিফলতা দেখিলাম, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলাম, রোগ নির্ণয় করিলাম, প্রতীকারের কথা ভাবিলাম এবং সমাধানও করিলাম, এখন যাহা বুঝিয়াছি তাহাই আপনাদিগের গোচর করিতে যুক্তপাণি দণ্ডায়মান হইয়াছি।

প্রাণীশক্তি বলিতে গো, মহিষ ও অশ্বাদির সাহায্যে যে কার্য্য করিতে পারি তাহাই বিবেচিত হইতেছে। লাঙ্গলাদি কৃষি যন্ত্র আবহমান কাল ঐ শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া আসিতেছে। খদ্দরের কাপড় পরিধান করা এবং গো মহিষাদির দ্বারা চাষ করা ব্যয় সম্বন্ধে

তুল্যমূল্য। বাড়ীতে তুলার গাছ লাগাইয়া নিজ হাতে সুতা কাটিয়া, নিজে তাঁত বুনিয়া কাপড় প্রস্তুত করার সহিত, নিজ গরুর বাছুর প্রতিপালন করিয়া, নিজ ক্ষেত্রোৎপন্ন বিচালির দ্বারা পুষ্টকরতঃ নিজে হাতে লাঙ্গল চালান—তুলনা ঠিক হয়, ইহা অপেক্ষা সুবিধা আর কোন প্রকারেই হইতে পারে না। নিজ পছন্দ মত খদ্দরের বস্ত্র যদি কিনিতে হয়, তাহা হইলে সকলেই অবগত আছেন, মূল্য প্রায় দুই জোড়া মিলের কাপড়ের সহিত সমান। সেইরূপ যদি কৃষিকার্য্যের জন্য মূল্য দিয়া সকল ব্যবস্থা করিতে হয় তাহা হইলে তাহার ব্যয় যে কত অধিক তাহার তালিকা দেওয়া বাহুল্য।

গো মহিষাদি প্রতিপালন চাষের আনুসঙ্গিক একটী অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। আজকাল আমাদের পল্লীগ্রামে গোপালন যে কি কঠিন সমস্যা হইয়াছে তাহা হয়ত আপনারা অবগত নহেন। সয়তানের রজতচক্র টাকা আপনাদিগকে ও আমাদিগকে কেন আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত নরলোককে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। চাষাই বা তাহার বাহিরে যাইবে কেন? সে আর ধান বুনিতে চাহে না, পাট! পাট! পাট! পাট হইতে এক ছটাকও গরুর খাদ্য উৎপন্ন হয় না। সকলেই ভাবে এই টাকা দিয়া কিনিয়া খাওয়াইব। কিন্তু যাহা উৎপন্ন হয় নাই, তাহা মূল্য দিলেই বা কোথায় পাইব। তাহার পর আমাদের—চাষীদের বিশ্বাস যাহার যত অধিক জমি হইবে তাহার তত অধিক লাভ হইবে। একখানি লাঙ্গলে তাহারা ১৬/ ষোল বিঘা হইতে ২০/ বিঘা জমি চাষ সাধারণতঃ করে, এবং কৃষিকার্য্যে যথাসম্ভব একহাত পরিমাণ স্থানও তাহারা ফেলিয়া রাখিতে চাহে না। ফলে গোচারণ ভূমি কোথায়? ভাবিতে পারেন গ্রাম ত এখন জঙ্গলপূর্ণ, তাহাতে গো মহিষাদির আহার্য্য সংগ্রহ হইতে পারে। ভগবান! জঙ্গলে গিয়া দেখুন মাত্র শ্যাওড়া ও নানা প্রকার আগাছা ব্যতীত গোজাতির আহার্য্য এক স্থানেও খুঁজিয়া পাইবেন না। বর্ত্তমান যুগের চাষীরা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের চাষের আর একটী ধারাও পরিবর্ত্তন করিয়াছে। পূর্ব্বে উল্লিখিত পতিত চাষ হইত অর্থাৎ এক জমি ২।৩ বৎসর চাষের পর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করাইবার জন্য পুনরায় ফেলিয়া রাখিত এবং ঐ সকল জমিতে গোচারণ হইত। এখন লোভে বুদ্ধি হারাইয়া আর তাহা করে না। ফলে গোচারণ দূরে থাকুক উন্মুক্তস্থানে গো মহিষাদি দাঁড়াইবার পর্য্যন্ত স্থান নাই। ফলে গোজাতির স্বাস্থ্য কি হইয়াছে, আপনারা রেলে উঠিয়া দার্জ্জিলিং যান, তখন চাহিয়া দেখিবেন, দেখিলেই আপনাদের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিয়া যাইবে। প্রাণীশক্তির আর একটি অসুবিধা আছে, যে তাহার ব্যবহারের একটা পরিমাণ রাখিতে হয়। অর্থাৎ তাহার সামর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, হয় ৩ ঘণ্টা কিংবা ৪ ঘণ্টা পরে তাহাকে অবসর দিতে হয়।

যন্ত্রের শক্তি আমার অর্থের প্রতি নির্ভর করে। আমি ইচ্ছা করিলে বিংশ অশ্বশক্তি বা পঞ্চাশৎ অশ্বশক্তি শালী যন্ত্র লইতে পারি। প্রাণীশক্তির ব্যবহার করিতে হইলে, ঐ জন্তুর দুঃখ কষ্টের কথা আপনার আগে মনে আসিবে আর যন্ত্রশক্তিকে আপনি যত খাটাইতে পারেন খাটান, তার পরিশ্রম হয় না। প্রথমতঃ ইহার প্রধান অসুবিধাগুলি নিরাকরণ করা যাউক, (১) ইহার মহার্ঘতা, (২) ইহার সংরক্ষণ (৩) ইহার পূর্ণ শক্তির ব্যবহার না করিলে অপব্যয় হইবার সম্ভাবনা ( ) পরিচালনার ব্যয়।

১। উল্লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে গিয়া প্রথম, মহার্ঘতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক;—একটী চাষের সর্ব্বপ্রকার সরঞ্জাম সহ ট্রাকক্টর (মোটর লাঙ্গল) খরিদ করিতে প্রায় ৩৭৭৫৲ খরচ পড়ে। তাহাতে অবলীলাক্রমে ৩০০ শত একর অর্থাৎ ৯০০/০ বিঘা জমি চাষ চলে। ঐ জমিতে গোমহিষাদি চালিত লাঙ্গলের হিসাব করিতে গেলে, দেখা যায়, যদিও একটা লাঙ্গলে ১০/ বিঘা জমির উপর চাষ করা যায় না, তবে জমির পরিমাণ অধিক হইবার জন্য ১৫/০ বিঘা অনুপাতে লাঙ্গল ব্যবহার করা যাইতে পারে। অতএব ৯০০/০ জমিতে ৬০ জোড়া বলদের প্রয়োজন, তাহার মূল্য বলদ প্রতি ১০০৲ধরিলে ১২০০০৲ হয়। অতএব মহার্ঘতার

বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে কলের মূল্য অধিক হইল না। তবে ফসল মাড়ায়ের ব্যবস্থার জন্য বিবেচনা করা প্রয়োজন। এদেশেও আমেরিকার ন্যায়—থ্রেসিং কন্সার্ণ করা যাইতে পারে। যাহারা খরচ লইয়া সকলের শস্য মাড়াই করিয়া বেড়াইবে। তাহার জন্য যে খরচ দিতে হইবে, তাহা এখানে গোমহিষাদির দ্বারা মাড়াই খরচের অনুপাতে অনেক কম। অর্থাৎ তাহার খরচ শতকরা ৫০৲ টাকারও কম হইবার সম্ভাবনা, সে খরচ চাষের উপর পড়তা করা যাইতে পারিবে।

২। সংরক্ষণ—দেশী লাঙ্গল একজন নিরক্ষর চাষী দিয়া চলিতে পারে, অর্থাৎ ১৮৲ বেতনের লোকের দ্বারা সম্ভব, কিন্তু কলের লাঙ্গলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত লোক প্রয়োজন। হয় ত মনে করিতেছেন একজন বি, এ, বি, ই ফরমাইস করিয়া বসিলাম, কিন্তু তাহা আদৌ নহে। আপনাদের মোটর গাড়ী আছে, আপনাদের ৪০৲ মাহিনার চালকই ইহা রক্ষা করিয়া থাকে। উক্ত কলের লাঙ্গলের কলকব্জা, আপনাদের মোটর গাড়ীরই অনুরূপ। একটা চতুর ছেলেকে ছয় মাস শিক্ষা দিয়া আনিলেই যথেষ্ট। তাহার বেতন এখানে ৩০৲ টাকা আর তাহার খোরাকী দিলেই যথেষ্ট হইবে, এবং তাহার আনুসঙ্গিক আর ৩ জন লোক প্রয়োজন যথা একজন ক্লিনার (cleaner) ও ২ জন খালাসী। তাহাদের বেতন ২০৲ টাকা ও ১৫ টাকা হবে এবং খোরাকী দিলেই যথেষ্ট লোক পাওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ ৮০৲ টাকা ও তাহাদের খোরাকী ৪০৲ একুনে ১২০ টাকা মাসিক ব্যয় হইবে। পক্ষান্তরে ৬০খানি লাঙ্গলের ব্যবস্থা রাখিতে হইলে অন্তত ৬০ জন লোকের প্রয়োজন। তাহাদের আপখোরাকী বেতন ১৫৲ টাকা হারে দিলেও মাসিক ৯০০৲ লাগিবে, তাহার অনধিক হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। বলিতে পারেন, ফসল নিড়াইবার জন্য আর লোকের প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু কলের চাষে যে আমাকে আদৌ নিড়াইতে হইবে না, দুইবার ডিস্ক হ্যারো (disc harrow) ও দুইবার স্পাইক হ্যারো (spike harrow) দিলে যে মাথায় যেমন চিরুণী দিয়া আচড়ান যায় এই প্রকার জমির মধ্যে আঁচড়াইয়া যাবতীয় আগাছা শিকড় ইত্যাদি বাহির করিয়া লইয়া আসিবে।

৩। উহার পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার না করিলে অপব্যয় সম্ভাবনা, এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। বাস্তবিক, যাহা হইতে যে কাজ করিতে পারি, সে কাজ যদি না লওয়া হয়, তাহাই অপব্যয় নচেৎ অপব্যয় আর কাহাকে কহে? ৬০ জোড়া গরু লইয়া যদি ১০০/০ বিঘা জমি চাষ করি তাহা অপব্যয় নহে কি?

৪। যথার্থ অসুবিধা, ইহার ব্যয়। সংরক্ষণ সম্বন্ধে বলিবার সময় ব্যয় সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। এক্ষণে ইহার অপর ব্যয় দেখা যাউক। কেরোসিন তৈলে ইহা চলে। যত জমির পরিমাণ অল্প হইবে, ততই ইহার খরচ অধিক। অর্থাৎ কলের লাঙ্গল প্রত্যহ ৫০/ বিঘা জমি চাষ করিতে পারে তৎসত্ত্বে যদি তাহাকে ১০/ বিঘার পরিমাণ করা যায় তাহা হইলে ব্যয় ৩০/ বিঘার পরিমাণের অনুরূপ হইবে। যদি ৫০/ বিঘা লম্বা জমি হয় তাহা হইলে ব্যয় প্রতিবিঘা ৮০ হইতে ১৲ করিয়া পড়িতে পারে। অর্থাৎ ৫০/ বিঘার ব্যয় ৩০৲ টাকার অধিক হইবে না। পক্ষান্তরে গোমহিষাদির ব্যয় দেখুন। আমি চাষ করি আর নাই করি, প্রতি গোরুর খোরাকি অত্যল্প হিসাবে ধরিলেও, ১২০টা গরুতে ৩০৲ টাকা দৈনিক খরচ পড়ে। ৩৬৫ দিন চাষের প্রয়োজন হয় না। খুব বেশী কাজ করিলে বৎসর ৬ মাস কাজ করিবে, কিন্তু গো মহিষাদির খোরাকি প্রত্যহই দিতে হইবে, অথচ ট্রাক্টরে যেদিন কাজ না করাইবেন সে দিবসের ব্যয় নাই।

কল নষ্ট হইয়া যাইবার কথা বিবেচনা প্রয়োজন। অথচ কলকব্জার জিনিস, ভগ্ন হইবার কথাই। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, ভাঙ্গিলে মেরামত হয় কিন্তু মরিলে বাচান যায় না। একটী গোমড়ক যদি উপস্থিত হয় তাহা হইলে ১০ দিন মধ্যে আমার ১২০০০৲ টাকা মূল্যের চাষের কাজ একটীও বাঁচিতে নাও পারে। আবার আমার ট্র্যাকটর বিমা করিয়া রাখিলে খারাপ হইয়া যাইবামাত্র, একটা নূতন কল পাইতে পারি।

বলিতে পারেন শুনিলাম ত সব কথা এখন জমি

কই ? একত্রে ৯০০/ বিঘা জমি পাইতে হইলে হয় ত দেশ ছাড়িয়া যাইয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। আমার "বেকার-সমস্যা ও কৃষি সমবায় সম্বন্ধে দুই একটা কথা" পুস্তিকার ইঙ্গিতে সে কথার সমাধান করিয়াছি। সেই কথারই কিছু পুনরাবৃত্তি করিতেছি। জমির ও অভাব নাই। প্রত্যেক পল্লী পরিবেষ্টিত হইয়া শত শত বিঘা জমি রহিয়াছে। এই সকল জমি পৃথক্ পৃথক্ আইল করিয়া পৃথক্ পৃথক্ লোকে চাষ করিতেছে। এই জমি যদি একত্র করিয়া তাহার লভ্যাংশ যদি পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি সমান অংশে বণ্টন করিয়া পায়, তাহাতে তাহাদের কোনই ক্ষতি হইতে পারে না, অবশ্য তাহারা তাহাতে যদি উপস্থিত যাহা লভ্যাংশ হইতেছে, তাহা হইতে আয় কমিয়া যায় তাহাতে ক্ষতির কারণ বটে। কিন্তু যে যে কারণে শস্যের পরিমান অল্প হয়, তাহার কারণ ও সম্পূর্ণ নিরাকরণ করা হইয়াছে। ঐ সকল কারণ দূর করিয়া উক্ত প্রণালীতে অল্প ব্যয়ে চাষ করিবার জন্যই এই চেষ্টা, তখন উপস্থিত উৎপন্ন হইতে আয় অধিক হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যদি বেশী কষ্ট না করিয়া অধিক লাভবান হই, তাহাতে রাজী কে না হইবে ? হয়ত যতদিন এই প্রকার কাহাকেও লাভবান হইতে না দেখিবে, ততদিন জমি সংগ্রহ করা সুকঠিন। কিন্তু একবার প্রচুর লাভ দেখিলেই এত অধিক জমি সংগ্রহ হইবে যে তাহার সুব্যবস্থা করিতে বড়ই বিপন্ন হইতে হইবে।

ইহার প্রথম সাফল্যের উপর দেশের আশা ভরশা নির্ভর করিতেছে। অপর দেশের বিবরণ পাইয়া এবং নিজেরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া নিশ্চিত প্রতীতি হইয়াছে যে, সাফল্য অনিবার্য্য। কিন্তু ব্যবস্থায় যদি ত্রুটি থাকে, তবে মন্দ ফল হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে, নহে। ইহার সাফল্যে সহায়তা করিবার জন্যই আপনা দিগকে অহ্বান করিতেছি।

উল্লিখিত প্রকারে জমিতে লাভ দেখিতে পাইলে জমি সংগ্রহ করা সহজ বটে কিন্তু প্রথমে কাহারা বা উদ্যোগী হইবে—বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের গৃহস্থ জমি বর্গা বিলি দিয়া অন্ন সংস্থান করেন শুনিয়া থাকিবেন। ঐ সকল জমি হইতে তাহারা কি পাইতেছে একবার তাহার অনুসন্ধান লউন, জানিতে পারিবেন যে, খাজনা বিলি করিয়া দিলে যে লাভ পাওয়া যায়, সে আয়ও অনেক স্থান হইতেছে না। গৃহস্থ বলিতে মধ্যবিত্ত লোক বুঝিয়াছি, তাহারা যদিও আপনাদের ন্যায় শিক্ষিত লোক নহেন, তত্রাচ আমাদের দেশে তাঁহারাই শিক্ষিত—এই চাষের ব্যাপার বুঝান কিছু কঠিন নহে। আপনারা হয়ত শুনিয়া সুখী হইবেন, কোন কোন স্থানে ঐ কার্য্যে ব্রতী হইতে এই প্রকার ভদ্রলোকগণ নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছেন।

আমাদের শাস্ত্রে ও আছে "সঙ্ঘশক্তি কলৌযুগে।" এই যুগের কোন কাজে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, সকলকে একত্রিত হইয়া সংঘের প্রণালীতে কার্য্যোদ্ধার করিতে ইহবে। স্থির করুন, এখন ২৫ জন গৃহস্থের এক মাঠে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ৯০০ বিঘা জমি আছে। তাঁহারা কি ভাবে সমবায় প্রণালীতে কার্য্য করিবেন ? এক গ্রামের ২৫ জন গৃহস্থের জমি দেখিতে গেলে প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবেন যে একজনের জমির সহিত আর এক-জনের জমির সংলগ্ন। এই প্রকার সঙ্ঘবদ্ধ হইতে গেলেই যেখানে ১/ বিঘার একটী বন্দ ছিল তাহা পঞ্চাশ বিঘা হইয়া যাইবে। আর কোন কোন স্থানে এওয়াজ ফেরী করিয়া লইলেই জমি সকল বৃহদায়তন হইবে।

আপনার যেমন কোন কোম্পানী করিতে গেলেই অংশ করিয়া তাহার মূলধনকে ভাগ করিয়া লইয়া কার্য্য করেন, এখানেও ঠিক সেই মত হইবে। তবে ইহাতে কিছু নূতনত্ব আছে। আপনারা যেমন ৯০০ শত টাকার মূলধনের একটা ব্যবসাকে ৯০০শত অংশে বিভক্ত করিয়া প্রতি অংশের মূল্য ১৲ টাকা হারে করেন, এখানে ৯০০ বিঘার একটা সমবায় ৯০০ শত অংশে বিভাগ করিয়া প্রতি অংশে ১ বিঘা করিয়া জমি স্থির করিতে হইবে কিন্তু শুধু জমি হইলেই সকল কার্য্য হইল না, উহার কার্য্য পরিচালনার জন্য ব্যয় প্রয়োজন। সে কারণে ঐ সমবায়ের প্রতি অংশের মূল্য ১ বিঘা জমি আর কিছুটাকা। সেই টাকার পরিমাণ সকলেই একত্রে সম্মিলিত হইয়া ব্যয়ের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়া লইতে হইবে।

একটী অসুবিধা প্রায় সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইবে—যথা জমি সংগ্রহ করা সুবিধা না হইলেও, ঐ সকল গৃহস্থের প্রথমে মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন হইবে—আপনারা এ কার্য্য অতি সহজে করিতে পারেন।

আপনারা ব্যবসায়ের সুপরিচালনার জন্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। ব্যাঙ্ক কাহাকে টাকা দেয় তাহা আপনারা আমাদের অপেক্ষা ভালই জানেন, উহা প্রতিষ্ঠানকে টাকা দেয়, প্রতিষ্ঠান কাহাকে কহে? যাহার সংরক্ষিত মূলধন ব্যাঙ্কে নানা আকারে মজুত আছে অথবা যাহার নিজ কারখানায় প্রচুর মূল্যের যন্ত্রাদি আছে অথবা যাহার যথেষ্ট ভূমি সম্পত্তি আছে, অথবা যাহারা অধিক দিবস হইতে সততার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ব্যাঙ্কের বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন, তাহাদিগকে 'প্রতিষ্ঠান' বুঝিয়া থাকেন।

এখানে সমবায় প্রতিষ্ঠিত একটা কৃষিকেন্দ্রের দিকে দৃষ্টি করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, ঐ সমবায়ের নিজস্ব ৯০০/০ বিঘা জমি আছে—যাহার মূল্য, স্থানে আসিয়া অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবেন যে—গড়ে বিঘা প্রতি অন্যূন ১০০৲ অর্থাৎ ৯০০/ বিঘার ৯০০০০৲ মূল্য হইবে। তখন ৯০০০০৲ হাজার টাকার প্রতিষ্ঠার উপর টাকা ধার দেওয়া ব্যাঙ্কের bad policy নহে। ব্যাঙ্ক সমবায় কৃষিকেন্দ্রকে ধার দিবে এবং কৃষিকেন্দ্র যে সকল অংশীদারগণ মূলধন দিতে না পারিল তাহাদের লভ্যাংশ হইতে ঐ সুদের টাকা কাটিয়া লইয়া বৎসর বৎসর নিজের সংরক্ষিত ভাণ্ডার হইতে বা গৃহস্থের লভ্যাংশ হইতে ঐ হাওলাতী টাকা পরিশোধ করিয়া দিবেন, দেশে দুই দশটী কৃষিকেন্দ্র এবং শিল্পকারখানা হইয়া গেলেই নিজেরাই ব্যাঙ্ক সংস্থাপন করিয়া লইতে পারিবেন বা তৎপূর্ব্বেই লিমিটেড্ কোম্পানি করিয়া ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবেন। আর সরকারী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক দেশে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহার সুবিধা ঐ সকল কৃষিকেন্দ্র সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিতই পাইবে।

এখন কথা উঠিবে যে কলের লাঙ্গলে চাষ হইতে পারে বটে, কিন্তু জমি ত আর পড়িয়া নাই। কোন না কোন চাষা তাহা হইতে উদরান্ন করিতেছে তবে এই চেষ্টার মূল কি তাহাদের নিরন্ন করা? আমার প্রতিপক্ষগণ, আমি আরম্ভ করিতেই এ বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিয়া দেন। আপনারা ত শুনিবেন বলিয়াছেন, দয়া করিয়া আমার বক্তব্যের শেষ শুনিয়া মতামত দিবেন।

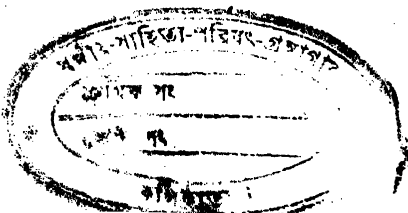
যে কোন কারখানাতেই যাইনা কেন, তিনটি শক্তির ব্যবহার দেখিতে পাই। প্রথম বুদ্ধি, দ্বিতীয় অর্থ, তৃতীয় মনুষ্য। ইহার কোন একটীর অভাব হইলে অপরটি অচল। আমার বাংলায় কি মানুষ নাই? আপনারা সহরের আশে পাশে যে সকল কল কারখানা করিয়াছেন, তাহাতে শ্রমিক ভারতের বিভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া একটা ভয়ানক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। দেশের লোকের সহিত তাহাদের সহানুভূতি নাই। তাহারা টাকা রোজগার করিতে আসিয়াছে, যে কোন ভাবেই হউক তাহারা টাকা রোজগার করিয়া লইয়া যাইবে। তাই চুরি, রাহাজানি, আপনাদের এখানে দৈনিক ব্যাপার। আজ আমার দেশের জনশক্তি কয় বিঘা জমিতে মোহিত হইয়া নিজেদের পেটও ভরাইতে পারিতেছে না, আর দিন দিন সর্ব্বনাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

এ বিষয়ে আপনাদের সহিত মতভেদ নাই যে ভগবানের কার্পণ্য নাই। তিনি সব দেশে তাঁহার বিভব সকলকে সমানভাবে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। আমার বাংলার জমি আর আমেরিকার জমিতে কোনই প্রভেদ করেন নাই, তিনি বুদ্ধি সকল জাতিকে সমান ভাবে দান করিয়াছেন। তবে যে তাঁহার বৈভবের প্রকৃত অনুশীলন না করে, সে পাপী। আজ আমেরিকার চাষের কথা যখন শুনি, তখনই তাহাদের নিকট সম্ভ্রমে মাথা নত হইয়া তাহাদের পদধূলি লইতে ইচ্ছা করে। আমরা মাত্র তাহাদিগকে অনুকরণ করিলেই আমাদের নিরন্ন সমস্যার সমাধান করিতে পারিব। আজ যদি ঠিক চাষ করিতে পারি তাহা হইলে প্রতি বিঘা হইতে ১০০৲ টাকা রোজগার করা একটা কিছুই নয়।

আমাদের অর্থের অপব্যয় না করিলে প্রতি কৃষিকেন্দ্র হইতে বৎসরে সহস্র সহস্র মুদ্রা উদ্বৃত্ত করিতে পারিব, এবং ৮.১০টি কেন্দ্র সম্মিলিত হইয়া একটা কারখানা করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এইরূপে শিল্পকার্য্যের কারখানা পরিচালিত করিয়া আমরা দেশের জনশক্তির সম্পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করিতে পারিব।

নিজ প্রয়োজনের নিরাকরণ না হইলে অপরকে সাহায্য না করা মানবের স্বধর্ম্ম। পূর্ব্বযুগে ব্রাহ্মণ অপর বর্ণের উন্নতির জন্ম তৎপর হইয়া রাজার অনুষ্ঠিত যজ্ঞ করিয়া প্রজার উন্নতি সাধন করিতেন, কারণ, প্রয়োজন তাঁহাদের অতি অল্পই ছিল এবং তাহাও রাজাই সমাধান করিতেন। এযুগের কমলার বর পুত্র আপনারাই ব্রাহ্মণ। আপনাদের স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। দশখানা মোটর গাড়ী, দশটা দারোয়ান, কি দশখানি বাড়ী কি বৈভব? একবার ভোগ করিলেই তাহার তৃষ্ণা মিটিয়া যায়। আপনাদেরই একজন সেদিন প্রকৃত বিভবের আস্বাদ পাইয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। সেই আপনাদের চিত্তরঞ্জন। আপনাদের মধ্যে ত অনেক কোটীপতি আছেন, কিন্তু তাহার মত ধনী কেহ আছেন কি? হাতী দিয়া হাতী ধরিবার মত টাকা দিয়া টাকা ধরা ভোগ নহে। টাকার অপর নাম অর্থ, অর্থ শব্দের অর্থ বিকল্প। অগণিত রৌপ্য খণ্ড থাকিলেই ধনী হইল না, যে তাহার উপভোগ করে সেই প্রকৃত ধনী। অর্থের প্রকৃত উপভোগই দান। আবার যে রৌপ্য খণ্ড ব্যতিরেকে সে কার্য্য সমাধন করিতে পারে সেই প্রকৃত মনুষ্য—প্রকৃত কর্ম্মী। আজ বলুন ত আপনারা কত কোটীপতি আছেন আর চিত্তরঞ্জনের সময় ও তাঁহারা ছিলেন, কিন্তু তত্তুল্য ধনী কেহ আছেন কি? থাকুন আর নাই থাকুন আপনারা তাহারাই পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, আপনারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, আসুন এই মহাযজ্ঞের হোতা হউন, আপনাদিগকে আসিতেই হইবে। সেই রাজার রাজা শ্রীভগবানের আইন কখনও রদ হইবার নয়, আজ সামাজিক বিপ্লব, অর্থবিপ্লব, স্বাস্থ্যবিপ্লব যে সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সাম্য হইতেই হইবে। ক্ষেত্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছে—মধ্যবিত্ত মৃত্যুর দ্বারে পৌছাইয়াছে—চাষীর মধ্যে বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে—সামাজিক বিপ্লবে আজ সমাজ খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছে—রোগ, মহামারী আজ অগ্নিরথে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। আজ যদি ভগবান সত্য হয়, তবে নিশ্চয়ই আপনাদিগকে আসিতে হইবে। সিদ্ধির সহজ পন্থা শব সাধনা—ঐ সাধনার প্রয়োজন শ্মশান—আজ আমার পল্লী শ্মশান, আমরা চণ্ডাল, আমরা মৃত, আসুন, আমাদের বুকে বসুন, আপনাদের উত্তর সাধকের অভাব নাই, আপনারা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবেন।

সভা সমিতি, কাউন্সিল, কমিশন কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবেন না। একমাত্র স্বাবলম্বনই স্বরাজ এবং স্বাবলম্বনের মূল কৃষি তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আজই হউক আর একদিন পরেই হউক, আপনাদিগকে এই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। জল ফিল্টার করিয়া খাও, কেরোসিন ঢালিয়া মশা মার প্রভৃতি বক্তৃতা পল্লী সংস্কার নহে। আপনারা কৃতী, বিজ্ঞ আপনাদের নিকট বেশী বলা প্রগল্‌ভতা—পূর্ব্বেই বলিয়াছি আপনারাই আমাদের সব, একবার আসিয়া আমাদিগকে ব্রতী করুন, একবার আসুন কণ্ঠে কণ্ঠে মিলাইয়া গান গাহি "বন্দে মাতরম্"।





কাজের কথা

গাভীর প্রসবকালে যত্ন।

প্রসবের অনতিকাল পূর্ব্বে গরুর পালান দুধে ভারি হইয়া আসে। যোনিদ্বারও ফুলিয়া উঠে। লেজের নিম্নভাগ নামিয়া গেলেই বুঝিতে হইবে যে এইবার প্রসব হইবে। গাভী তখন অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে তখন উহাকে কোনরূপেই বিরক্ত করা উচিত নহে। প্রসবের প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে ফুল পড়ে কিন্তু ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল কিছুতেই ফুল রাখা উচিত নয়।

প্রসবের অনতিকাল পরেই গাভীকে বাঁশ পাতা ও পুরাতন গুড় ও আদা একত্র মিশ্রিত করিয়া দিনে দুইবার খাইতে দেওয়া উচিত। প্রসবের পর গাভীকে মল পরিষ্কার রাখিতে পারে এরূপ খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত।

মানুষের খাদ্যের পরিমাণ।

প্রত্যেক মানুষের শরীর ধারণের জন্য কি পরিমাণে খাদ্য প্রত্যহ প্রয়োজন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শারমেন লিখিত তালিকা হইতে তাহা দেওয়া হইল :—

মাছ ও মাংস	শতকরা	১২	ভাগ
দুধ এবং গব্য পদার্থ	"	১৪	"
রুটী অথবা শস্য জাতীয় পদার্থ	"	১৩	"
সব্জী	"	৬	"
চিনি	"	৩	"
বিবিধ পদার্থ	"	৫	"

শিশুরা কঠিন পদার্থ ভক্ষণ করিলে কি করা কর্ত্তব্য।

যদি কোন শিশু সহসা কোন বোতাম, আধলা অথবা ঐ প্রকার কোন শক্ত অনিষ্টকর পদার্থ গিলিয়া ফেলে তবে তাহাকে মল পরিষ্কার করিবার ঔষধ খাওয়ান উচিত নহে। ইহাতে গিলিত পদার্থ শক্ত হইয়া পেটের ভিতরে আটকাইয়া যাইতে পারে। রোগীকে আলু অথবা সুসিদ্ধ ভাত বেশ চটকাইয়া খাওয়ান উচিত যাহাতে গিলিত শক্ত পদার্থটীর চারি দিকে ইহা লাগিয়া গিয়া সহজে উহা পেট হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে।

পোকার দৌরাত্ম্য।

গম এবং ছোলার পোকা বিনষ্ট করিতে হইলে copper carbonate কপার কারবোনেট ব্যবহার করা উচিত। এক থলি গমে দুই আউন্স আন্দাজ এবং এক থলিয়া ছোলায় চারি আউন্স আন্দাজ Copper Corbonate ব্যবহার করা উচিত। অবশ্য অধিক পরিমাণ উক্ত ঔষধ ব্যবহার করিলেও শস্যের কোন অনিষ্ট হইবে না। পোকা বিনষ্ট করিবার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত copper carbonateই এই উদ্দেশ্যে ক্রয় করা উচিত। বীজগুলির সহিত বেশ সমান ভাবে উহা মিশ্রিত করিবার জন্য বায়ু সঙ্কোচক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করাই উচিত। একটী দুধ টানিবার পাত্র হইলেই ভাল হয়। এই পাত্রের তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র শস্যে পূর্ণ করিয়া প্রত্যেক বার ঔষধ দিয়া অন্ততঃ একশতবার নাড়াচাড়া করিতে হইবে।

Copper Carbonate এ বীজের অঙ্কুরোদ্গম শক্তি বিনষ্ট হয় না। চাষীরা গম ছোলা ইত্যাদি মাড়াই করিবার পর যখন কাজের ভিড় কম হইবে সেই সময় অবসর মত এই রোগ নিবারণের উপায় অবলম্বন করিতে পারেন।

টোটকা ঔষধ।

শুষ্ক কুলের আঁটি ভঙ্গিয়া উহার ভিতরকার শাঁস পরিমাণে মধুর সহিত মাড়িয়া খাওয়াইলে বালকদের হিক্কা নিবারণ হয়।

জামের আঁটির শাস গুঁড়াইয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া ২॥০ রতি আন্দাজ খাওয়াইলে খড়ি গোলা অত্যধিক প্রস্রাব নিবারণ হয়।

আমের আঁটির ভিতরকার শুষ্ক শাঁসের চূর্ণ ১ রতি, দুধ আধ তোলা ও চিনি আন্দাজ ।০ ওজন সকালে ও বিকালে একবার করিয়া খাওয়াইলে শিশুদের রক্তামাশয় রোগ আরোগ্য হয়। অধিক বয়স্কের জন্য মাত্রা বাড়াইলেই চলে।

উদরাময় ও আমাশয়।

(Diarrhœa and Dysentery)

পথ্য—অতীসারের প্রথম অবস্থায় প্রথম দিন উপবাস ও দ্বিতীয় ও তৃতীয়দিন জল এরারুট, জল বার্লি, শটীর পালো ও লেবুর রস পান করা বিধেয়। তারপর ভাত বা খৈয়ের মণ্ড, ছাগ দুগ্ধ, এরারুটের বিস্কুট, মসুর ডালের কাথ (লেবু সহযোগে) অল্প অল্প খাওয়াইবে। তরল ভেদ হইলে ও পিপাসা থাকিলে জল খাওয়াইবে। ৩৪ দিন পরে ছাগদুগ্ধ নচেৎ গো-দুগ্ধ আধা-আধি জল মিশাইয়া এক তোলা মুথা বা বেলশুঁঠে আধ ঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া বা অবস্থা বুঝিয়া আধ সের পর্য্যন্ত খাওয়াইতে পারা যায়। প্রথম দিন বাদে একটু পাতলা গোল দেওয়া চলে।

প্রথম অবস্থায় পেটে কামড়ানি থাকিলে হরীতকী একতোলা, পিঁপুল অর্দ্ধ তোলা করিয়া বাটিয়া এক ছটাক উষ্ণ জলে গুলিয়া সেবন করিবে—দিনে রাতে ২ বার যথেষ্ট।

২। ৩দিনের মধ্যে বন্ধ না হইলে কাঁচা আমলকী অভাবে শুষ্ক আমলকী ২।৪ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া ঘন করিয়া বাটিয়া নাভির চারি পার্শ্বে বেশ মোটা করিয়া (কম্বলের মত) লেপিয়া দিবে, নাভির গর্ত্তটা যেন খালি থাকে। তারপর সামান্য আদার রস ফুটাইয়া অল্প গরম থাকিতে থাকিতে নাভির গর্ত্ত ভর্ত্তি করিয়া দিবে। ঐ রস ৫।৭ মিনিট রাখিয়া পুনরায় তুলা বা ন্যাকড়া দিয়া শুষিয়া বাহির করিয়া পুনরায় গরম আদার রস ঢালিয়া দিবে। এইরূপ ৫।৬ বার করিয়া আমলকীর প্রলেপ তুলিয়া শুক্‌না কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলিবে। ইহা সদ্য ফলপ্রদ।

আমের কশী ১ তোলা, বেল শুঁট ১ তোলা, ৴॥০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ অর্দ্ধ পোয়া ক্বাথে চিনি ও মধু মিশাইয়া খাইলে বমি ও অতিসার বিনষ্ট হয়।

প্রথম কয়েক দিন কোষ্ঠ বদ্ধতার পর যদি আমাশয় হয়, পেট কামড়ায় ও অতি সামান্য ছোট ছোট গুঠলে আমাশার সহিত বাহির হয়, তাহা হইলে ২ তোলা পরিষ্কৃত রেড়ীর তৈল গরম দুধে মিশাইয়া একবার খাওয়াইয়া দিলে ভিতরকার সকল সঞ্চিত মল বাহির হইয়া যায়।

অতিসার বা রক্তাতিসারে পরিষ্কৃত শ্বেত ধুনা গুঁড়া ও শিমুলের আটা প্রত্যেকটি ৪ রতি পরিমাণ এক বা দেড় ছটাক দুধের সহিত মিশাইয়া দিনে রাতে ৩।৪ বার খাওয়াইবে।

জাম, আম, আমলকী এই তিন গাছের কচিপাতা প্রত্যেকটী আন্দাজ এক তোলা পরিমাণ লইয়া সেগুলি পরিষ্কৃত শিলে ছেঁচিয়া রস বাহির করিবে ও তাহার সহিত অর্দ্ধ ছটাক ছাগলের কাঁচা দুধ ও আধ তোলা আন্দাজ মধু মিশাইয়া প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া পান করিতে দিলে রক্তাতিসার অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

আধ তোলা শুঁঠ কাঠখোলায় (খই মুড়ি ভাজিবার কটাহে) ভাজিয়া, খুব মিহি ভাবে গুঁড়া করিয়া সকালে ও বৈকালে অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক পরিমাণ মত শীতল জলের সহিত খাইলে পেটের সঞ্চিত আম সকল পড়িয়া যায় ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়। এক সপ্তাহ খাইলে সমুদায় আম নষ্ট হয়। কিন্তু প্রতিদিন লঘু পথ্যের প্রয়োজন।

গরুর পেট কামড়ানি।

এই রোগে প্রায়ই নাদ বন্ধ হয়। গরু কেবল চোনায় এবং পা ছড়াইয়া ছটফট করে, কখনও বা পিছনের পা দিয়া তলপেটে আঘাত করে; কখনও কখনও প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায় ও চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। সামান্য নাদিলে সোমরাজ বীজ ৩ তোলা, বৈঁচির শিকড়ের ছাল ৪ তোলা একত্র জল দিয়া বাটিয়া প্রত্যহ তিনবার খাওয়াইবে, ইহার সহিত ৩ তোলা ইন্দ্রযব বাটিয়া মিশাইয়া লইতে পার; কিংবা ঝোলা গুড় এক ছটাক, কদমপাতার রস আধপোয়া একত্র মিশাইয়া দিবে। নাদ যদি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে দুই সের আন্দাজ ডাবের জল গরম করিয়া খাওয়াইয়া দিবে। কদমপাতার রস আধ পোয়া ও ইক্ষুগুড় এক ছটাক উভয়ে একত্র করিয়া খাওয়াইলে পেট কামড়ানি আরোগ্য হয়।

তলপেট ফুলা ও কোষ্ঠ বদ্ধতা।

ইহাতে নিঃশ্বাস অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন হয়। বোধ হয় যেন গরু মলমূত্রত্যাগের জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু বেশী হয় না; পেট কিছু মোটা হইয়া পড়ে; কান নীচু করিয়া থাকে, লেজ নাড়িতে পারে না। মলে কখনও দুর্গন্ধ হয় এবং অল্প পরিমাণে লোহিতাভ মূত্র নিঃসরণ করে। শুঁঠ চূর্ণ ২ তোলা, গুড় আধ পোয়া, গোলমরিচ আধতোলা, সৈন্ধব লবণ, দেড়পোয়া, সোরা চূর্ণ আধ ছটাক, গন্ধক চূর্ণ ৪ তোলা সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া একসের ঈষৎ গরম ভাতের মাড়ের সহিত গুলিয়া খাওয়াইবে; ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া রোগ দূর হইবে। আধপোয়া ইক্ষু গুড় (অন্য গুড় হইলে ক্ষতি নাই) ও কাঁচা হলুদের গুঁড়া এক ছটাক মিশাইয়া সেবন করাইলে পেট-কামড়ানি, পেটফাঁপা প্রভৃতি অতি সত্বর আরাম হয়।

কৃমি।

কৃমি হইলে গরুর পেট মোটা দেখায়; প্রায়ই গায়ের লোমসকলের মূল আলগা হয়—টান দিলে উঠিয়া আসে। গরু মাঝে মাঝে কাসিতে থাকে ও রোগা হইয়া যায়। তাহার অত্যন্ত ক্ষুধাতৃষ্ণা হয়; কিন্তু আহার্য্য পেটে পরিপাক হয় না। খোপনার নীচে ফুলিয়া উঠে। পৃষ্ঠ একটু বসা-বসা দেখায়; প্রায় পাতলা ও ভ্যাসকা বাহে করে। এইরূপ হইলে ৮।১০টী কাগজী লেবুর পাতা হুঁকার জল দিয়া মোলায়েম ভাবে বাটিয়া পরে একটা পাথরের বাটীতে তিন ছটাক আন্দাজ হুঁকার জল ঢালিয়া ঐ লেবু পাতা-বাটা গুলিয়া এক ছটাক লবণ মিশাইয়া দিবেন। পরে উহা ছাকিয়া গরুকে প্রত্যহ একবার করিয়া পান করাইলে এক সপ্তাহের মধ্যে রোগ নিশ্চয় দূরীভূত হইবে।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

আপনার জ্যৈষ্ঠের প্রশ্নোত্তর দেওয়া হইল।

১। পশ্চিম বঙ্গে গমের চাষ সাধারণতঃ হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি ফলন ৩ হইতে ৪ মণ পাওয়া যায়।

গমের জন্য উৎকৃষ্ট সার নিম্নলিখিত হারে প্রতি বিঘায় প্রয়োগ করিলে সুফল ফলিবে।

নাইট্রেট অফ সোডা—১০ সের
সুপার ফসফেট —১০ সের

এ দেশে দেশী অনেক রকম গম ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে "দুধে" গমই ফলে বেশী— এবং আটাও হয় ভাল। আজ কাল "পুসা" সরকারী ক্ষেত্রের গম নং ১২ এদেশে দুই এক জন তাঁহাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতেছেন। ফলন অপেক্ষাকৃত বেশী এবং আটা সদা রং এর হয় বলিয়া বেশী মূল্যে বাজারে বিক্রয় হয়।

জল সেচনের দ্বারা গমের ফলন বৃদ্ধি হয় ও স্বাদ ভাল হয়। দুইবার সেচ দিতে পারিলেই ভাল হয় একটী সেচ গাছের চারা অবস্থায়ও দ্বিতীয়টী ফুল ফুটিবার সময় দেওয়া উচিত।

আপনার পত্রের ২য় প্যারাগ্রাফের উত্তর নিম্নে উদ্ধৃত পত্রখানি হইতে পাইবেন —আ সঃ।

মহাশয়, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা আবাদের শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল মহাশয়ের ২য় প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি যে— "অশ্বগন্ধা" মরসুমী ফসল। আমাদের শ্রীহট্ট জেলার নানা স্থানে কার্ত্তিক মাসে আপনিই জন্মিয়া থাকে এবং ফাল্গুন চৈত্র মাসে বীজ পাকিয়া ঝরিয়া পড়ে ও গাছ মরিয়া যায়। অশ্বগন্ধার চাষ আমাদের দেশে কেহ করেন না। আপনি জন্মে, বীজ পড়ে আবার জন্মে। কার্ত্তিক মাসে চারা উঠামাত্র যদি লাইনবন্দী ভাবে তাহা উঠাইয়া বাগানে রোপণ করা যায় তাহা হইলে সার ব্যবহারে বিশেষভাবে ফসল হইবে। আমরা কার্ত্তিক মাসে চারা ও ফাল্গুন মাসে বীজ দিতে পারিব। এই বৎসর আমি প্রদর্শনীক্ষেত্রে অশ্বগন্ধার চাষ করিব। ইতি— মোহাম্মদ আশারাফ হোসেন, সাহিত্যরত্ন, কাব্যবিনোদ। সম্পাদক—কার্য্যকরী কৃষি সমিতি, ৬৩নং গ্রাহক— আবাদ। পোঃ মুন্সীগঞ্জ বাজার শ্রীহট্ট।

৩ আলু ও বাঁধা কপির জমি এখন পতিত থাকিলে তাহাতে হাড়ের গুড়া দিতে পারেন। ডবল সুপার ফস্‌ফেট্ শেষবার চাষ দিবার সময় ব্যবহার করিলে ফল উত্তম হয়। ইউইং কোম্পানী আজ কাল আলুর জন্য মিশ্র সার প্রস্তুত করিয়াছেন গত বৎসর চুঁচুড়াকৃষি বিদ্যালয়ে এই সার ব্যবহারে বিশেষরূপ ফল পাইয়াছেন।

প্রশ্ন।

১। আপনি আবাদের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লিখিয়াছেন যে বেগুণ যখন বাজারে সস্তা হয়—উহা বিক্রয় না করিয়া চাকা চাকা করিয়া রৌদ্রে শুখাইয়া পরে যখন বেগুণের— দাম চড়িয়া যায় তখন উক্ত শুষ্ক বেগুণ বেশী দামে বিক্রয় হয়। উহা কোথায় বিক্রয় হয় এবং কিরূপ দামে বিক্রয় হইতে পারে ?

২। প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে ঢেড়শ চাষ করিলে অধিকাংশ—গাছ করকটে এবং পত্র গুলি হলদের রং বিশিষ্ট হইয়া যায় যাহাকে কৃষকেরা চলিত থাকায় 'সাহেব" হওয়া বলে। এরূপ হইবার কারণ কি ? এবং উহার নিবারণের উপায় কি ?

বিনীত—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস।

আপনার প্রশ্নের উত্তর পরবর্ত্তী সংখ্যায় দেওয়া হইবে—আ সঃ।

মহাশয় !

আপনারা অনেক বিজ্ঞতাসহকারে কৃষির উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, এজন্য আমরা আপনাদের নিকট অনেক বিষয়ে আশা করিতে পারি।

এদেশের নিম্ন যায়গায় যে উপায়ে গরুর দ্বারা লাঙ্গল করাইয়া ধান্য রোপণ করা হইত, এখন নানা কারণে এবং গরুর দুর্ম্মূল্যতার হেতু সাধারণ কৃষকেরা কৃষিকার্য্যের উন্নতির পথে বেশী অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। এজন্য জলে লাঙ্গল করিয়া চষিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইতেছে কিন্তু কোন স্থানে সেরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না, এ বিষয়ে আপনাদের সাহায্য পাইলে, যদি কোনরূপ উপকার হইতে পারে সেইজন্য আপনাদিগকে লিখিতেছি। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া যতদূর সম্ভব সংবাদ দিতে পারিলে এদেশের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে।

এক ফুট হইতে দেড় ফুট জলে যাহাতে Motor tractor উত্তমরূপ কাদা করিয়া ভাল চাষের উপযোগী করিতে পারে, তদুপযুক্ত আপনারা কোন সংবাদ দিতে পারিলে বিশেষ উপকৃত হইব। আমাদের দেশের ধান জমির সহিত স্পেনের ও জাপানের ধানজমির কোন সাদৃশ্য আছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলে, এদেশের কৃষিক্ষেত্র আবাদের বিশেষ উপকার হইবে আশা করা যায়। আমরা আমেরিকা ও জাপানের সহিত এ বিষয়ে অনেক আন্দোলন করিয়া এখনও কোন বিশেষ সুবিধা করিতে পারি নাই। আপনাদিগকে একমাত্র ভরসা করিয়াছি, ইহাতে যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন ইতি—

Mugberia P. O. } বশংবদ—
Midnapur Dist. } শ্রীগঙ্গাধর নন্দী, জমিদার।

আপনার পত্র পাইয়া বড়ই উৎসাহিত হইলাম, আজকে আপনারা যে কৃষির উন্নতি করিতে অগ্রসর হইয়াছেন ইহা দেশের পক্ষে বড়ই আশাপ্রদ। আপনি ধানের জমির পক্ষে ট্রাক্টরের সন্ধান চাহিয়াছেন। উন্নত প্রকারে ধানের চাষ, এই সবে মাত্র আরম্ভ হইতেছে, লড়াইয়ের পূর্ব্বে এর কথা কেহ ভাবিত না—লড়াইয়ের পরে আমেরিকা ইণ্ডোচায়না, Brazil, প্রভৃতি দেশের বৈজ্ঞানিকগণ—এই ফসলের উন্নতির দিকে নজর দিয়াছেন,—ট্রাক্টর নির্ম্মাণকারীগণ ও এখন এদিকে মনোযোগ দিতেছেন। তবে আমাদের অভিজ্ঞতার ফলে এই মনে হয় যে ধান চাষে ট্রাক্টর বিশেষ ফল দিবে না—তাহার কারণ ধানের চাষে আইল দিয়া জল ধরিয়া রাখিতে হয়—এই আইলের ভিতর ট্রাক্টর চালান বড় শক্ত, তবে চারিদিকেই পরীক্ষা চলিতেছে, কোন সন্ধান পাইলেই আপনাকে জানাইব।

ইতি— আবাদ—সম্পাদক

সবিনয় নিবেদনমিদং—

আমি আপনাদের একজন "কৃষিকর্ম্মবিৎ" গ্রাহক আপনাদের ২য় সংখ্যা আবাদে কয়েকটি বিষয়ে সন্দেহ হওয়ায় লিখিতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পরবর্ত্তী সংখ্যায় সুবিধা হইলে উত্তর দিবেন।

১। Tropical Agriculturial হইতে যে আনারস চাষের বিষয় লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভাবে বাঙ্গালা দেশের অনুপযোগী। ৪৬ পৃষ্ঠা—৭৫০ (৭৫° হইবে)—৮৫° ও ২ হইতে ২০" বৃষ্টি—ইহা কি কখনও সম্ভব। সাধারণের ধারণা আনারস গাছ একটু আওতা জমীতে ভাল হয়। আমি নানা স্থান হইতে গাছ আনাইয়া দেখিয়াছি—আমাদের এখানে—(৫৫°—১১৮°—৪৫"—৫৫" বৃষ্টিপাত) আওতা স্থানেই গাছ ভাল হয়। রীতিমত সেঁচ দিয়াও খোলা জায়গায় গাছ সন্তোষজনক রূপে বাড়েনা পাতা লাল হইয়া যায়। গাছ পুঁতিবার পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক উপরস্থ পত্রকোষের ভিতর কোনরূপ ধূলা, বালি, মাটি না পড়ে; সে গাছ শীঘ্র বাড়ে না।

Queen pineapples Sylhetএ যথেষ্ট পাওয়া যায়—Giant kew "Giantfew" নহে—৪৮ পৃষ্ঠা।

২। ধানের আবাদ—৫৭ পৃষ্ঠা চতুর্থ বৎসর—ইক্ষু ও

আউশ ইহা কিরূপে সম্ভবে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। চৈত্র বৈশাখে আক লাগাইয়া সেই ক্ষেত্রে আউশ কোন সময়ে দিবেন। আক একক্ষেত্রে আমরা ২।৩ বৎসর করি ও পর্য্যাপ্ত ফসল পাই।

৩। ৪৯ পৃঃ—"শুষ্কভার" জিনিষটা কি ? Humidity —না আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

৪। ৬৩ পৃঃ—আমন ধানের জন্য প্রতি একরে যে সারের পরিমাণ লিখিয়াছেন তাহার দাম ও চাষের কার্য্য ও খাজনা বাদে কি লাভ থাকিতে পারে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি ? আমার প্রায় ৩০০/০ বিঘা চাষ আছে আমি কত জমীতে ঐরূপ ব্যবহার করিতে পারি ?

৫। ৮০ পৃষ্ঠা—সার প্রতিমণ—হাড়ের গুঁড়া—নাইট্রেট পটাস মন—১০০৲ ১৮৫৲ ইত্যাদি। প্রাপ্তিস্থান লিখিলে বেশী উপকার হইবে।

৬। Sulphate of Ammonia. দেশী জিনিষ দাম কম ও Nitrogen 21% তাহা না ব্যবহার করিয়া Chilean Nitrate ব্যবহার করিব কেন—বিস্তারিত জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

পুঃ চঃ—

৭। ফল গাছ সম্বন্ধে ফলবান বৃক্ষের সার কি ভাল "ফলের বাগানে" জানিতে পারিলে সুখী হইবে। বিশেষ ভাবে আমের কথাই জানিতে ইচ্ছা করি।

S. P. S.

আপনি আমাদের গত সংখ্যার যে সব ত্রুটী দেখাইয়াছেন সে জন্য আমরা বড়ই বাধিত হইলাম। আমরা আমাদের দোষ সংশোধনে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। ৪৮ পৃষ্ঠা ও ৮০ পৃষ্ঠায় যে দুইটী ছাপার ভুল থাকিয়া গিয়াছে তাহার জন্য বড়ই লজ্জিত। ভবিষ্যতে এ দোষ না হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিব। অন্য প্রশ্নগুলির উত্তর আমরা শ্রাবণ সংখ্যার "আবাদে" প্রকাশ করিব। আপনাদের এরূপ আগ্রহ দেখিয়া আমরা সত্যই বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি—আশা করি আপনারা সর্ব্বদাই আমাদের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিবেন।

সম্পাদক—

আষাঢ়ের মাসপঞ্জী।

আষাঢ় মাস চাষীর বড়ই কাজের মাস—এই সময়ে আমন "রোয়া" আরম্ভ হয়। যত শীঘ্র এই কার্য্য আরম্ভ করা যায় ততই ভাল কারণ গাছগুলি যত শীঘ্র ক্ষেত্রে বসান যায় ততই শীঘ্র গাছগুলি লাগিয়া যায়। এবং বৃষ্টি যদি শীঘ্র নামিয়া যায় তা হইলে গাছের কোন ক্ষতি হয় না।

মকাই, তুলা, রেড়ী ইত্যাদি পুঁতিবার এই সময়—আক, বেগুণ প্রভৃতি গাছের গোড়ায় যাহাতে জল না জমে তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত।

এই মাসে বেগুণ, ডাঁটা, লঙ্কা প্রভৃতির চারা তলা হইতে নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসাইতে হয়।

আদা, হলুদ গাছের গোড়ায় মাটী দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হয়।

লেবু গাছের যে সব ডাল মাটীর উপর লতাইয়া

পড়ে, তাহার উপর মাটী চাপা দিয়া রাখিলে—সহজেই ভাল "চাপা কলম" তৈয়ার হইবে। চারা গাছও বেল, গোলাপ, যুই প্রভৃতি এই সময় বসানউচিত। "ডাল-কলম" করিবারও ইহাই উপযুক্ত সময়।

দোপাটী, ক্লিটোরিয়া, আইকোঁমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম, মাটিনীয়া, প্রভৃতি ফুলের বীজ এখনও বোনা যাইতে পারে।

শীতের ফসলের বীজ এই মাস হইতে প্রস্তুত করিতে হয়—বিশেষতঃ যদি ফুলকপি শীঘ্রই বাজারে আমদানী করিবার ইচ্ছা থাকে। পচাপাতা ও গোবর এই সময় জমিতে প্রয়োগ করাই ভাল।

যাঁহারা গুটীর চাষ করিবেন তাঁহারা এই সময়ে তুঁতের ডাল কাটিয়া বাগানে পুঁতিয়া দিবেন।

আনারসের মোকা এই সময় বসান হইয়া থাকে।

কলার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া ফেলিতে হয়—বাকী গাছগুলি অন্যত্র বসাইলে লাগিয়া যায়।

সমালোচনা।

আমরা সুচিকিৎসা নামক মাসিকপত্রিকার আটখানি সংখ্যাই বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া বহু আনন্দলাভ করিয়াছি। ইহাতে বাংলাদেশের সমস্ত রোগের সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা ও তাহাদের যাবতীয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে প্রচলিত চিকিৎসা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অধিকাংশ চিকিৎসাই বহু চিত্র দ্বারা বর্ণিত এবং বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত। গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব, প্রসবান্তে রক্তস্রাব, আমাশয়, কলেরা, ক্রিমিরোগ, খাদ্যের পরিপাক, বহুমূত্র, জীবাণুবৃত্তান্ত, ক্ষতচিকিৎসা, প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিক ও বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। বহু বিদেশীয় সাময়িক হইতে অভিনব আবিষ্কার ও চিকিৎসা সম্বন্ধে চয়ন ও বহু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র প্রতি সংখ্যাতেই সঙ্কলিত করা হইয়াছে। ডাক্তার হরিহরবাবু এই ব্যয়বহুল ও অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইংরাজী বৈজ্ঞানিক ভাষা ও দুরূহ শব্দ প্রভৃতি যে এরূপ সরল বাঙ্গলায় করা যাইতে পারে তাহা সুচিকিৎসা পাঠের পূর্ব্বে আমাদের ধারণাই ছিল না। এইরূপ একখানি প্রকৃত সুচিকিৎসাপূর্ণ মাসিকপত্রের যে কতখানি অভাব ছিল তাহা পল্লীচিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন। আমরা ইহার উন্নতি ও বহুলপ্রচার কামনা করি এবং মফঃস্বলের প্রত্যেক চিকিৎসককেই ইহার নিয়মিত গ্রাহক হইতে বলি।

সুচিকিৎসা ৮৭নং দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত হয়—সম্পাদক ডাঃ শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, বি, সডাক বার্ষিক মূল্য ৩।৵০।

কলিকাতার বাজার দর

গ্রামে উৎপন্ন দ্রব্যাদি কিরূপ মূল্যে কলিকাতায় বিক্রয় হয় তাহা প্রত্যেক উৎপন্নকারীরই জানা কর্ত্তব্য। তাহাদের সুবিধার জন্য আমরা প্রতিমাসে আবাদে কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি।

(শাকসব্জী

বেগুন—প্রতিসের	৵০	হইতে	৶১০
বাঁধাকপি—এক একটী	৵০	”	৶০
শসা—কুড়ি	॥৵০	”	৸৶০
রসুন—সের	৶০	”	০
আদা—সের	৶০	”	।০
কাঁচালঙ্কা—সের	৶০	”	।০
ঢেরস—কুড়ি	/০	”	/১০
দেশী পেঁয়াজ—সের	৵০	”	৵১০
পাটনাই লাল—	৶০		
সাদা	।০		
আলু নৈনিতাল	৵০		৵১০
ঐ দেশী	/০		৵০
	/১০		৵০

ফল

নারিকেল—১টী	/৫	৵০
পাতিনেবু—কুড়ি	৵০	॥৵০
কলা চাঁপা ১ ছড়া	৵০	।৵০
ঐ মর্ত্তমান—	৶০	॥৵০
পেঁপে—১টী	।৵০	৸০

ডিম

ডিম হাঁসের—১ কুড়ি	৸০	
মুরগীর—	১৲	১।০

হলুদ

পাবনা ও কুষ্টীয়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রতিমণ	৭৲
দেশী—	৯৲
তেঁতুল—	৬৲

টাকা হইতে ৬।০ অবধি

দেশী শুষ্ক আদা—প্রতিমন ২০৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা অবধি।

জমির সার

রেড়ি খইল	প্রতি মণ	৪৸০—৫৲
সরিষা ”	”	২।০—২॥৵০
মউয়া		১॥০
চিনাবাদামের খোল		২॥০—৩॥/০
হাড়ের গুঁড়া	প্রতি টন	১১০৲—১১৫৲
নাইট্রেট্ অফ সোডা		২১০৲ টাকা করিয়া প্রতিটন রেলে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত
সালফেট্ অব য়্যামোনিয়া		১৯০৲ টাকা টন
বেসিক শ্ল্যাগ		৭০৲ টাকা করিয়া প্রতিটন
সুপার ফসফেট্ Single প্রতিটন		৯০৲—৯৫৲
ঐ Double	”	১৮০৲—১৮৫৲
সালফেট্ অফ পটাস	”	১৮০৲ শতকরা ৫০৲
মিউরেট্ অব পটাশ	”	১৩০৲—৫০৲
নাইট্রেট্ অব পটাশ	”	২৩০৲

চিনি

জাবা চিনি	প্রতি মণ	১২৸০
ঐ লাল	” ”	১২॥০
মিছরী	” ”	১৩৲

তুলা

বঙ্গদেশজাত তুলা	প্রতি মন	২৭৸০ ৩০৷৷০
উমরাস তুলা	” ”	৩২৷৷০ ৩৫৲
ওমারড তুলা	” ”	৩ ৷৷০—৩ ৲
শিমুল তুলা	” ”	৪৯৲—৫০৲

তৈল

সরিষার তৈল	” ”	২২৲—২০৲
নারিকেল তৈল	” ”	২৪৲—২৫৲
তিল তৈল	” ”	২৫৲—২৯৲

চাউল প্রতিমণ

বালাম নূতন	৷৷০— ৲
পাটনা'ই ঐ	৭৵০—৭৸৵০
রেঙ্গুন আতপ নূতন	৬৲—৬০
বাঁকতুলসী	৮৷৷০ ৮৸০
নাগরা	৬৸০—৭৷৵০

দাইল—প্রতিমণ

দেশী অড়হর	৬৲ ৮৲
মুগ কাঁচা	১০৲
ছোলা	৬৲—৬৷৷০
মশুরী	৫৷৷০—৫৸০
কালি কলাই	৬৲—৮৲
খেসারী	৪৷৵০ ৫৲

আটা ময়দা—প্রতিমণ

১নং ময়দা	৮৸৵০
২নং ঐ	৮৵০
৩নং ঐ	৬৲

বি আটা আসল	প্রতি টন	৮৸৵০
সুজি	”	৯৲
ময়দা	”	৮৵০
ভুসি	”	৩৷৷৵০

লবণ—(১০০ মণ)

এডেন	১৮০৷৷৵০
করকজ	২৲ মণ

পাট

ইষ্টার্ণ ফোর	প্রতি মণ	১৩৷৷০
” রিজেক্সন	”	১২৷৷০
” T. R.	”	১১৷৷০

কেরোসিন তৈল—প্রতি ২ টিন

কেরাসিন হাসমার্কা	৬৷০
বানর মার্কা	৭৷৷০
হাতী মার্কা	৭৷৵০
ভিক্টোরিয়া	৬৶০
রাণীমার্কা	৬৷০
গীর্জ্জামার্কা	৯৷৷৶০

করগেট

২২ গেজি	প্রতি হন্দর	১৭৲
২৪ ”	”	১৪৷০
২৬ ”	”	১৩৷৵০

বস্ত্র

এডওয়ার্ড মিল ধুতি ১০—৪৪	২৸৶০
ঐ সাড়ী	৩৵০
ধুতি ৭৷৮৷৯ গজ	১৸৶০—২৴০
ধুতি ৯৷৷০ গজ ৪০ ইঞ্চ	২৷৷৴০

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৭	১৩	C. Annucma.	C. Annuma
৮৭	১৪	Pungeney.	Pungency.
৮৭	৪১	C. Annucma	C. Annuma.
৯৪	৮	বাঁকচর	বাঁকচুর
১০১	৩৫	লং ামক	সংক্রামক
১০৫	২৯	২৩	২১১
১০৯	৫৮	Had	Hard.
১১৪	৬২	তন	নূতন

(বিশেষ দ্রষ্টব্য,—আমাদের আয়তন বৃদ্ধির জন্য এমাসে আবাদ বাহির করিতে দেরী হইয়া গেল—এজন্য আমরা আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদিগের নিকট লজ্জিত।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষিত সেণ্ট্রাল-টেক্‌ষ্ট-বুক কমিটির অনুমোদিত,

সংবাদপত্রে সাধারণ্যে প্রভূতরূপে প্রশংসিত

—কৃষিতত্ত্ববিদ—

উদ্যানাচার্য্য শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত

কৃষি-গ্রন্থাবলী

১। কৃষিক্ষেত্র (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) ৭ম সংস্করণ। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

২। সব্জীবাগ (৯ম সংস্করণ) মূল্য ১৲ টাকা।

৩। ফলকর (৬ষ্ঠ সংস্করণ) মূল্য ১॥০ টাকা।

৪। মালঞ্চ (৩য় সংস্করণ) (সচিত্র) মূল্য ১॥০ টাকা।

৫। পশুখাদ্য (২য় সংস্করণ) মূল্য ।০ আনা।

৬। আয়ুর্ব্বেদীয় চা (২য় সংস্করণ) মূল্য ।০ চারি আনা।

৭। গোলাপ বাড়ী (সচিত্র) ২য় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত) মূল্য ১৲ টাকা।

৮। মৃত্তিকাতত্ত্ব—(সচিত্র) (২য় সংস্করণ) মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

৯। ভূমিকর্ষণ--ভূমিকর্ষণের উদ্দেশ্য কি ? মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

১০। কার্পাস কথা (২য় সংস্করণ) মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

১১। উদ্ভিদখাদ্য—মূল্য ॥০ আনা।

১২। ভারতীয় অর্থশাস্ত্র—মূল্য ।০ চারি আনা।

১৩। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষি (২য় সংস্করণ) মূল্য ।০ আনা।

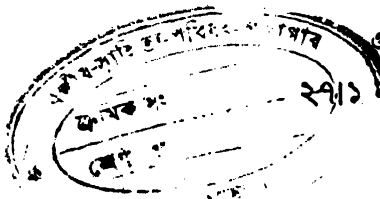
১৪। উদ্ভিজ্জীবন—মূল্য ॥০ আনা।

১৫। প্রকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান—মূল্য ।০ চারি আনা

১৬। A Treatise on Mango (3rd Edition).

১৭। Potato Culture (5th Edition). As. 8.

১৮॥ বিষয়ী (যন্ত্রস্থ)..................



প্রাপ্তিস্থান—দে এণ্ড সন্স,
২৭।১ নং বিডন রো, কলিকাতা।

Edited & Printed at Sreekrishna Printing Works. 259, Upper Chitpore Road by Charu Chandra Sanyal and published by him at 27, Upper Circular Road.